ভূমিকা

তুষের ভিতর যেমন চাল

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অন্তরঙ্গ পার্ষদদের বলিতেন, এখানকার যা কিছু সব তোমাদের শিক্ষার জন্য — ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের জন্য। 'এখানকার যা কিছু' মানে, শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ। আবার বলিতেন, 'এখানে আসা-যাওয়া করলেই হবে'। ইহার মানে, ইহাতে তাঁহার বাণী ও আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভ হইবে। তাঁহার আচরণ পক্ষান্তরে জগদম্বারই আচরণ। তিনি আর জগদম্বা অভেদ!

ঠাকুর বলিতেন — 'মা, আমি তো দেখছি — এই দেহ-মন-বুদ্ধি জুড়ে তুমি রয়েছ। এই দেহ-মন-বুদ্ধি দ্বারা তুমি সব করাচ্ছ।'

কখনও বলিতেন, 'মা, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী। যেমন করাও তেমনি করি। যেমন বলাও তেমনি বলি।'

শ্রীম-র নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ, বাণী, আচরণ — এ সবই আচরণ। তাই তিনি সর্বদা ঠাকুরের আচরণ করিতেন। বর্তমান বিদেশী শিক্ষায় সন্দিগ্ধচিত্ত ভক্তগণকেও সেই আচরণ অনুকরণ করিতে বলিতেন। নিজে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঠাকুরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচরণটিকেও অমূল্য সম্পদ মনে করিতেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে ঠাকুর ভবতারিণীর সামনে, কিংবা রাধাকান্তের মন্দিরে যেভাবে যেদিকে গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন, শ্রীমও তাই করিতেন। আবার ঠাকুরের মত ললাটে সিন্দুরের তিলক ধারণ, চরণামৃত গ্রহণ, করজোড়ে বিনম্র প্রার্থনা, প্রণামী প্রদান প্রভৃতি অনুকরণ করিতেন।

এই সব দেখিয়া নব্য শিক্ষিত লোকগণ বিস্মিত হইয়া যাইত। কেহ কেহ সংকোচ ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্যে বলিত — এই সব আচরণের কি প্রয়োজন! এসব তো গ্রাম্য অশিক্ষিতা বিধবা স্ত্রীলোকগণ করিয়া থাকে। শিক্ষিত

লোকদের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে শ্রীম বিনীতভাবে বলিতেন — এরই নাম ভক্তি।

অবতারের এই rituals — আচরণ অনুকরণ করিতে করিতে অজ্ঞাতে মনের উপর প্রভাব পড়িয়া থাকে। এই প্রভাব, এই সংস্কার পুনঃ পুনঃ আচরণে ও অনুকরণে শক্তিমান হয়। পূর্ব সংস্কার ও পূর্ব শিক্ষায় যে প্রতিকূল আচরণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার সহিত অবতারের আচরিত আচরণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর ঐ নরদেবের আচরণ, বাণী ও জীবন অনুকরণব্রতী whole-time men, সর্বত্যাগী সাধু ও ভক্তগণের সংস্পর্শে নবীন বেগ ধারণ করে। মানুষের নিজের চেষ্টায় আর সর্বত্যাগী সাধু ও ভক্তগণের সর্বদা আচরণীয় কার্য ও উপদেশের সহিত মিলিত হইয়া মানুষকে পূর্ব সংস্কার জয়ে প্রভূত সহায়তা করে।

ঠাকুর বলিতেন, জোর করিয়া সংস্কার-প্রবর্তিত আচরণ ছাড়িও না। সময় হইলে আপনিই ছাড়িয়া যায়। মানুষের জীবন সংস্কার-প্রসূত কতগুলি আচরণের সমষ্টি। এই আচরণ প্রথমে পিতামাতা আত্মীয় কুটুম্বগণের নিকট হইতে লাভ হয়। তারপর লাভ হয় সঙ্গীসাথী ও শিক্ষায়। আবার পূর্ব জন্মের সংস্কার প্রারব্ধ। এই সম্মিলিত কুশিক্ষকগণের প্রবল পরাক্রান্ত শিক্ষার হাত হইতে জীবকে মুক্ত করিতে পারে, মহাজনের আচরণ ও শিক্ষা। অবতার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই দুইটি প্রবল শক্তির সংগ্রামই দেবজীবন বা ভক্তজীবন — Divine life. মানুষ সর্বদা উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারে না। আহার শয়নাদি মানুষের স্বাভাবিক কর্ম তাহাকে টানিয়া নিচে লইয়া আসে। তাহাকে জোর করিয়া আপাতঃ অল্পশক্তি শুভবিচারের প্রতিকূলে লইয়া যায়। অর্জুনকে সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি'। পূর্ব সংস্কারের জমাটবাঁধার নামই প্রকৃতি। ইহাকে জয় করিতে পারেন কেবল নররূপী শ্রীভগবান। এই জন্য rituals অবতারের, বা মহাজনের আচরণ অবশ্য অনুকরণীয়।

ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। সম্পূর্ণরূপে হাতে আনিয়াছিলেন মানুষের এই জীবনবাদ্যের বোল

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইহারই নাম, বেদে বলে, সদাচার। ধর্মজীবনে ইহার প্রয়োজন কিন্তু অত্যন্ত বেশী। বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ে সাধনার প্রথম দিকে।

কচি আমের খোসা ফেলিয়া দিলে, আম পাওয়া যায় না। ধান জন্মিবার আগেই যদি তুষ ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে ধান হয় না। জীবনধারণকারী চালও পাওয়া যায় না। সকল প্রকার আচরণের মধ্যে অবতারের আচরণই অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

Rituals, mythology ও philosophy — অর্থাৎ মহাপুরুষগণের আচরণ, পূর্বজ মহাজনগণের জীবনের ইতিহাস ও আত্মতত্ত্বচর্চা — ধর্মজীবনে এই তিনটির প্রয়োজন। আচরণ ও পূর্বজ মহাপুরুষগণের জীবন বাদ দিয়া কেবল মাত্র ফিলজফির চর্চা করিলে উহা বুদ্ধিতেই কেবল পর্যবসিত হয়, হৃদয়ে প্রবেশ করে না, জীবনে ফলপ্রসূ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতগণের জীবন ইহা প্রমাণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কেবল পণ্ডিত দেখিলে খড়কুটোর মত মনে হয়। কিন্তু যদি বিবেক-বৈরাগ্যবান, আত্মতত্ত্ব উদ্ঘাটনে ব্রতী মহাপুরুষগণের সাধনপথের অনুগামী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দেখি, তাহাকে ভাল লোক মনে করি, আর সম্মান দিই। ধর্মাচরণবিবর্জিত পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে বলিতেন, চিল শকুন খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে — অর্থাৎ সংসারভোগে, কামিনীকাঞ্চনে। ঠাকুর পণ্ডিত পদ্মলোচনের খুব প্রশংসা করিতেন। কেন? তিনি মহাপুরুষগণের আচরণ অনুসরণ করিতেন। সাধনা করিতেন। তপস্যা করিতেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে ঠাকুর ভালবাসিতেন। তাই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সাধন ভজন দ্বারা আর একটু ব্রহ্মতত্ত্ব বোধ করিয়া লোকশিক্ষা দিতে।

সাধন দ্বারা ধর্মতত্ত্বের অনুভববিহীন ধর্মালোচনা নীরস, যেন শোলার আতা, কিম্বা জলে প্রতিবিম্বিত আম। তাই শ্রীম ভক্তগণকে নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরিত আচরণের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে বলিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি ইহার সাক্ষী।

নব্য শিক্ষিত পুঁথিগত শাস্ত্রালোচনাকারী আচরণে একজন সন্দিগ্ধচিত্ত যুবক ভক্তকে শ্রীম, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর রাত্রিতে বলিলেন, আপনি kindly (দয়া করিয়া) একটু খবর করবেন, সিংহবাহিনী এখন

কার বাড়িতে আছেন। ঠাকুর এই সিংহবাহিনীকে দর্শন ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিলেন। চরণামৃত গ্রহণ করিয়া করজোড়ে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না। তুমি সদা হৃদয়ে জাগ্রত থাক।' তারপর হৃদয়ে মাকে ভাবিতে ভাবিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সিংহবাহিনী জাগ্রতা দেবী।

শ্রীম-র আদেশ লইয়া পরদিন প্রত্যূষে ভক্ত কলিকাতা শহরে বাহির হইলেন। দুই এক স্থানে খবর করিয়া জানিলেন, সিংহবাহিনী এখন মতি শীলের বাড়িতে পূজিতা হইতেছেন। ভক্ত কলুটোলায় মতি শীলের বাড়িতে গিয়া মাকে দর্শন করিলেন। ইচ্ছা অনিচ্ছায় ঠাকুর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনুকরণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন — মা, আমার হৃদয়ে জাগ্রত হও। কিয়ৎকাল বসিয়া মায়ের ধ্যান করিলেন। তারপর চরণামৃত লইয়া বিদায় লইলেন।

ভক্ত শ্রীম-র কাছে ফিরিয়া আসিলে, তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন — ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করিয়াছিলেন তো? ভক্ত বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু টিয়াপাখীর মত। আপনার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই কথার আবৃত্তি করিয়াছিলাম। হৃদয় হইতে নয় — বুদ্ধি ও বাক্যের সাহায্যে মাত্র। শ্রীম তাঁহার কথা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, এরই নাম ভক্তি।

বলিলেন, এই আচরণই মনকে টানিয়া অন্য বাহ্য আচরণ হইতে মহাপুরুষের, অবতারের এই আচরণে একদিন প্রতিষ্ঠিত করিবে। মন তো স্থির হইয়া বসিতে পারে না। স্বভাব-চঞ্চল। এই মনকে এইরূপে বাহির হইতে টানিয়া আনিয়া মহাজনের আচরণে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টারই নাম তপস্যা।

বলিলেন, এরপর এই আচরণই অন্তরে প্রবেশ করিবে। মুখস্থ হইতে মনস্থ হইবে। মন হইতে পরে হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। মানুষ তখন হৃদয়স্থিত নঙ্গররূপী এই দৈবী সম্পদকে বুদ্ধিরূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়া জন্মান্তরের বহির্মুখী আসুরিক সম্পদের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকে। এইরূপে সংগ্রাম করিতে থাকিলে অবতারের জাগ্রত মহাবাক্য ও জীবন্ত জীবনবেদ আসিয়া

সহায়তা করে।

যদি এই জীবনেই এই সংগ্রামে সাধক বিজয়ী হয়, তাহা হইলে তাহার আত্মতত্ত্ব লাভ হইল। মৃত্যুঞ্জয় হইল। মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন — আত্মজ্ঞান লাভ হইল, জন্মমৃত্যুর নিদারুণ চক্র হইতে নির্মুক্ত হইল, পরম শান্তিসুখ আনন্দ লাভ হইল। জীবন সার্থক হইল, কৃতকৃত্য হইল।

আর যদি পরাজিত হইল, তবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা অনুসারে যোগীকুলে জন্ম লইয়া পরের জীবনে এই দুর্লভ আত্মতত্ত্ব লাভ করিবে।

অতএব অবতারের আচরণ অনুকরণীয়। ইহাতে তিনটি লাভ। প্রথম, এই জীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ। দ্বিতীয়, মরণেও আনন্দ, আবার মৃত্যুর পরপারেও আনন্দ। তখন জীবন-মরণ হয় একটি ঘটনা, তখন আনন্দই আনন্দ — কেবল আনন্দ।

শ্রীম-দর্শনের দশম ভাগে ঠাকুর মা স্বামীজী ও শ্রীম প্রমুখ তাঁহার অন্তরঙ্গগণের আচরণের দ্বারা লভ্য ব্রহ্মানন্দের সংবাদ পাওয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)। বিনীত
ঋষিকেশ (হিমালয়), গ্রন্থকার
স্নান পূর্ণিমা, ১৯৭০ খ্রীঃ।

প্রথম অধ্যায়

এক ঘটি কান্না — শিশুর মত কান্না

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। শ্রীম চারিতলের সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন বেঞ্চের উপর, দক্ষিণাস্য। শীত পড়িয়াছে। শ্রীম-র গায়ে সাদা সুয়েটার।

শচীনন্দন আসিয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। কলেজে পড়ে। এফ.এ. পাস করিয়াছে। শ্রীম তাহাকে বি.এ. পড়িতে বলিতেছেন। নিজে বি.এ.-র সংস্কৃত পড়াইয়াছেন। আর জগবন্ধু পড়াইয়াছেন ফিলজফি (দর্শনশাস্ত্র)।

অন্তেবাসী শ্রীম-র কাছে বাস করেন। স্বপাক হবিষ্য আহার করেন। শ্রীম বলেন, ঠাকুর ভক্তদের স্বপাক খাইতে বলিতেন। ইহাতে দুইটি লাভ। একটি, রান্না করার ভয় কাটিয়া যায়। শ্রীম বলেন, শরীর ধারণ করিতে হইলে আহার করিতে হইবে। সেই আহার নিজে প্রস্তুত করিলে স্বাধীনভাবে থাকা যায়। দ্বিতীয়টি, স্বপাক ভোজনে মন শুদ্ধ হয়। তাঁহারই আদেশ ও উদ্দীপনায় ভক্তরা নিজে রন্ধন করেন। শচীও অন্তেবাসীর সহিত এই দুই মাস ভোজন করিয়াছে। আজ শচী শ্রীম-র পদচ্ছায়া ছাড়িয়া রামপুরহাট যাইতেছে। তাহার শিক্ষক ও অভিভাবক মুকুন্দ লোক পাঠাইয়াছেন তাহাকে লইয়া যাইতে। মুকুন্দ রেক্টার।

শ্রীম বলিলেন — হ্যাঁ, মুকুন্দবাবুর শরীরটা বড়ই খারাপ। খুব সাবধানে থাকেন, আমাদের এই ইচ্ছা। তোমরা এ কথা তাঁকে বলো। ওঁর শরীরের যত্ন নিও। কত খাটুনী! Rest (বিশ্রাম) দরকার। বুদ্ধদেব বলেছিলেন মধ্যপন্থা নিতে — 'অবলম্বনীয় মধ্যপন্থা'।

আজ জগদ্ধাত্রীর ভাসান। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া প্রতিমা যাইতেছে। নানারকমের বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনিয়া শ্রীম রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলেন

— সঙ্গে অন্তেবাসী, বলাই ও গদাধর।

বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ঘোষেদের বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। দেবী দর্শন করিয়া ঠনঠনে মা-কালীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এবার নন্দীদের বাড়ির প্রতিমা বাহির করিতেছে। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়া বাদ্যযন্ত্রের সহিত অনেক প্রতিমা যাইতেছে গঙ্গায়। আর মাঝে মাঝে 'জয় জগদ্ধাত্রী মাঈকী জয়' এই ধ্বনি শুনা যাইতেছে।

এখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। শ্রীম প্রতিমা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন দ্বিতলে সভাগৃহে বসিয়া আছেন মাদুরে, পূর্বাস্য। তাঁহার তিন দিকে ভক্তগণ বসা — বিনয়, ছোট জিতেন, বলাই, গদাধর, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি। ডাক্তার কার্তিক বক্সী সপরিবারে কালীঘাটে মাকে দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন, সঙ্গে প্রচুর সন্দেশ আনিয়াছেন। ভক্তগণ আনন্দে তাহা গ্রহণ করিলেন। খানিক পর এটর্ণি বীরেন বসু আসিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর নির্মাল্য লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম-র হাতে দিলেন। ইনি জুতা ছাড়িয়া ইহা মাথায় ঠেকাইলেন। তারপর বুদ্ধিরামের হাতে দিলেন। বুদ্ধিরাম প্রায় দেড় ঘন্টা উহা হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। মনে হইতেছে, শ্রীম ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার হাতে উহা রাখিয়াছিলেন তাঁহার ধৈর্য পরীক্ষা করিবার জন্য।

ভক্তগণ দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। বলিতেছেন, মা তো একই। কেবল নামভেদে জগদ্ধাত্রী, কালীঘাটের মা-কালী, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী।

শ্রীম — আমাদের মা ঠাকরুণ এই জগদ্ধাত্রী-পূজা করতেন — ইষ্টপূজা। কত খাটুনী — সারা বৎসর ধ'রে তার আয়োজন হচ্ছে।

শ্রীম-র ইঙ্গিতে একজন ভক্ত বুদ্ধিরামের হাত হইতে নির্মাল্য লইয়া গেলেন।

শ্রীম (ঈষৎ হাস্যে বুদ্ধিরামের প্রতি) — আমি যে ত্যাগ করি নাই, এটা তো বোঝ। (অস্পষ্টভাবে) তিনি আমায় ত্যাগ করিয়ে নিলেন বলে, হ'ল। কি বল? তিনি ত্যাগ করিয়ে নিলে তবে ত্যাগ হয়।

বুদ্ধিরাম ও গদাধর সব ছাড়িয়া ইদানীং ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়াছেন। ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। আর ঈশ্বরের নাম করেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যতদিন না অভিমান 'আমি' ত্যাগ করেছি ততদিন ঠিক ত্যাগ হল না। তারপর হয় শরণাগতি — আমি পারলাম না ব'লে।

চেষ্টা করছে, একটু একটু ক'রে ছাড়ছে। তারপর দেখে, মন থেকে আসক্তি যায় না। তখন হয় সাধক শরণাগত। তখন কাঁদে আর বলে, মন থেকে সরিয়ে নাও আসক্তি।

বাহ্য ত্যাগও কি কম! মন থেকে কতক আসক্তি গেলে হয় বাহ্য ত্যাগ।

তা ঈশ্বর করিয়ে নেন। মানুষ কিছু করে না। কিন্তু বলে, আমি করেছি। তিনি বুঝতে দেন না। কেউ কেউ বুঝতে পারে এটা, তাঁর কৃপায়। তিনি ত্যাগ করিয়ে নিলে ত্যাগ হয়।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — একটা বেশ গল্প আছে। এক রাজার এক রাণী ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি রাজাকে প্রায়ই উপদেশ দেন — ঈশ্বর নিত্য, সংসার অনিত্য। নিত্য ঈশ্বরই গ্রাহ্য, সংসার ত্যাজ্য। রোজ এরূপ বলতে বলতে রাজার বৈরাগ্য হল। হঠাৎ একদিন রাজা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কাজেই রাজকার্য রাণী নিজেই পরিচালনা করছেন। রাণী ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা। তাই রাজকার্যে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তিনি বেশ বুঝতে পারেন কা'কে দিয়ে কোন কার্য করান দরকার। উপযুক্ত লোক উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে অতি সুচারুরূপে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। আর ভিতরে ভিতরে রাজার সন্ধানও নিতে লাগলেন, রাজা কোথায় তপস্যা করছে।

উপযুক্ত মন্ত্রীর হাতে রাজকার্য বেশ চলতে লাগলো। রাণী ভিতরে বসে জপ ধ্যান করেন। সকলে জানতে পেরেছে তিনি তপস্বিনী, সর্বদা তপস্যা করেন। কখনও হয়তো তিন চারদিন অন্দরমহল থেকে বের-ই হলেন না। মন্ত্রীদের উপর ভার রয়েছে। তারাই সব করছে। অর্থাৎ রাজকার্য automatic (স্বচ্ছন্দে) চালাবার ব্যবস্থা করলেন। আর লোক সব জেনে নিয়েছে, রাণী সর্বদা তপস্যা করছেন।

একদিন হঠাৎ বের হয়ে গেলেন। বাড়ির লোকদের বলে গেলেন, কাউকে এ কথা না বলে। তিনি রাজার কাছে গিয়ে হাজির। রাজা এক

পাহাড়ে তপস্যা করছিল, সে সংবাদ পূর্বেই নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ বালকের বেশ নিয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে চিনতে পারে নাই। রাজাকে ছদ্মবেশী রাণী বললেন, তোমার কিছুই হয় নাই — নিষ্ফল তপস্যা। রাজা বললো, সে কি কথা? আমি রাজা ছিলাম। আমার স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল, সব ছেড়েছি। আমার কিছুই হয় নাই, এ কি কথা! ব্রাহ্মণ বালক বললো, আরও ছ'মাস তপস্যা কর। আবার আমি এসে বলবো কতটা হলো তোমার। রাজা তাই করলো। আবার রাণী এলেন। আবার ঐ কথা — তোমার কিছুই হয় নাই। তপস্যা কর আরও।

রাজা ভাবলো, কেন এই কথা বললেন — এখনও হয় নাই। ভেবে ঠিক করলো, আমি কুটীরে রয়েছি বলে হয়তো একথা বলেছেন উনি। এই বলে কুটীর ত্যাগ করলো। আশ্রয় নিল বৃক্ষতলে। এখানে বসেও আরও ছয় মাস কঠোর তপস্যা করলো। আবার রাণী এলেন। রাজা বললো, এখন হয়েছে কি প্রভো? রাণী উত্তর করলে, না, এখনও হয় নাই। রাজা বুঝলো — ও, আমার আসন রয়েছে তাই। এবার আসনও ছাড়লো। আবার ছয় মাস তপস্যা করে। রাণী এবারেও এসে বললেন, এখনও হয় নাই। রাজা হতাশ হয়ে গেল, আর বললো, আর কি করবো? রাণী প্রশান্ত স্বরে বললেন, তপস্যা কর, জানতে পারবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমি ত্যাগ করেছি বলে যখন বোধ আছে তখন দেরী আছে। তিনি ত্যাগ করিয়ে নেন, আমি ত্যাগ করি নাই — এ বোধ যখন হবে তখনই ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়। এটাই সম্পূর্ণ শরণাগতি। ঠাকুরের কথায়, মাস্তুলে বসা। কিংবা অরুণোদয়। এরপরই সূর্যোদয়। তিনি কৃপা করে দর্শন দেন। জীব শিব হয়।

রাণী রাজাকে ভালবাসতেন। যথার্থ ভালবাসা কার? না, যে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। এ ভালবাসার ঋণ শোধ হয় না।

২

একজন ভক্ত — বাহ্য ত্যাগের কি কোন মূল্য নাই তা হলে?

শ্রীম — ঐ যে বলা হল পূর্বে আছে, তবে অল্প। আসল জিনিসটা দরকার। মন সাফ হওয়া চাই। মনটা হাবজা গোবজাতে পরিপূর্ণ। —

কেবল বাহ্য ত্যাগ করলে কি হয়? বাসনায় পূর্ণ যে মন — সব কামিনীকাঞ্চনের বাসনা। মান অভিমান — এ সবে পরিপূর্ণ। অভিমানটা যখন ক্ষীণ হয়ে যায় তখন বুঝতে পারে, আর একটা শক্তির হাতে সব। মানুষ helpless (অসহায়), তখনই অভিমানটা ত্যাগ হয়। এটা রক্তবীজের বংশ, সহজে যেতে চায় না। পেরে ওঠে না এই মহাশত্রুর সঙ্গে। তখনই দীনতা আসে। শরণাগত হয় এই ব'লে, আমি পারলাম না। তুমি ত্যাগ করিয়ে দাও। অসহায় অবস্থায় অন্তরভেদী কান্না আসে। ঠাকুর এই কান্না কেঁদেছিলেন, মা দেখা দাও বলে। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের দর্শন হল। শিশুর মত কান্না, যাকে তিনি বলতেন এক ঘটি কান্না। নিজে এই পথে গিছলেন। ভক্তদের তাই এই সোজা পথ দিয়ে গেছেন। এই তেজবীর্যহীনকারী কলিতে এটা সহজ পথ। এইটা ঠাকুরের অবদান এ যুগে — এই ব্যাকুল ক্রন্দন!

বাহ্য ত্যাগ করলে এক step (ধাপ) এগিয়ে গেল। তখন অন্তর থেকে ত্যাগ আসতে পারে, এই সম্ভাবনা থাকে। অন্তর থেকে কখন ত্যাগ হয় অহংকার? যখন দেখে নানা রকম চেষ্টা করেও কিছুতেই বাগ মানছে না, নিজের শক্তি ওর কাছে অতি দুর্বল বলে বোধ হয়, সব চেষ্টা উল্টে দিচ্ছে নির্মমভাবে, কি দুর্দমনীয় একটা শক্তি এসে সব সঙ্কল্প, চেষ্টা উল্টে পাল্টে দিচ্ছে তখনই সেই শক্তির কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করে। বলে, যা হয় তুমি কর, আমার দ্বারা হচ্ছে না। শরণাগত। এটা ভক্তির পথ।

জ্ঞানপথেও তাই। বুদ্ধদেবের কি পুরুষকার! কত করলেন। কিছুতেই বাগ মানছে না অহংকার। এরই নাম অবিদ্যা। একটি মাত্র তিল আহার করতেন। তখন মা বললেন, এতে হবে না। শরীর ত্যাগ করলেই আত্মজ্ঞান হয় না। খাও, মধ্যপন্থা গ্রহণ কর। অর্থাৎ না ভোগী, না কেবল শুষ্ক ত্যাগী। ঠাকুর বলতেন, চেষ্টা করছে দেখলে, মা কাউকে দিয়ে বলিয়ে দেন এই এই কর। কখনো নিজে করে দেন।

মায়ের দুই রকম ছেলে থাকে। একটা মায়ের কাছে সব বলে, চায়। মায়ের আদরে খুশি। মা নারাজ হলে সে ভয়ে কাঁদে। তাঁর প্রসন্ন মুখ চায়। আর একটা ছেলে ডানপিটে। সে মুখে বলবে না কিছু। কিন্তু অন্তরে

মায়ের উপর টান আছে, অভিমান আছে, ঠাকুর বলতেন বেড়ালের ছা-র স্বভাব আর বানরের ছা-র স্বভাব।

গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' (গীতা ১৮:৬৬) ভাবও এইটে। সবটা মন কুড়িয়ে এনে একস্থানে রাখা। সেই স্থানটি 'মামেকং'। এই অবস্থায় সর্বত্রই তাঁকে দেখতে চেষ্টা করে — জীবজন্তু সমগ্র জগৎ। সাধকের এই চরম অবস্থা। এরই ইঙ্গিত রয়েছে বেদে — 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' মন্ত্রে।

(ঈশাবাস্য উপনিষদ — ১)

তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর স্বরূপ দর্শন হলে তখন 'ঈশাবাস্যম্' ভাবটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। মা মূল অবিদ্যার পরদা সরিয়ে নিয়ে যান তখন। সেই অবস্থায় মা-ই সব হয়ে রয়েছেন দেখে। 'ইদং সর্বং' মানে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ। এইটা মায়েরই রূপ। রতির মাও মায়ের রূপ, রাজমিস্ত্রীর জোগান দেওয়া মেয়েটিও মায়ের রূপ, আবার বিড়ালটিও মায়ের রূপ। অন্তরে বাহিরে মা, ঠাকুর দেখতেন। এই অবস্থাতে স্থিতি লাভ ক'রেই ঠাকুর বলেছিলেন — 'ঋষিরা ভয়তরাসে'।

প্রথমে ভাব আরোপ করা। গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসে এর জন্ম। শেষে হয় সাক্ষাৎ দর্শন। এটা পাকা ভাব।

এই-ই শেষ নয়। ঠাকুর বলতেন, মা আরও কত কি! তবে এই পর্যন্ত হলেই জন্ম-মরণ সমস্যার শেষ হয়ে গেল। জীব শিব।

ঠাকুর এরপরও কত অসংখ্য ভাবে মাকে দেখতেন — নিত্য নূতনভাবে, নিত্যনূতন রূপে। তাঁর ইতি হয় না, বলতেন। এটাকে সিদ্ধের সিদ্ধ অবস্থা বলে ইঙ্গিত করতেন। বেদে বলেছে এটাকে, তুরীয়াতীত অবস্থা।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — শোন নাই ঠাকুরের হাতী ও তপস্বীর গল্প? এক তপস্বী অনেক তপস্যা করে কিছু শক্তি লাভ করলো। ভিতরে অভিমান হয়েছে, আমি যোগ-বিভূতির অধিকারী। একদিন নারদ মুনি ঐ আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। আশ্রমে উঁকি মেরে নমস্কার করে বললেন, আপনার তপস্যার কুশল তো — কতদূর হলো? তপস্বী প্রতি-নমস্কার করে খুব confidently (দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত) বললো, আজ্ঞে অনেকটা হয়েছে। আমি ঐ হাতীটাকে বলা মাত্র মেরে ফেলতে পারি, আবার

জিয়াতে পারি। নারদ কল্পিত বিস্ময়ে উত্তর করিলেন, তা'হলে তো আপনার খুব হয়েছে দেখছি! আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আপনার ভগবান লাভ হয়েছে কি? তপস্বী জোড় হাত করে বললেন, আজ্ঞে না। নারদ বললেন, তবে আর কি হলো? এতো ভোজবাজী!

এ কেমন? না, ঠাকুরের কথায়, বাগ্‌দী উপপতি করা যেমন। ব্রাহ্মণ বালবিধবা। সারা জীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে শেষ বয়সে করলো বাগ্‌দী উপপতি।

শ্রীম (মুচকি হাস্যে বুদ্ধিরামের প্রতি) — কি তোমার এমন করার ইচ্ছা হয় না — হাতী মারা ও হাতী জিয়ানোর?

হাসপাতাল ডিসপেনসারী — এ সব চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায় না। কেমন, তুমি চাও না এ সব?

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে, সকলের প্রতি) — তাঁকে বলতে হয় দেখা দাও, দেখা দাও বলে — খালি জপ ধ্যান নয়। আর মাঝে মাঝে নির্জনে গান গাইতে হয়। গান গেয়ে ঐ বলতে হয়।

একজন যুবক — শুধু মুখে বললেই হবে — দেখা দাও, দেখা দাও? অন্তর থেকে যে আসে না।

শ্রীম — হাঁ, তাতেই হবে। মুখে বলতে বলতে শেষে অন্তর থেকে আসবে। মুখস্থ করতে করতে মনস্থ হয়। তারপর ঢোকে অন্তরে, হৃদয়ে।

কথাটা হচ্ছে, প্রথম শব্দ অর্থাৎ শ্রবণ। তারপর ওটা নিয়ে মনন — মানে deep thinking (গভীর চিন্তন)। তারপর, নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ গভীর ধ্যান। মননের সময়ও সংকট থাকে। তারপর সিদ্ধান্ত লাভ হলে, ঐ এক চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকা। ঐ চিন্তাময় হয়ে পড়ে থাকা। এ অবস্থায়ই head and heart (বুদ্ধি ও হৃদয়) এক হয়ে যায় প্রায়। একেই ঠাকুর বলতেন, মন মুখ এক করা — word, thought and realisation (কথা, মন ও অনুভব) এক হয়ে যায় প্রায়। 'প্রায়' কেন? না, তখনও direct realisation (সাক্ষাৎ দর্শন) হয় নি, তাই 'প্রায়'। এই তিনটে, শেষে একটা পয়েন্টে এসে যায়। তখনই সাক্ষাৎকার।

গানে খুব শীঘ্র head and heart (বুদ্ধি ও হৃদয়) এক হয়ে যায়।

তাই ঠাকুর নির্জনে গান গাইতে বলেছিলেন। In a moment a changed man (মুহূর্তে মানুষের মন বদল) হয়ে যায়। Momentary (মুহুর্তের জন্য) হোক তবুও ভাল। একবার আস্বাদ পেলে ঐটে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে। তখন অন্য জিনিস ভাল লাগবে না। সব করছে, কিন্তু মন ঐ আনন্দটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর এটা permanent (স্থায়ী) করার চেষ্টা হবে। সর্বাবস্থায় এই আনন্দটি ধ'রে রাখতে পারলে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ঠাকুর একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, উন্মনা সমাধি একটা আছে, হঠাৎ সবটা মন কুড়িয়ে তাঁ'তে মগ্ন হয়ে যায়।

নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বলতে বলতে এর অভ্যাস হয়। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, তারপর হাজার কাজে থাক, তখন মনকে হঠাৎ তুলে নিয়ে একেবারে তাঁ'তে লাগান যায়।

কোন problem (সমস্যা) ঠাকুর বাকী রাখেন নাই — সংসার করা থেকে সাধন সিদ্ধি, সিদ্ধির সিদ্ধি সব অবস্থার কথা বলে গেছেন। অবসর কোথা ঐ সব কথা ভাববার? যারা মহাভাগ্যবান, তারাই তাঁর এই অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৬ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২০শে কার্তিক, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা দশমী ২৬ দণ্ড। ১২ পল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংসার - অনল ও শান্তিবারি — উভয়ই আছে এখানে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার কক্ষ। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, শচীনন্দন ও গদাধর শ্রীম-র সম্মুখে ও বামহাতে বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। বুদ্ধিরাম ছাদে জপ করিতেছেন।

আজ ৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রী, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, শুক্লা অষ্টমী।

একটু শীত পড়িয়াছে। শ্রীম-র মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে জড়ান বালাপোষ। কথামৃত ছাপা হইতেছে। অন্তেবাসীর সঙ্গে এবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ইচ্ছা থাকলে মানুষ কি না করতে পারে? ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হতে পারে, আর সাংসারিক বিষয় লাভ হয় না? ইচ্ছা চাই। এই ইংরেজরা জগৎটা ভোগ করছে কেন? না তাদের প্রবল ইচ্ছা রয়েছে এই ভোগে। তাই হচ্ছে। প্রবল ইচ্ছা চাই। তবেই চেষ্টাও আসে।

যে ইচ্ছা করে — আমি ঈশ্বরদর্শন করবো, সে অনেকটা এগুতে পারে। মানুষের প্রবল ইচ্ছা থাকলেই তিনি কৃপা করেন। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে মা এসে কোলে তুলে নেয়, ঠাকুর বলতেন।

ইচ্ছা দৃঢ় চাই। অনেকের যেন চিঁড়ের ফলার — আঁট নাই কাজে। মানে, ভিতরে নাই প্রবল ইচ্ছা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে) — ওদের ইচ্ছা আছে। ওদের এক বছরের কাজ এক মাসে হয়ে যাবে।

ভক্তরা কেহ কেহ পড়ার সুযোগ পায় নাই। অল্প বয়সেই কর্ম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন তাহাদের পড়ার ইচ্ছা হইয়াছে। গীতা উপনিষদাদি পড়িতেছে।

শ্রীম (একজন শিক্ষকের প্রতি) — ইস্কুলের ছেলেগুলি দু'প্রস্থ মার খায় — এখানে, আবার গার্ডিয়ানদের হাতে। তবুও কিছু হচ্ছে না। ইচ্ছা নাই যে!

আর এদের ইচ্ছা যখন রয়েছে তখন আর কি? ও বলে, আমি চৌদ্দখানা থেকে আঠার খানা (হাতে রুটি বানানোর অভিনয় করিয়া) এমন এমন করেছি। যে বাবুদের বাড়িতে থাকতো, বই পড়ছে দেখলে তারা রেগে যেতো। ভয়ে উনুনের নিচে বই লুকিয়ে রেখে দিত। ওরা চলে গেলে খুলে পড়তো।

শ্রীম অন্তর্মুখীন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটু নামাজ পড়ে নেওয়া যাক। আপনারা এখানে থাকলে নড়তে চড়তে পারবেন না। না হয়, বাইরে যেতে পারেন। এখানে বসলে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে।

ধ্যান করতে হয় চুপচাপ। কোনও কথা বা শব্দ হবে না। নড়ন চড়ন কিছু হবে না। স্থির হয়ে বসে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

একবার মা ধ্যান করছিলেন। কে একজন গিয়ে জোরে ডাক দিল। ধ্যান ভেঙ্গে গেল। আর অমনি আর্তনাদ করে উঠলেন। শুনে ঠাকুর নিজের ঘর থেকে ছুটে এলেন। মা ন'বতে ছিলেন। তখন শান্ত হন। অন্যদের বলেন, ধ্যানের সময় কারুকে ডাক দিতে নেই। কোনও শব্দ করতে নেই।

ধ্যানের সময় চোখ বুজে বসে কেন? না, অন্য বিষয় চোখে না পড়ে। তা'তে মন চঞ্চল হয়। ধ্যানের আগে determination (সংকল্প) করতে হয় — কিছুতেই চোখ খুলব না।

ধ্যান কি কম জিনিস গা! খালের সঙ্গে গঙ্গার যোগ হয়ে যায়। একই জল উভয় স্থানে। ঐ যোগে পশু-মানুষ দেবতা হয়ে যায়। মানুষের ভিতর তিনিই রয়েছেন কিনা — পশু, মানুষ ও দেবতা।

পশুভাব — মানে, হীন ভাব — আহারবিহারকারী জীব-ভাব।

মানুষ-ভাব মানে, যাতে বিচার চলে — ভাল মন্দ। শাস্ত্র, গুরুবাক্য শুনে নিজের দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখন। দেবতা মানে, আমি ঈশ্বরের সন্তান 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (শ্বেতা ২:৫), এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ধ্যানে সে-টি হয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও। যখন তাঁর সাক্ষাৎকার হয়, তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ঐ দেবভাব।

রোজ রোজ অল্প অল্প ধ্যান করতে হয়। ঐ করতে করতে ঐ ভাবের স্ফূরণ হয় — দেবভাবের। আমি ঈশ্বরের সন্তান, ভাবতে ভাবতে শেষে ঐ হয়ে যায়। একটু বাকী থাকে। সেটুকু তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হলে হয়ে গেল সম্পূর্ণ। সাক্ষাৎকার যতদিন না হচ্ছে ততদিন গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরুবাক্য মানে অবতারের বাক্য। ঐ করতে করতে কতক পরিমাণ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। অনুভূতি হয় কিছু নিজের দেবত্বের। তখন কাম-ক্রোধাদি কমে যায়, ঈর্ষা দ্বেষ কমে যায়। সকলের উপর প্রেমভাব আসে — সবে তাঁর অধিষ্ঠান জেনে। ঠাকুর তাই বলতেন, ধ্যানে পুকুরের মাছ গিয়ে যেন সমুদ্রে পড়লো।

শ্রীম-র এই মধুর তিরস্কার দৈববাণীর মত কাজ করিল। ভক্তগণ চোখ বুজিয়া শান্তভাবে বসিয়া রহিলেন লজ্জায়, যেমন স্কুলের ছেলেরা বসিয়া থাকে মাস্টারের প্রহারের ভয়ে। শ্রীম এক ঘন্টা ধ্যান করিলেন ভক্তসঙ্গে।

তিনি এবার গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ' চলিতেছে।

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।' (গীতা ২:৫৬)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যেমন ঠাকুর। সুখ দুঃখ বোধ নাই। মানাপমান বোধ নাই। কি করে বোধ হবে? স্বরূপে যে রয়েছেন ঠাকুর সর্বদা। যে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দেখতে পায় তার হয় এ অবস্থা। ঠাকুরের হয়েছিল এ-টি। একদিন নয় — চব্বিশ ঘন্টা, জীবনভর।

শুধু কি তাই? তারও উপরের অবস্থা সব হয়েছিল ঠাকুরের। অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরদর্শন নয় শুধু, আমিই ঈশ্বর, এ বোধও হয়েছিল ঐ একসঙ্গে।

ভক্তভাবে দেখতেন, অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর। ঈশ্বরভাবে দেখতেন, আমিই ঈশ্বর — একসঙ্গে এই দুই অনুভূতি ঠাকুরের ছিল। জীবের হয়

না এ অবস্থা অবতার ছাড়া।

এ-টি হল আদর্শ। দুঃখে উদ্বেগ নাই, সুখে ভোগের ইচ্ছা নাই।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — দেখ, ইচ্ছা থাকলে সব হয়। তুমি যদি ইচ্ছা কর, গীতা উপনিষদ সব জানতে পারবে। আবার এর ভিতরের ভাবও জানতে পারবে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম শুনেছো? খুব গরীব ছিলেন। বাবা ছয় টাকা মাইনেতে খাতা লিখতেন। বিদ্যাসাগর মশায় ইস্কুলে পড়তেন। নিজেকে আবার রাঁধতে হতো। চার পাঁচ ভাই সঙ্গে। সকলের জন্য রাঁধতেন। তারই ভিতর ফাঁক করে পড়তেন। সর্বদা জলপানি (স্কলারশিপ) পেতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওদের ঐ সব (শুভকার্য) পরিশ্রম, সংসারী লোকদের জন্য। আর এর (বুদ্ধিরামের) হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য। কত তফাৎ। তাই সে সাধুকে মহাত্মা বলে।

অন্য লোকের মহাত্মা, সে নিজে নিজে বলে। কত তফাৎ — এ-তে, আর ও-তে।

শ্রীম পুনরায় গীতা পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — মনটাকে ভগবানে নিবিষ্ট করার জন্য অত সব কথা। সাধন ভজন তারই জন্য। যাঁদের অন্য চেষ্টা নাই শুধু এই চেষ্টা, তাঁদেরই বলে মহাত্মা — great souls. তাঁরা আবার greatest, (সর্বশ্রেষ্ঠ) যাঁরা তাঁর সঙ্গে মনকে যোগ করেন বা করতে চেষ্টা করেন।

নিজে নিজে যারা মহাত্মা, কিংবা সংসারী লোক যাদের মহাত্মা বলে, তাদের কি এই ভাব? উদ্দেশ্য ঈশ্বর না হলে মহাত্মা হয় না।

লোকসেবায়ও মহাত্মা হয় না। তবে যদি লোকের ভিতর যে ভগবান রয়েছেন, তাঁর সেবা করে তবে হয়।

যাঁরা মহাত্মা তাঁদেরই বুদ্ধি স্থির, কুটস্থ বুদ্ধি — হেলে না। একটু এদিক ওদিক হলেও আবার ঈশ্বরে এসে যায়।

তাঁদের আহারবিহার, চলনবলন — সমস্ত ব্যাপারই অন্যরকম। সব কাজ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে করেন। যদি দেখেন, কোনও কাজ অন্যরকম করে মনকে, তখনই তা ছেড়ে দিবেন। বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, ধন জন — সব ছেড়ে দেন তাঁরা।

সংসার এক দিকে, আর ঈশ্বর এক দিকে। যখন তাঁর সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, তখন মনের একাগ্রতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এর পূর্বে অভ্যাস করতে হয়।

সাধারণ সিদ্ধপুরুষ যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে, তাঁ'তে আর অবতারে, অনেক তফাৎ। অবতারের এই ভাব সর্বদা থাকে, এ-টি স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে ছদ্মবেশী ঈশ্বর — সচ্চিদানন্দ মানুষ রূপে এসেছেন।

সবটি মন কুড়িয়ে ভগবানে বসান।

ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন একটি ভক্তকে (শ্রীমকে), সবটা মন কুড়িয়ে যদি এখানে (ঠাকুরে) এল, তবে তার আর কি বাকী রইল? সেই ভক্তটি খালি একমনে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতো।

আবার বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা করলেই হবে।' তাকেই বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' তাঁর ঐশ্বর্য — ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি।

কে বলতে পারে এ কথা ঈশ্বর ছাড়া? কার আছে অত বড় বুকের পাটা?

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের যা লক্ষণ বলা হয়েছে, তা সব ঠাকুরের জীবনে দেখা গেছে। আরও বেশি দেখেছি। ঠাকুরের জীবন গীতার জীবন্ত ভাষ্য। গীতা শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবনবাণী।

শচী — এখন পৌনে ন'টা।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — তা'হলে উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন।

ছোট জিতেন ও অন্য একজন উঠিয়া পড়িলেন। অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, ধিক্ কর্ম, ধিক্ গোলামী।

২

শ্রীম গতরাত্রিতে অন্তেবাসীকে একটি কাজের কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — সিংহবাহিনী কোথায় আছেন, জেনে আসতে পারেন কি সকালে? কাশী মল্লিকের বাড়ি কিংবা মতি শীলের বাড়ি? একবার মর্নিং ওয়াকে (সকালে বেড়াতে বেড়াতে) দেখে এলে হয়। ঠাকুর দর্শন করেছিলেন মাকে যদু মল্লিকের বাড়ি। অনেকদিনের

দেবতা। ঠাকুর যেকালে দর্শন প্রণাম ও প্রার্থনা করেছিলেন, তা'তে মা জাগ্রত হয়ে রয়েছেন। ফস্ করে একবার খবর নিয়ে আসুন না। আর প্রণাম করে আসবেন। তারপর আমরাও যাব মাকে প্রণাম করতে।

এরই নাম ভক্তি — অবতার যা করেছেন ও করতে বলেছেন, ভক্তদের তা করা। এই সব নিয়ে থাকা আর কি। 'দাগা বুলান' স্বামীজী বলতেন।

মানুষ ভক্তি ভক্তি করে। কিসে হবে তা বললে করতে চায় না। Determination (দৃঢ় সংকল্প) চাই। Determination (দৃঢ় সংকল্প) থাকলে কি না হয়?

ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি পাগলের মত ছোটাছুটি করতাম, কোথায় দেবতা, কোথায় ভাগবত, কোথায় গীতা পাঠ হচ্ছে, সে সব স্থানে!'

প্রথম প্রথম এ সব করতে হয়। তা হলে মনের খেদ মিটে। পরে মনে আর কষ্ট হয় না বৃদ্ধ বয়সে। মন তখন বলে কিনা, কিছুই করলাম না তাঁর জন্য। এ বড় জ্বালাতন, এই পশ্চাৎতাপ। তাই বয়স থাকতে এ সব করে নিতে হয়। তারপর একস্থানে বসে রোমন্থন করা। যা দেখছি যা শুনেছি, এ সব নিয়ে থাকা।

সিংহবাহিনী কি কম গা? ঠাকুর যে কালে দর্শন প্রণাম ও কেঁদে প্রার্থনা করেছেন, তখন জাগ্রত দেবতা।

জীবন যৌবন এই করে কাটাতে হয়। This is the best use of life (মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ)।

ভোর সাড়ে ছয়টা। অন্তেবাসী সিংহবাহিনীর সন্ধানে বাহির হইলেন। সঙ্গী হইলেন জিতেন মুখার্জী। কাশী মল্লিকের বাড়ি গিয়া জানিতে পারিলেন, মা সিংহবাহিনী এখন মতি শীলের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। পালা করিয়া মা ভক্তদের বাড়িতে পূজা গ্রহণ করেন।

মতি শীলের দুর্গামণ্ডপে মা বিরাজিতা। তিনি সুবর্ণময়ী, নানা অলংকারে বিভূষিতা। শ্রীম-র আদেশমত ভক্তগণ ভক্তিভরে দর্শন, ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সকাল প্রায় নয়টা। মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দার পশ্চিমাংশে শ্রীম বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে, দক্ষিণাস্য। পশ্চিমের ঘরে শচী রান্নার আয়োজন করিতেছে।

শ্রীম সিংহবাহিনীর সংবাদের জন্য ব্যাকুল। ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সন্তানের জন্য পিতামাতা, কিংবা মাতাপিতার জন্য সন্তান যেরূপ ব্যাকুল, শ্রীম-র অবস্থা তাই। ভক্তদের দেখামাত্রই পাশে বেঞ্চেতে বসাইয়া খুঁটিনাটি সব সংবাদ লইতেছেন। মায়ের পরনে কি ছিল, শরীরে কি কি অলংকার ছিল, তাঁর গলায় কি ফুলের মালা ছিল, এই সব প্রশ্ন। বলিতেছেন, দর্শনে আনন্দ হয়েছিল তো? প্রার্থনা করেছিলেন তো জ্ঞানভক্তির জন্য? এ করতে হয়। মুখে মুখে করতে করতে শেষকালে অন্তর থেকে আসে। মন্দিরে গেলে স্তব স্তুতি গান, এ সব করা উচিত। বসে জপ ধ্যান করতে হয়। চরণামৃত নিতে হয়। সব নিরীক্ষণ করে দেখতে হয়, যাতে মনে দাগ লাগে। তা হলে দূরে বসেও ঐ দর্শন চিন্তন চলতে পারে।

হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না — ও সব কুসংস্কার বলে। যদি সর্বাবস্থায় চিত্তে শান্তি চাও তবে এ সব করতে হবে। এ সব ক'রে ক'রে ভক্তি জন্মে অন্তরে। মানে, ভগবানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক হয়। তা হয়ে গেলেই বেঁচে গেলে। যেমন জ্বলন্ত অনল সংসার, তেমনি ঈশ্বরের সুপ্রচুর আয়োজন শান্তিবারির। এই সব শান্তিবারি — ভগবৎ কথা, তীর্থ, সাধু, দেবালয় ইত্যাদি।

যিনি এই সংসার-অনল সৃষ্টি করেছেন তিনিই এই সব শান্তিলাভের আয়োজন করে রেখেছেন।

ভক্তরা দেখিতেছেন, শ্রীম-র শরীর বসিয়া আছে মর্টন স্কুলে, কিন্তু মন নিবিষ্ট শ্রীভগবানে। মন ভ্রমণ করিতেছে তীর্থে, তপস্যায়, দেবালয়ে, সাধুসঙ্গে।

সিংহবাহিনীর সংবাদ শুনিতে শুনিতে শ্রীম ভগবৎ উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়াছেন, দাঁড়াইয়া পড়িলেন নিকটবর্তী ঠনঠনিয়ার মা কালীকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য। তাঁহার সঙ্গী হইলেন — বিনয়, শচী, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ছোট জিতেন, নরেন্দ্র আর জগবন্ধু।

শ্রীম বেচু চাটার্জী স্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন। পাশের ঘোষদের বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। এখানে মা জগদ্ধাত্রীর পূজা হয়। তারপর মা কালীর মন্দির।

মায়ের সম্মুখে শ্রীম বসিয়া ধ্যান করিতেছেন দরজার পশ্চিম দিকে। ভক্তগণ সব পিছনে। আধঘন্টা পর মায়ের চরণামৃত লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুরবাড়ির দিকে চলিতেছেন, ভক্তগণ সঙ্গে। বলিলেন, আপনারা স্কুলবাড়িতে এগোন। আমি একটু পর আসছি। ভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গে আনিয়াছেন প্রসাদী বেগুনি আর মুড়ি।

এখন বেলা বারোটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি হইতে আহার করিয়া ফিরিয়াছেন। দ্বিতলের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছেন।

হঠাৎ মনোরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশ ফরিদপুরে। এইমাত্র গাড়ি হইতে নামিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তিনি যাইবেন বেলেঘাটা। সেখানে ভক্তপ্রবর শুকলালের কাছে কর্ম করেন, ম্যানেজার। মনোরঞ্জন ভক্ত ও ব্রহ্মচারী। শ্রীম তাঁহাকে পাশে বসাইয়া সস্নেহে পূর্ববঙ্গে ঠাকুরের নাম প্রচারের কথা কহিতেছেন।

পাশের ঘরেতে অন্তেবাসী ও শচী থাকেন। তাঁহাদের রান্না হইতেছে। শ্রীম বলিলেন, রান্না হয়ে গেলে মাকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পান। এখনও তো দেরী আছে। ততক্ষণ মেঝেতে বসে সকলে মায়ের স্তবগান করুন। ঠাকুর ভক্তদের দিয়ে মাঝে মাঝে এরূপ রান্না করিয়ে ভোগ নিবেদন করাতেন। তারপর সকলে বসে প্রসাদ পেতেন। তিনি নিজে বসতেন। কেন করাতেন? এতদিনে বুঝতে পারছি। যে মন সংসার ভাবতে ভাবতে সংসারী হয়ে যায়, সেই মনই ঈশ্বর ভাবতে ভাবতে ঈশ্বর হয়ে যায়। এইটে হল মনের ধর্ম। বলতেন, মন যে রঙে ছোপাবে সেই রং ধরবে।

ভক্তগণ মায়ের চণ্ডীর স্তব গাহিতেছেন শ্রীম-র নির্দেশে। এখন জগদ্ধাত্রী পূজা চলিতেছে।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম।।

* * * * *

অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ।।

শ্রীম পাশে বসিয়া সব শুনিতেছেন। স্তিমিত লোচন। চক্ষুর কোণ বহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। ভক্তগণ একঘন্টা উন্মত্ত হইয়া কীর্তন

করিতেছেন।

পঙ্গত বসিয়াছে। ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন — জগবন্ধু, শচী, বিনয়, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ছোট জিতেন ও মনোরঞ্জন। শ্রীম দর্শন করিতেছেন।

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম ডাক্তার বক্সীর মোটরে চড়িয়া চিৎপুরে আদি সমাজে রওনা হইলেন। ভক্তদের বলিয়া গেলেন, আপনারা হেঁটে আসুন। গাড়িতে স্থানাভাব। ঠাকুর বলতেন, দেবস্থানে দীনহীন ভাবে যেতে হয়, কষ্ট করে পায়ে হেঁটে। আমরা বুড়ো হয়েছি কিনা। তাই চলতে পারি না।

আদি সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন ওখানকার উপাসনা দেখিতে। সেখানেই যুবক কেশব সেনকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন এই বলিয়া — 'এর ফাতনা ডুবেছে'। এই সমাজমন্দির শ্রীম-র নিকট তাই পবিত্র। এখানকার বেদপাঠ ও বৈদিক ভাবপূর্ণ ভজন শ্রীম-র অতি প্রিয়। প্রতি বুধবারে উপাসনা হয়। একজন ভক্তের উপর ভার, তিনি গিয়া শ্রীমকে রিপোর্ট দেন, কোন্ গান হইয়াছে ও বেদের কোন্ অংশ পাঠ হইয়াছে।

ভক্তগণ পদব্রজে চলিতেছেন আদি সমাজে — ছোট জিতেন, বিনয়, শচী, জগবন্ধু, বলাই, শান্তি, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি। পৌনে সাতটায় তাঁহারা সমাজমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। একটু পর পৌঁছিলেন ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, বড় অমূল্য, আর মোটা সুধীর। এখানকার রিপোর্টার মোটা সুধীর।

ভক্তরা ঠন্‌ঠনেতে নন্দীদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীর আরতি দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীম সমাজমন্দিরে বসিয়া বেদপাঠ শুনিতেছেন। পরে শুনিলেন প্রার্থনা।

রাত্রি আটটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে চোরবাগানে অমৃতলাল গুপ্তের গৃহে প্রবেশ করিলেন। অমৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত, শ্রীম-র প্রিয়। তিনি গৃহে জগদ্ধাত্রীকে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাই শ্রীম ও ভক্তগণের নিমন্ত্রণ।

শ্রীম রাস্তার পাশের ঠাকুরঘরে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। পশ্চিমের দরজার উত্তরাংশে। ভক্তগণ ঠাকুর প্রণাম করিয়া ছাদে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাসও প্রসাদ পাইতেছেন।

বিদায়ের সময় দেখা গেল বিনয়ের পাদুকার অন্তর্ধান হইয়াছে।

নিচে কালীকীর্তন হইতেছে সম্মুখের বাড়িতে — 'মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে'।

রাত্রি নয়টা। শ্রীম মতি শীলের ঠাকুর-দালানে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে মা সিংহবাহিনী। বারবার দর্শন ও করজোড়ে প্রণাম করিতেছেন, যেন জীবন্ত দেখিতেছেন। মন প্রশান্ত, ছেলে যেন মাকে কি কহিতেছেন অন্তরের ভাষায়।

নাটমন্দিরে মায়ের আগমনে ভগবল্লীলার অভিনয় হইতেছে। কলিকাতা আজ আনন্দে মগন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৫ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৯ কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল।
বুধবার, শুক্লা নবমী, ২২ দণ্ড। ৫ পল।

তৃতীয় অধ্যায়

এক একটি কথা যেন এক একটি দীপ

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম ছাদে আসিয়াছেন, অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, কই গেলেন না? দেরী হয়ে যাচ্ছে। অন্তেবাসী তখনই বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গী হইলেন ছোট জিতেন, বিনয় ও শচীনন্দন। তাঁহারা সায়েন্স কলেজে যাইবেন।

আজ ২রা নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ ১৬ কার্তিক ১৩৩১ সাল, রবিবার শুক্লা ষষ্ঠী, ৪০ দণ্ড। ৫৪ পল।

মহাত্মা শরচ্চন্দ্র মিত্র সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য, আর এলাহাবাদের ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবের প্রাণ। বিবেকানন্দ সোসাইটির-ও অকৃত্রিম সেবক। শ্রীগুরুদেবের আদেশে দরিদ্র-নারায়ণ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রমী হইয়াও সন্ন্যাসীবৎ জীবনযাপন করিয়াছেন। এই মহাপ্রাণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হইতেছে সায়েন্স কলেজে।

সমিতির একজন সেবক গাহিতেছেন —

হে মহান, হে কর্মবীর, কোথা হতে এসেছিলে
....
দয়ার আকর তুমি, ব্যথায় ব্যথিত তুমি,
দীনদুঃখ মোচন করিতে অতি বিরলে।
কে আর শোনাবে নাম "শ্রীরামকৃষ্ণ" অবিরাম,
কে আর গাঁথিবে হার সঙ্গীত ভকতিফুলে ॥ ইত্যাদি।

আর একজন বন্ধু গাহিলেন —

জগদীশ, কৈশোর হইতে যিনি তোমার সেবায়
করেছেন সদা যুক্ত মন-প্রাণ-কায়;

পর উপকারে যিনি ছিলেন নিরত
দরিদ্রে সাহায্য দান ছিল যাঁর ব্রত,
ধর্মের চর্চায় যাঁর কাটিত সময়
....
তাঁহারে করিও কৃপা ঠাকুর দয়াময়
তোমার সেবক তিনি, ছিল ভক্তিপর। ইত্যাদি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। নববিধান ব্রাহ্মমন্দির। শ্রীম পশ্চিমের দিকের একটি বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ অনেকেই সঙ্গে আছেন। শরৎ-স্মৃতিসভা হইতে ফিরিয়া কেহ কেহ এখানে আসিয়াছেন। বেদীতে বসা আচার্য প্রমথ সেন, কেশববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত তিনি কেশববাবুর মুখে করিয়া ভক্তগণকে পরিবেশন করিতেছেন।

এখন রাত্রি আটটা। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের সভাগৃহে শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন। তিন দিকে বসা ভক্তগণ — শুকলাল, মনোরঞ্জন, কিরণ, বলাই, ছোট রমেশ, ছোট জিতেন, বিনয় ডাক্তার, বড় অমূল্য, জিতেন, শচীনন্দন, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি।

শ্রীম কিছুকাল নীরব থাকিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত) — ব্রাহ্মসমাজে কেন যাই জানেন? Not for instructions (উপদেশ দেবার জন্য নয়)। তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে connection (সম্পর্ক) রয়েছে কিনা, তাই যাই। তাঁর কথাগুলিই elaborately (বিস্তৃতভাবে) কেশববাবু একদিন বলেছিলেন। সেই কথাই আবার আচার্যরা প্রচার করছেন। সেই কথা শুনতে যাই। আর তাঁদের গানগুলি শুনতে যাই। ঠাকুরের এক একটা অবস্থার গান।

ওরা তাঁর (ঠাকুরের) অবস্থা বুঝতে পারতো না। কেশববাবু বুঝতেন। তিনি সেই সব অবস্থা নিয়ে সারমন্ দিতেন। তখন কেশববাবুর ভক্ত ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল ঐ ভাব গানে নিবদ্ধ করতেন। সেই গান শুনতে যাই। ঠাকুরের নানা ভাবের প্রকাশক ঐ সব গান। তাঁর ভাবগুলি গানে যেন মূর্তিমান হয়েছে।

ঠাকুরের সঙ্গে যেখানে connection (সম্পর্ক) সেখানটা বড়ই interesting (চিত্তাকর্ষক)।

যেমন একই গঙ্গার জল — কোথাও পরিষ্কার, কোথাও ঘোলা , কোথাও কাঁকরে ভর্ত্তি। কিন্তু একই জল। তেমনি তাঁর কথা। কোন channel (প্রণালী) দিয়ে কি ভাবে গেছে, তাই দেখা। বড়ই interesting (মনোমুগ্ধকর)।

এক রকম বিবেকানন্দ বলেছেন। এক রকম কেশববাবুর ভিতর দিয়ে বের হচ্ছে। আর এক রকম শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভিতর দিয়ে নির্গত হচ্ছে। এই রকম কতজনের ভিতর দিয়ে বের হচ্ছে। সবই interesting (মনোহর)।

একজন ভক্ত — ঠাকুর তো অন্তরঙ্গদেরও বলেছিলেন, ঈশ্বরীয় কথা লোককে কইতে। আপনাকেও তো এক কলা (আনা) শক্তি দিয়েছিলেন, ঠাকুরের কথা কইতে সংসারতপ্ত লোকদিগকে। খোকা মহারাজদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতেন ঠাকুরের কথা শুনতে। রামবাবু, গিরীশবাবু — এঁদের এ শক্তি দিয়েছিলেন এইজন্য। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী অন্তরঙ্গগণও তাঁর শক্তির অংশীদার। তাঁদের সকলের ভিতর দিয়ে একই স্থান হতে জল আসছে।

শ্রীম — হ্যাঁ। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর। তিনি ভাবসমুদ্র। ভক্তরা তাঁরই ভাব প্রকাশ করছে। তিনি নিজে যার ভিতর দিয়ে যেভাবে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করেছেন, ভক্তরা সেই ভাব প্রকাশ করছে। ঢং কেবল ভিন্ন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেশববাবু যেখানে নিজের কথা বলেছেন সেখানেই গোলমাল করেছেন। তাঁর (ঠাকুরের) কথা জানা থাকলে, যে যাই বলুক তা ধরে ফেলা যায় — কোন্‌টা তাঁর (ঠাকুরের), কোন্‌টা বক্তার নিজের। যেখানে তাঁর (ঠাকুরের) কথার সঙ্গে নিজের কথা মেশাতে গেছেন সেখানেই গোলমাল হয়ে গেছে। তাই ধরা পড়ে যায়।

আমাদের কেমন হয়ে গেছে, অন্য কথা মনে থাকে না। এ কান দিয়ে ঢোকে, ও কান দিয়ে বের হয়ে যায়। কেবল ঠাকুরের কথাই মনে থাকে। ঐ কথাই ওদের মুখ দিয়ে শুনতে ইচ্ছা হয়। তাই তো যাই। দেখতে যাই কোন্ আধারে কেমন কাজ করছে।

তাঁর কথা যেন crystallised water (স্ফটিকস্বচ্ছ জল),

বালকেরও বোধগম্য। অন্য অন্য সব লোকের কথা, শাস্ত্র — এ সব অনেক ডুবুরি নামিয়ে তবে ধরা যায়।

অন্তেবাসী সম্প্রতি কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বিন্ধ্যাচলও দর্শন করিয়াছেন। সেখানকার আমলকী খুব বিখ্যাত। তাহা আনিয়াছেন। শ্রীম ঐ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — দিন দিন, আমলকী দিন ভক্তদের।

জগবন্ধু — কি হবে এগুলি দিয়ে?

শ্রীম — না। কতবড় জায়গার জিনিস! এই আমলকী দেখলে বিন্দুবাসিনীর উদ্দীপন হবে। এইগুলি খেলে এর রস দেহে প্রবেশ করবে। এই রসে মন তৈরী হবে। মন আমাদের খাদ্যের সার ভাগ দিয়ে তৈরী হয় কিনা। সেই মন ঈশ্বরীয় ভাব ধারণ করতে পারবে। ফল, রস, মন, ভাব — প্রসাদে তাই মন শুদ্ধ হয়। অজ্ঞাতসারে সেই মনে ঈশ্বরীয় ভাবের ছাপ পড়ে।

জগবন্ধু সকলকে একটা করিয়া আমলকী দিয়াছেন। বড় অমূল্যর কাছে আসিলে শ্রীম বলিলেন, দিন দিন, এঁকে দুটো দিন। (বড় অমূল্যর প্রতি) নিন আপনি দু'টো নিন। যারা বিয়ে করেছে তাদের দু'টো (শ্রীম ও সকলের উচ্চহাস্য)। এর যেমন advantage (সুবিধা) তেমনি disadvantage-ও (অসুবিধাও) আছে।

রাত্রি দশটা।

২

মর্টন স্কুল। চারিতলের সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম দোরগোড়ায় বসিয়া আছেন চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র ডান হাতে ঘরের ভিতর উত্তর দিক হইতে বেঞ্চেতে বসা বিনয়, শচী ও ছোট জিতেন — পূর্বাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে সিঁড়ির ঘরের বেঞ্চেতে বসা গদাধর, বুদ্ধিরাম ও একটি ভক্ত। অন্তেবাসী নিজের কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন — সকলেই দক্ষিণাস্য।

শ্রীম-র হাতে গীতা। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বাংলায় বুদ্ধিরামকে বুঝাইতেছেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি)—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (গীতা ২:৫৮)

যিনি স্থিরবুদ্ধি তিনি কেমন? যেমন কাছিম, কচ্ছপ। (গদাধরের প্রতি) কি?

গদাধর — কচ্ছপ একবার হাত পা ভেতরে ঢোকালে আর বের করে না।

শ্রীম (সঙ্গে সঙ্গে) — আর বের করে না। হাজার কাট, টুকরো টুকরো করে ফেল, কিন্তু শেলের ভিতর থেকে হাত পা বের করবে না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মনকে যেতে দিবে না। তা'তে শরীর থাকে থাকুক, যায় যাক — এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সারা সংসার ধ্বংস হলেও মনকে বিষয়ে যেতে দিবে না। এমনি করে জোর ক'রে টেনে রাখবে মনকে স্থিতপ্রজ্ঞ।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — পতনের ধাপগুলি কি, এবার শোন।

শ্রীম — ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২:৬২/৬৩)

(আঙ্গুলে গণনা করিয়া) (১) বিষয়চিন্তা, (২) সঙ্গ, (৩) কাম, (৪) ক্রোধ, (৫) সংমোহ, (৬) স্মৃতিবিভ্রম, (৭) বুদ্ধিনাশ। তুমি গোন আঙ্গুলে এক এক করে।

বুদ্ধিরাম শ্রীম-র সঙ্গে এক এক করিয়া পাঁচবার গণনা করিলেন। ভক্তগণও গণনা করিলেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — বল, মুখস্থ বল।

বুদ্ধিরাম — বিষয়চিন্তা, কাম, ক্রোধ — (আর পারছে না)।

শ্রীম — মোহ। তারপর? — স্মৃতিবিভ্রম। তারপর?

বুদ্ধিরাম — বুদ্ধিনাশ।

শ্রীম — বসে বসে এই কয়টি বারবার জপ কর।

বুদ্ধিরাম বসিয়া জপ করিতে লাগিল।

শ্রীম কিছু চিন্তা করিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি) — বিষয়চিন্তা মানে, কামিনীকাঞ্চন-চিন্তা — ঠাকুর বলতেন। ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া সবই কামিনীকাঞ্চন চিন্তা। যে চিন্তা ঈশ্বরলাভের সহায় হয়, তাই ঈশ্বরচিন্তা।

যেমন একজনের আম খেতে ইচ্ছা হয়েছে। সে সর্বদা চিন্তা করছে, 'আম, আম'। আমের ওপর আসক্তি এসে যায় এতে — স্নেহ ভালবাসা টান প্রীতি হয়। যদি আম পেতে বাধা হয়, দেরী হয়, তখন হয় ক্রোধ। তারপর হয় মোহ — হিতাহিত জ্ঞান লোপ হয়। এর পর শাস্ত্র, গুরুবচন ভুল হয়ে যায়। কেবলমাত্র আমের চিন্তা। আমের স্মৃতি মন-বুদ্ধি-চিত্ত জুড়ে থাকে। গুরুবচনের স্মৃতি লোপ হয়। গুরুকে ভুলে যায়। তারপর সদ্‌বুদ্ধির লোপ। এটা সৎ, এটা অসৎ — এই বিবেকজ্ঞানের লোপ সম্পূর্ণরূপে হলেই পতন হল।

ইন্দ্রিয়গুলি এই ক'রে মনকে বিষয়ে নিয়ে যায়। সেই মনকে যে জোর করে ভেতরে টেনে রাখতে পারে সে-ই মানুষ। তার বুদ্ধিই স্থির বুদ্ধি। টেনে কোথায় রাখবে মনকে? শ্রীভগবানের পাদপদ্মে, আত্মচিন্তায়। বের হয়ে এসে যায় সর্বদা। মনের গতিই ঐ, বাইরে যাওয়া — 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভূ', বেদে আছে (কঠো ২:১:১)। সেই মনকে ভিতরে নেওয়া।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, ভগবানে একটু ভালবাসা হলে মন অমনি স্থির হয়ে যায়। টানাটানি করতে হয় না। দুটো পথ আছে, একটা 'যমনিয়মাদি'। আর, একটা 'ঈশ্বর প্রণিধান'। ঈশ্বরে মনঃসংযোগ। এটা direct, সোজা ও সিধে পথ। আর ওটা artificial, অস্বাভাবিক কৃত্রিম পথ — নাক টেপাটিপি করা।

ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরে ভক্তি হলে, তাঁকে ভালবাসলে, কাম-ক্রোধাদি নষ্ট হয়ে যায় অমনি। বলতেন, বাঘ যেমন ছাগল কপ্ কপ্ করে খেয়ে ফেলে তেমনি তাঁর প্রতি ভালবাসা এলে, উহা কামক্রোধাদি খেয়ে ফেলে।

নানা উপায়ে মন স্থির হয়। এটা ভক্তিযোগ প্রেমযোগের পথ। জ্ঞান বিচার ও মন স্থির। সর্বদা সৎ অসৎ বিচার চলে। অসৎ ছেড়ে সৎ নেওয়া।

অষ্টাঙ্গযোগের পথ, আগে যা বলা হলো। আবার কর্মযোগের পথ। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন জ্ঞানপ্রাপ্তি। চিত্তশুদ্ধি, অবিদ্যানাশ জ্ঞানপ্রাপ্তি যুগপৎ হয়।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — কর কর, ক'রে ফেল। মুখস্থ করতে করতে মনস্থ হয়। কতক্ষণ লাগে ইচ্ছা থাকলে?

কিন্তু কুঁড়ে লোকদের হয় না। (একজনকে দেখাইয়া) এই যেমন ইনি — ইনি যেমন কুঁড়ে। (ভক্তটি অশ্রুপাত করিতেছে)।

যাদের ইচ্ছা আছে, এ মুখস্থ করতে কতক্ষণ? মুখস্থ করে ফেল, মুখস্থ করে ফেল। (একজনকে দেখাইয়া) তুমি বলে দিও।

(একজনের প্রতি) — ইনি (অন্য একজনকে দেখাইয়া) ইনি রোজ দু'টি শ্লোক মুখস্থ করবেন বলা হয়েছিল। তা আর হলো না।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — ক'রে ফেল, ক'রে ফেল শীগ্‌গীর। এই দেখ, একেবারে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরম্ভ করেছি আমরা। একেবারে আত্মতত্ত্ব থেকে। প্রথম অধ্যায় গল্প ক'রে বলে দিলাম।

অন্যলোক কি রকম পড়াতো? এক একটি শব্দ ক'রে কতদিনে। আর আমাদের আরম্ভ একেবারে আত্মতত্ত্ব।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আর, একটি ধাতুরূপ ও একটি শব্দরূপ মুখস্থ করাও কম নয়। একটি ঢুকিয়ে দিলে আরও জানতে ইচ্ছা হবে।

মোটামুটি সংস্কৃত জানা দরকার। শাস্ত্র সব এই ভাষায় কি না!

দেখ না, অন্য সব কথা হচ্ছে, এর মধ্যেই একটি শ্লোক মনে পড়লে অন্য রকম হয়ে যায়। যেমন শল্‌তেতে আগুন জ্বলে তেমনি, এই সব কথা। এতে মনে আলো আসে। এক একটি কথা যেন এক একটি দীপ।

চিন্তার সহিত এই সব কথা স্মরণ বা উচ্চারণ করলেই হলো।

যতদিন না কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের সংযোগ হয়েছে, ততদিন খালি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি করতে করতে ভেতরে আগুন জ্বলে, যেমন কাঠে কাঠে ঘষে ঘষে হয়।

এই সব ভাষার ভিতর ভাব নিহিত রয়েছে। অবতার, মহাপুরুষদের কথায় তাই অত তেজ। ভাব মানে, শক্তি। এই শক্তি ধরে ধরে মনকে শেষে মহাশক্তিতে নিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, যেমন শেকলের এক

একটা রিং ধরে ধরে কাঠ ধরা যায়। কাঠ জলে ডুবে থাকে।

রাত্রি আটটা। শ্রীম দ্বিতলের ঘরে মেঝেতে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। নিত্যকার ভক্তগণ তিন দিকে বসা। কথামৃত ছাপা হইতেছে। শ্রীম-র খুব খাটুনি।

সত্যবান মুকুন্দবাবুর ছাত্র, কলেজে পড়ে। সে বলিতেছে, মুকুন্দবাবু তাকে লিখেছেন, শরীর খুব খারাপ। তাতেই মনের উপর হতাশ ভাব এসেছে। মুকুন্দ রামপুরহাটে রেক্টার। সম্প্রতি বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বুদ্ধদেব তাই মধ্যপন্থার কথা বলেছেন। মানে, বেশীও না আবার খুব কমও না। মাঝামাঝি কাজ করা, অর্থাৎ যতটা সয়। যাতে শরীর মন অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত না হয়। শরীরটা বেশী strained (পরিশ্রান্ত) হলে পড়ে যায়। তেমনি মনটা। ওটা বেশী strained হলে কি হয়? ছিঁড়ে যায়। গিরিশবাবুর গানে আছে —। কি গানটা?

একজন ভক্ত — 'সাধের বীণে যত্নে বাঁধা', ইত্যাদি।

জগবন্ধু — এবার পুজোর ছুটিতে মুকুন্দবাবু কাশী গিয়েছিলেন, অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। একদিন ওঁর হার্ট বড় খারাপ হয়ে পড়ে। সাধুদের খুব ভাবনা হল। সেবাশ্রমে নিয়ে যায়। মকরধ্বজ খেয়ে আরাম হন।

শ্রীম — হবে না, কত worries (দুশ্চিন্তা), কত ভাবনা! সব রক্ত ও-তে শোষণ করে নেয়। Authority (কর্তৃত্ব) নিয়ে কাজ করলে ঐ রকম। তাই অনেকেই subordinate (কর্তৃত্বাধীন) হয়ে কাজ করে। তা'তে তেমন strain (পরিশ্রম) নেই।

(অল্পক্ষণ চিন্তার পর) এ-ও আবার সত্য। যদি লোকে খেটে কাজ না করে, যারা পারে, তবে ঐ কাজগুলো হয় কি করে? এ-ও একটি দিক আছে।

একটা মেসিন চালিয়ে দিলে শেষে আপনিই চলে। প্রথমটা একটু শক্ত।

একজন ভক্ত — ঠাকুরের মত কি ছিল? যতটা দেখতে পাই পুস্তকে, তিনি কর্মের দিকে অত জোর দিতেন না।

শ্রীম — হাঁ, তাঁর কথা ভিন্ন। তিনি ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানতেন না।

সর্বদা মুখে 'মা মা'। একটু ঈশ্বরীয় কথা হল, কি গান, অমনি সমাধিস্থ! তাঁর জীবনটা শেষের দিকে ভক্ত-তৈরী কাজে লেগেছিল। আগে তো অন্যরূপ ছিল। একটানা সমাধিভাবে কেটেছে। শেষের দিকে যেন সাত তলা থেকে এক তলায় নেমে এসে, ভক্তি ভক্ত নিয়ে ছিলেন। একটু উদ্দীপন হল, অমনি এক তলা থেকে সাত তলায় উঠে পড়লেন।

অমনি আর দেখা যায় নাই। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। অতুলনীয় ব্যক্তি!

কিন্তু ভক্তদের সকলকেই কিছু না কিছু করতে হয়েছে। সেই কর্ম প্রত্যাদিষ্ট কর্ম। তাঁর কথা বলা লোককে। স্বামীজীকে যেতে হল বাইরে, পাশ্চাত্যে। এ সবই কর্ম — তাঁর কথা বলা, পরোপকার কার্য, প্রচার, কি সেবা। ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের কথা আলাদা। ও একটা আলাদা থাক্।

সাধারণ লোকের প্রকৃতিতে কর্ম রয়েছে। তা এখন কি করবে না ক'রে? তাই তার উপায় বলে দিয়েছেন — নিষ্কাম হয়ে কর। তাদের ভিতরও আবার দু' থাক্ আছে। এক থাক্ কর্তৃত্ব চায়। অপর থাক্ তা চায় না, বা পারে না। তাদের কথাই হচ্ছে।

যার ভিতর কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা রয়েছে, তাদেরই এ সব বড় কাজ করতে হয়। তার জন্যই সইতে হয় এ সব ধাক্কা।

ঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ বিরজ — 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশাবাস্য-৮। বলেছিলেন এ শরীর দিয়ে রজের কাজ হতে পারবে না। তাই ভক্তদের ভিতর দিয়ে কাজ করিয়েছেন।

ঠাকুর সর্বদা আদর্শে অবস্থান করতেন, ব্রহ্মে। ভক্তদের তৈরীর জন্য কেবল নিচে নামতেন। এই একটু কাজ তাঁর। তাঁদের দিয়ে জগতের কাজ করাবেন কিনা — ধর্ম সংস্থাপন! তাঁর সেই কাজ আর এ কাজ — অনেক তফাৎ।

সাধারণ লোক কাজ করে নিজের জন্য। এর চাইতে উঁচু থাক্ যাদের, তারা কাজ করে পরের উপকারের জন্য। এরও উঁচু থাক্, যারা কাজ করে ভগবানলাভের জন্য। তারও উপরের থাকের কাজ, প্রত্যাদিষ্ট কাজ। তারা কাজ করে ভগবানের আদেশে। ঠাকুরের ভক্তদের কাজ এই শ্রেণীর কাজ। তিনি তাদের কমিশন দিয়ে গেছেন। একজনকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, মা বলেছেন তোমাকে মায়ের একটু কাজ করতে হবে —

লোকদের ভাগবত শোনাতে হবে। তিনি সন্ন্যাস চেয়েছিলেন। তাতেই ঐ কথা বললেন। মায়ের কাজের জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকতে হবে। ঠাকুরের কাজ — ভক্ত তৈরী করার কাজ — সকলের ওপরের কাজ। জগদম্বা হাতে ধরে করাচ্ছেন — যেন যন্ত্র।

কি আশ্চর্য্য! এদিকে বলছেন, আমি অবতার। আবার বলছেন — মা, যেমন করাও তেমনি করি। কথা কইছেন, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বলছেন, মা বলতে দিচ্ছেন না। Simultaneously (যুগপৎ) দু'টি ভাব — অবতার ও যন্ত্র। এ দু'টি ভাবই পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবতারভাবে স্বতন্ত্র। পরমেশ্বর। আবার যন্ত্রভাবে তিনি মানুষ। পরমেশ্বর ও জীব, দু'টি ভাব। এই দু'টি' ভাব যাঁ-তে দেখা যায় একসঙ্গে, তিনি অবতার।

এক সেকেণ্ডের জন্যও ঠাকুরকে ঈশ্বর থেকে বিযুক্ত দেখি নাই কখনও — জগৎ ছেড়ে ব্রহ্মে বিলীন।

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়, আর তুরীয়াতীত — এই সবগুলি অবস্থা একসঙ্গে থাকে অবতারে। মানুষ দেখে পৃথক্ পৃথক্। তার বুদ্ধি যে সীমাবদ্ধ! তাই বলতেন, একসেরে ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না — অবতারকে বুঝতে পারে না। তবে তিনি বোঝালে হয়। অন্তরঙ্গদের বুঝিয়ে দিয়েছেন — মানুষ ও ঈশ্বর, দুই-ই তিনি। এক এক বার হয় এ-টি। তারপরই দেখে মানুষ। যশোদা ও গোপীদের এই তাক লেগেছিল। একবার দেখছেন গোবর্ধনধারী। আবার দেখছেন, গোপাল। গোপালের মা'র-ও এই তাক লেগেছিল। একবার দেখছেন মানুষ, আবার দেখছেন গোপাল। যখন গোপাল ঠাকুরে মিশে গিছলো, একবার এদিক একবার ওদিক তাকাচ্ছেন।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুর ছোট খাটে বসে বলতেন, ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ, মনে হতো, যেন একসঙ্গে দেখছেন — অথচ পৃথক্ পৃথক্। আবার কখনও পরমব্রহ্মে বিলীন।

আবার সম্পূর্ণ মানুষ — আবার সম্পূর্ণ ঈশ্বর একাধারে, ভক্তরা দেখছেন ঠাকুরকে! কি আশ্চর্য, কি প্রহেলিকা!

রাত্রি দশটা।

৩রা নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৭ই কার্তিক, ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা সপ্তমী, ৩৮ দণ্ড। ৭ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

মুখস্থ থেকে মনস্থ হয়

১

শ্রীম কয়েকদিন ধরিয়া মর্টন স্কুলের নিম্নতলের অঙ্গনে বসিতেছেন, ফুটপাথে অল্প বিচরণ করেন। দেখেন, ভগবান কতরূপে জনগণের ভিতর প্রকাশিত।

আজ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। ৭ই আশ্বিন ১৩৩১সাল। মঙ্গলবার কৃষ্ণা দশমী ৪৬ দণ্ড। ৫৫ পল।

বেঞ্চের স্কোয়ারে শ্রীম বসা বেঞ্চেতে পূর্বাস্য। সম্মুখে আমহার্স্ট স্ট্রীট। ভক্তগণও বেঞ্চেতে বসা চারদিকে। এখন সন্ধ্যা।

স্বামী ধীরানন্দ আসিয়াছেন। ইনি বেলুড় মঠের একজন প্রাচীন সাধু। শ্রীম তাঁহাকে আদর করিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। আর মিষ্টিমুখ করাইলেন। তিনি পার্শিবাগানে শরৎচন্দ্র মিত্রকে দেখিতে যাইবেন, উনি খুব অসুস্থ।

একটি ভক্ত চারতলা হইতে নামিয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন। শ্রীম স্বামী ধীরানন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইতেছেন। বলিলেন, 'ইনি মঠে যান'। উত্তর আসিল — 'হাঁ, জানি।'

শ্রীম-র ধারণা, মঠের সাধুদের সঙ্গে যে আন্তরিক প্রীতিবদ্ধ হইবে সে-ই ত্যাগী জীবন ধরিবে। তাই তিনি সর্বদা কুমার ব্রহ্মচারীদিগকে প্রাচীন সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে বলেন।

'রামকৃষ্ণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরের পরম ভক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র অতিশয় পীড়িত। তাঁহাকে দেখিতে মঠের সাধুরা সর্বদা আসিতেছেন। স্বামী ধীরানন্দও তাঁহাকে দেখিতে পার্শিবাগান চলিয়াছেন, সঙ্গী হইলেন ছোট নলিনী ও বিনয়।

পরের দিন সন্ধ্যা। শ্রীম আজও নিম্নতলে বসিয়াছেন। ধ্যান করিতেছেন। ইতিপূর্বে ফুটপাথে বেড়াইতেছিলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটায় অন্তেবাসী বেলেঘাটা হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে শুকলাল। তিনি রন্ধনের বাসন লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম-র আদেশে তিনি কিছুকাল স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। ঠাকুর শ্রীমকে দিয়াও অনুরূপ আচরণ করাইয়াছিলেন।

এখন নয়টা। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাশেই পঞ্চানন ঘোষ লেন। সেখানে কয়দিন ধরিয়া কৃষ্ণযাত্রা হইতেছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। 'মথুরা গমন' পালা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিলেন। গোপীগণ পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ রথ-চক্র ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীরাধা বলিলেন — সখি, ধরো না ধরো না রথচক্র। যে চক্রের চক্রী হরি, জগৎ চলে যার চক্রে।

তাহার পরের দিন। অপরাহ্ন দুইটা। শ্রীম অন্তেবাসীকে পার্শিবাগান পাঠাইলেন। 'রামকৃষ্ণ সমিতি'র সেক্রেটারী শরৎচন্দ্র মিত্র গুরুতর পীড়িত। শরীর যায় যায়। শরৎবাবুর সংবাদ লইয়া শ্রীম-র নির্দেশমত ভক্তগণ রামমোহন রায় লাইব্রেরীতে গেলেন। এখানে আজ রাঁচীর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভা হইবে। অনেক সাধু একত্রিত হইবেন। মর্টন স্কুলের ছাত্ররাও গিয়াছে, হেমেন্দ্র সান্ন্যাল প্রভৃতি। যেখানে সাধুগণ যান সেখানেই শ্রীম ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের পাঠাইয়া দেন। ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া ফিরিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা হইয়াছে। শ্রীম অত রাত্রিতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণের নিকট হইতে সাধুদের সংবাদ লইতেছেন।

ইহার পরের দিন ২৬শে সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর দেবীভাগবত পাঠ হয় প্রথম তিন অধ্যায়। অন্তেবাসীর সহিত কতকগুলি ভক্তকে শ্রীম সাধুদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিলেন রাত্রি দশটায়। শ্রীম ছোট জিতেনকে বলিলেন এদের পুনরায় দেবীভাগবত পড়ে শুনিয়ে দিন।

মর্টন স্কুলের পুরাতন ভৃত্য রামলাল দেহত্যাগ করিয়াছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে। আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর। শ্রীম উদ্বিগ্ন তাহার দেহ সৎকারের জন্য — অন্তেবাসী ও বিনয়কে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাঁহারা মর্টনের শিক্ষক পূর্ণ সরকার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লইয়া

ক্যাম্বেল হাসপাতালে গেলেন। তাঁহারা শবাগারে গিয়া মৃতদেহ লইতেছেন, তখন আসিয়া পড়িল রামলালের আত্মীয়গণ। তাহারা শব লইয়া কালীঘাটে গেল। রামলালের নিকট-আত্মীয় মাত্র বার বছরের একটি বালক। ভক্তগণ শ্রীম-র নিকট ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে স্নান করিতে বলিলেন। অন্তেবাসী বলিলেন, শব তো পবিত্র। শ্রীম বলিলেন, তবুও স্নান করা উচিত।

২

আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ১২ই আশ্বিন ১৩৩১ সাল। রবিবার, অমাবস্যা ৫০।১৭ পল।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। পোস্ট-মাস্টার অমূল্যবাবু দুইটি সঙ্গীসহ আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। নিকটে অন্তেবাসী, গদাধর প্রভৃতি বসিয়া আছেন। অমূল্যবাবু সম্প্রতি আলীপুরে বদলী হইয়া আসিয়াছেন শিলং হইতে। কুশলপ্রশ্নাদি শেষ হইয়াছে। কথা চলিতেছে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — শুনিয়ে দাও না এঁদের তোমার বেদপাঠ। (ভক্তদের প্রতি) শুনুন বেদের কথা।

গদাধর — ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। (বৃহঃ ৪:৫:৬) ইত্যাদি।

শ্রীম — পতিকে যে পত্নী ভালবাসে, উহা পতির প্রীতির জন্য নয়, কিন্তু নিজের প্রীতির জন্য। তাকে ভালবাসলে নিজের আনন্দ হয়। তেমনি পত্নী, পুত্র, বিত্ত — অর্থাৎ জাগতিক যা কিছু লোক ভালবাসে, কামনা করে, পেতে ইচ্ছা করে — এ সবই নিজের প্রীতির জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিছলেন। বলেছিলেন, সেই 'আপন'কে, সেই 'নিজ'কে, সেই 'আত্মা'-কে জানতে হবে। আত্মাকে জানলেই সব জানা হলো। আত্মা মানে, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি সেই সচ্চিদানন্দ। একদিন দেখলাম, এই শরীর থেকে বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতার

হই।' অর্থাৎ ইদানীং এই রামকৃষ্ণ-শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ডাক্তার বক্সী ও উকীল ললিত ব্যানার্জী প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — আপনি এঁদের শুনিয়ে দিন একবার যা কথা হলো, বেদের।

একটি ভক্ত — ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, বিদ্বৎ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ ত্যাগ করবেন। তাঁর ধনসম্পত্তি দুই পত্নীকে ভাগ করে নিতে বললেন — কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে। মৈত্রেয়ী ছিলেন জ্ঞানী। তিনি বললেন, কেন যাচ্ছ আমাদের ছেড়ে? আহ্লাদিত হয়ে তাঁকে এই সব আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন। বললেন, আমরা যা কিছু ভালবাসি সবই আমাদের নিজের প্রীতিলাভের জন্য। সেই 'নিজ'-টি হলো ঈশ্বর, ভগবান। সেই ভগবানকে জানলে সব জানা হয়ে গেল। আর কিছু পেতে বা জানতে ইচ্ছা হয় না। কারণ তিনি যে জগতের মূল কারণ, মূল ধন। কারণকে জানা হলেই কার্যকে জানা হল। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে জানলেই হবে।' ঠাকুর সেই পরমাত্মা, এরই ইঙ্গিত ঠাকুরের এই মহাবাক্যে।

শ্রীম — বা, ইনি তো বেশ ধরেছেন মুদ্দটা। ঠাকুর যে ঈশ্বর এটা জানা হলেই সব জানা হল, সব লাভ হল। তিনি একজনকে বলেছিলেন, সবটা মন যদি কুড়িয়ে এখানে (ঠাকুরে) এল তবে বাকী রইল কি? ঐ ভক্তটি খালি ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ঈশ্বরকে জানার নামই উপনিষদে বলা হয়েছে — আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। কথা এক।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সন্ধ্যা হয়েছে। একটু তাঁর চিন্তা করা যাক। ঠাকুর বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় সব ছেড়ে তাঁর চিন্তা করতে হয়।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন প্রায় এক ঘন্টা।

রাত্রি আটটা। শ্রীম নববিধান ব্রাহ্ম মন্দিরে বসিয়া আছেন পশ্চিম দিকের উত্তরের দরজার কাছে। আশেপাশে ভক্তগণ — শান্তি ভৌমিক, সুরপতি, ধীরেন, ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন, মনোরঞ্জন, বলাই, গদাধর, আসামের অক্ষয় ডাক্তার ও তাঁহার সঙ্গী। আচার্য প্রমথ সেন বেদী হইতে বক্তৃতা দিতেছেন। ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি — মানুষ সংসারের সকলকে ভালবাসে। কিন্তু ঈশ্বরকে কে

ভালবাসছে? তাঁকে ভালবাসা চাই।

নববিধান মন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীম ঝামাপুকুরে প্রবেশ করিলেন, ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে যাইবেন। ডান হাতে রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ দেখাইয়া বলিতেছেন, এই দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। প্রথম প্রথম ঠাকুর এই বাড়িতে পূজা করতেন। আর এই ২৭ নম্বর ঝামাপুকুর লেন। এখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন। তাঁকে দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর একদিন। অনেকদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান নি — আর, একটু অসুস্থ ছিলেন তাই।

শ্রীম বেচু চাটার্জী স্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার ডান হাতের* মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে ছিল ঠাকুরের বড়দাদা পণ্ডিত রামকুমার শাস্ত্রীর সংস্কৃত পাঠশালা। ইনিই রাণী রাসমণিকে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির গুরুর নামে দান করে দিতে। রাণী রাসমণি পূজারী সংগ্রহ করতে পারেন নাই। নিরুপায় হয়ে রামকুমারকে নবনির্মিত মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণ করতে আকুল প্রার্থনা করেন। সেই থেকে ঐ বংশ পূজারীর কার্য করে আসছে। ঠাকুর এই পাঠশালায় এসে বসতেন। থাকতেন ঐখানে (পূর্বদিকে কয়েকখানা বাড়ির পর এই রাস্তায় বাম ফুটপাথে)। এখন ওখানে হেয়ার প্রেস — পাকা বাড়ি। তখন খোলার ঘর ছিল।

শ্রীম ঠনঠনিয়ার দিকে চলিতেছেন। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সংযোগস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাম হাতে দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, এই রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। এখানে খুব আসতেন। একবার কেশব সেন এই বাড়িতে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। আহা, কি ভক্তি কেশববাবুর! আঙ্গুরের এক একটি দানা জলে ধুয়ে শুদ্ধ বস্ত্রে পুঁছে ঠাকুরের হাতে দিচ্ছেন। কত ভালবাসা থাকলে এরূপ হয়! শ্রীম চলিতেছেন। একটু দূর হইতে বলিলেন, ঐ মা-কালীর মন্দির। ওখানে সর্বদা আসতেন। বসে অনেকক্ষণ ধরে মাকে গান শুনাতেন। তখন তাঁর বয়স সতের আঠার। হাঁ, পেছনে আর একটি তীর্থ ছেড়ে এসেছি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঠাকুরবাড়ির উল্টো দিকে নকুড় বোষ্টমের মুদি-

---

** এখন সেখানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির।*

দোকান ছিল। ওখানেও এসে বসতেন। ওদের কথায় গান গাইতেন।

শ্রীম এতক্ষণে মা-কালীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়ের সামনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণ তিন দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। সকলেই ধ্যানস্থ। আধ ঘন্টা পর শ্রীম মাকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মর্টন স্কুলে আসিতেছেন বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট ধরিয়া। সিটি কলেজের পাশে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরিশ্রান্ত, তাই বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, আপনারা এবার বাড়ি যান। অনেকেই প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীম আসিয়া মর্টন স্কুলের অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে জগবন্ধু, বিনয়, শচী, গদাধর প্রভৃতি। ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ বেশ হলো। একসঙ্গে কালীঘাট, নবদ্বীপ ও কাশী দর্শন হলো। ঠনঠনের মা-কালী যেন কালীঘাট। আর এইখানটা (মর্টন স্কুলের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়িতে ধুম কীর্তন হইতেছে শুনিয়া) যেন নবদ্বীপ। (একটু ভাবিয়া) আর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ যেন কাশী। জগবন্ধু বলিলেন, ব্রাহ্মরা যে ভক্তি নিয়ে আছেন। কাশী তো জ্ঞানের জায়গা। শ্রীম বলিলেন, কেন কাশীতে কি ভক্তি নেই?

দ্বিতলের পূর্বপ্রান্তে শ্রীম বসিয়া আছেন। পঁচিশ হাত দূরে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়ি। কীর্তনের ধুম পড়িয়াছে। 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' — কেবল এই নাম শোনা যাইতেছে। শ্রীম শুনিতেছেন। খানিক পর বলিলেন মত্ত হইয়া, যান যান, আপনারা যান। গিয়ে যোগ দিন। এমন দিন আর হবে না। ঠাকুর বলতেন, ঘৃণা লজ্জা ভয় আলস্য ছেড়ে তাঁকে ডাকতে হয়। যান।

(সস্নেহে শুকলালের প্রতি) — আপনার গিয়ে কাজ নেই। একে বয়স, আবার (স্থূল) শরীর। অনেক ভাবতে হয় সংসারে। ভক্তরা নৃত্য করিতেছেন, কণ্ঠে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'।

৩

মর্টন স্কুল। সিঁড়ির ঘর। শ্রীম বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন পশ্চিম প্রান্তে দরজার সামনে, দক্ষিণাস্য। রাত্রি আটটা। অন্তেবাসী রামমোহন রায়

লাইব্রেরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে ওখানে আজও পাঠাইয়াছিলেন। আজ ছিল 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের' বাৎসরিক অধিবেশন। শ্রীম-র উদ্দেশ্য, যদি বা ওখানে ঠাকুরের কথামৃতের কণিকা মিলে। প্রাচীন ব্রাহ্ম ভক্তরা অনেকেই যাইবেন। অনেকেই ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের কথার ভিতর অনেক সময় ঠাকুরের প্রসঙ্গ থাকে। এই জন্যই অন্তেবাসীকে পাঠাইয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন, কথার ভিতর বালিতে চিনিতে মিশান থাকে। পিঁপড়ে হইয়া চিনিটুকু লইতে হয়। 'চিনি' মানে অবতারের বাণী, ঠাকুরের কথা।

আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৩ই আশ্বিন ১৩৩১ সাল, সোমবার। শ্রীম দেবীভাগবতের পাঠ শুনিতেছেন — দশম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়।

তার পরদিন শ্রীম ঐ সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। আজ শুক্লা দ্বিতীয়া ২৩ দণ্ড।২৩ পল। একটু পূর্বে ছাদে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিতেছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঠাকুর বলতেন — রাবণকে সীতা বলেছিলেন, রাম দ্বিতীয়ার চাঁদ। আর তুমি পূর্ণচন্দ্র। রাবণ খুব খুশি, শুনে। কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে নাই রাবণ। 'পূর্ণিমার চাঁদ' মানে যা বাড়বার তা বেড়েছে। এবার ধ্বংস আসবে। রাবণের তাই হলো। আর 'দ্বিতীয়ার চাঁদ' মানে, এটা বাড়বে। মাত্র এই জন্ম হলো। রামের লীলা-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হবে।

সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া হাততালি দিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন ভক্তসঙ্গে। দুর্গাপদ মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সী, বিনয়, বলাই ভৌমিক, মোটা সুধীর, গদাধর, রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতিও শ্রীম-র সম্মুখে ও বাম পাশে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। প্রায় এক ঘন্টা ধ্যান হইল। এইবার দেবীভাগবত পাঠ হইতেছে — তৃতীয় স্কন্ধ, বিশ হইতে চব্বিশ অধ্যায়। সকলে নির্বাক পাঠ শুনিতেছেন। পাঠ শেষ হইল। এখন কথা হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — শাস্ত্রে এই যা বলা হয়, কঠোর তপস্যা, অত কি পারে মানুষ — অত কঠোরতা? আর কি সহজ উপায় নাই?

শ্রীম — তাঁর চিন্তা করাই তপস্যা। যে করেই কর তপস্যা, তাঁর চিন্তা

না থাকলে শরীরের কষ্ট বৃথা। শরীরের কষ্টই করে যাচ্ছ, কিন্তু মন যেখানে সেখানেই আছে। এতে আর কি ফল হবে, বল? পরীক্ষা হল ঐ — মন ঈশ্বরে যাচ্ছে কি না, আসক্তি কমছে কিনা, সাধুসঙ্গ হচ্ছে কিনা, বিশ্বাস বাড়ছে কিনা।

তবে এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে — শরীরের উপর সংযম না রাখলেও ভয়। দেহসুখ কোথায় নিয়ে ফেলবে তার নাই ঠিক। তাই অল্প-বিস্তর দৈহিক কষ্ট দরকার।

আরাম-চেয়ারে বসে বসে তাঁর চিন্তা করা যাচ্ছে তাতে কিছু হবে না। বিবেক বৈরাগ্য বাড়ছে কিনা এর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। তা হলেই এসে যায় অল্পবিস্তর দেহের কষ্ট, সংযম। মনকে ঈশ্বরে রাখতে যতটা দরকার, দেহকষ্ট ততটা প্রয়োজন।

বড় জিতেন — আচ্ছা, অনেকে শাস্ত্র মুখস্থ করে। একজন রোজ সম্পূর্ণটা গীতা আবৃত্তি করে, শুনতে পাচ্ছি ফেরি স্টীমারে বসে। এ কি প্রয়োজন?

শ্রীম — মুখস্থ করতে করতেই মনস্থ হয়। বার বার বলতে বলতে কথা, নিজের কানে প্রবেশ করে। তা থেকে যায় মনে। রোজ রোজ বার বার মনে একটা idea (ভাব) ধাক্কা লাগলে সেখানে দাগ পড়ে যায়। একেই সংস্কার বলে। অজানাভাবে old ideas-এর (প্রাচীন চিন্তার) সঙ্গে, বিষয়ভাবনার সঙ্গে new ideas (নূতন চিন্তার), শাস্ত্র ও গুরুবচনের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাতে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরীয় ভাবনার জয় হয়।

আর মুখস্থ থাকলে নির্জন রাত্রিতে অন্ধকারে বসেও ঈশ্বরচিন্তা হতে পারে। আবৃত্তি দ্বারা শব্দ প্রথমে যায় কানে, তারপর যায় মনে, ঐ শব্দের অর্থ। তখন হয় ইশ্বরচিন্তা। তাই বলে, 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরিয়সী...।'

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুর কিন্তু শ্লোক আবৃত্তি করতেন না। কতক শ্লোক তাঁর মুখস্থ ছিল। বলতেন না — পাছে ভক্তরা ঐ করে — শ্লোক ঝাড়ে। কত দিকে তাঁর দৃষ্টি! এ সব দৃষ্টি মানুষে সম্ভবে না, অবতার ছাড়া।

ঠাকুর বলতেন, শাস্ত্র সাধুমুখে শুনতে হয়। — সর্বস্ব ত্যাগ করে

পথে দাঁড়িয়েছে যে। আবার warn (সাবধান) করেছিলেন, বেশি পড়লে মন ঐতে চলে যায়, পড়াতে। তাই গুরু-বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া। পড়া তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ঈশ্বরচিন্তা। তার জন্য যতটা দরকার ততটা পড়া। বলতেন, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশানো। পিঁপড়ে হয়ে শুধু চিনিটুকু নেবে।

মর্টন স্কুলের ছাদ। অপরাহ্ন তিনটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া কথা কহিতেছেন, দক্ষিণাস্য। তাঁহার সম্মুখে বেঞ্চেতে বসা দুই জন শিক্ষক। তাঁহাদের বাড়ি নদীয়া জেলার ধূপদহ। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (শিক্ষকদের প্রতি) — পরমহংসদেব বলেছিলেন, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঈশ্বরদর্শন। এর জন্যই মানুষ-জন্ম। বলতেন, টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, স্ত্রীপুত্রকন্যা, এসব জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ এসব অনিত্য। অনিত্য বস্তু শাশ্বত সুখ শান্তি আনন্দ দিতে পারে না। কেবল ঈশ্বরে এইসব লাভ সম্ভব। এই ভগবানকে জানার নামই ধর্ম, সত্যিকার। বেদ বলেন, মানুষের স্বরূপ অমৃতের সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

একজন শিক্ষক — সংসার বড়ই গোলমেলে জায়গা। এখানে থেকে ধর্ম বড় শক্ত।

শ্রীম — তাই ঠাকুর বলেছেন তার উপায় — নিত্য সাধুসঙ্গ, regular and continuous (নিয়মিত ও নিরন্তর) সাধুসঙ্গ। রোগ সারাতে হলে যেমন উঠে পড়ে ডাক্তারের কথা পালন করতে হয়, এও তেমনি।

সাধুসঙ্গ মানে কি? না, যারা গোলমালের পাড়ে পৌঁছেছে তারা। গোলমালের ভিতর থেকেও যারা 'গোল' ছেড়ে 'মাল' ধরেছে। 'গোল' মানে মায়ামোহ, 'মাল' মানে ঈশ্বর। তাদের কাছে বসতে বসতে তখন বোঝা যায়, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। তখন সত্যকে ধরে থাকার চেষ্টা করা। 'সত্য' মানে, যা ভগবানের নিকট পৌঁছে দেয় শেষে। ভগবানের নাম সৎ কিনা। সত্যিকার সত্য ঈশ্বর। তাঁর কাছে পৌঁছে দেয় যা, তাকে সত্য বলা হয়। ভগবানের অস্তিত্বের অভাব কখনও হয় না। তাই তাঁকে সৎ বলে।

জীবের স্বরূপও ঐ। কিন্তু মায়ায় পড়ে সব ভুলে গেছে। কার সন্তান, ঘর কোথায় — এই সব কথা। তাই তো অত দুঃখ। যাদের সর্বদা এ-টি স্মরণ থাকে তাদের বলে মহাত্মা, great soul, সাধু। এদের সঙ্গ করলে মনে থাকে সর্বদা, আমরা এখানকার লোক নই। আমাদের বাড়ি ঈশ্বরের কাছে। ঠাকুর বলতেন, মানুষ-জন্ম কেমন? না, যেমন পাড়া-গাঁ থেকে শহরে আসা। কাজ করতে আসা। কাজ ফুরালে তখনই চলে যায় নিজের ঘরে।

তেমনি মানুষ। সবাইকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার আসা। কর্ম ফুরালেই শেষ জন্ম। তখন ঈশ্বরের কাছে চলে যায়। মুক্ত হয়ে যায় জন্ম-মরণ-চক্র থেকে। ঘরের ছেলে ঘরে চলে যায়। সকলেরই যেতে হবে ঘরে ফিরে, সকলেরই মুক্তি হবে। তার স্বরূপ যে মুক্তি। সমাধি তার normal state (শাশ্বত রূপ)। মায়াতে পড়ে এই দুর্দশা।

যাবে, সকলেই যাবে একদিন নিজের ঘরে। তবে শীঘ্র যেতে চাইলে ঐ পথ। যারা গিয়েছে নিজধামে তাদের সঙ্গ করা। তাদের ভালবাসা পেলে সহজে হয়ে যায়।

শিক্ষক — প্রথমাবস্থায় কি করা দরকার?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, দু'বেলা বসে নাম করা, জপধ্যান করা, আর প্রার্থনা করা। আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস করা। এ সব করা দরকার। তবে হুঁশ থাকে। যারা সাধুসঙ্গ করে তাদের এ সব কথা মনে থাকে। কারণ সাধুরা তাই করে কিনা।

প্রার্থনার বড় দরকার। বলেছিলেন, কেঁদে কেঁদে বল — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। আন্তরিক হলে তিনি শোনেন। আবার বলতে বলতে আন্তরিক হয়।

ছোট রমেশের প্রবেশ।

অপর শিক্ষক — মনে করি সৎসঙ্গ করবো কিন্তু ভুল হয়ে যায়, পাঁচ কাজে মন চলে যায়।

শ্রীম — প্রথম প্রথম বিচার ক'রে জোর ক'রে করতে হয়। তার পর সহজ হয়ে যায়। পড়ায় কি ছেলেদের মন যায় প্রথমে? পাঁচজনে ধ'রে

জোর করে পাঠায়। তারপর সহজ হয়ে যায়।

শিক্ষকদ্বয় বেলা একটার সময় আসেন। তিনটা পর্যন্ত অন্তেবাসীর সঙ্গেও এই সব কথা হয়। সাধুসঙ্গে নূতন জন্ম হয়। তখন কে আপনার, কে পর, কে অনন্ত কালের বন্ধু, কে দু'দিনের বন্ধু এ সব কথা হয়। আর মৃত্যুচিন্তার কথাও হয়। শরীর থাকবে না, এ চিন্তা করলে যা থাকবে সেই বস্তু লাভের চেষ্টা হয়। কারণ আমি থাকবো না এ কথা শুনলে মানুষ ভয় পায়। কোনও রকমে থাকা যায় না কি? মনে এই সব কথা ওঠে। তখনই উত্তর আসে। শরীররূপে থাকা যায় না। আত্মারূপে থাকা যায়। ঈশ্বরের সন্তানরূপে। তখনই মানুষের নিজস্ব রূপের বিকাশ হতে আরম্ভ হয়। ফল — শান্তি সুখ আনন্দ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২রা অক্টোবর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা চতুর্থী, ৩৩ দণ্ড । ২২ পল।

পঞ্চম অধ্যায়

আবার বনভোজন ও দুর্গোৎসব

১

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। সম্মুখে তিন দিকে বেঞ্চেতে বসা ভক্তগণ — বড় জিতেন, ডাক্তার কার্ত্তিক বক্সী, বিনয়, অমৃত, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, ছোট রমেশ প্রভৃতি।

আজ ৩রা অক্টোবর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৩১ সাল। শুক্রবার। শুক্লা পঞ্চমী। ২৩ দণ্ড। ৪৮ পল। পরে ষষ্ঠী।

দেবীপক্ষ। আজ মায়ের ষষ্ঠী পূজা। শ্রীম বালকের ন্যায় আনন্দময় — মায়ের আগমনে। শ্রীম-র চোখে মুখে তাই আনন্দ বিকশিত।

আলো আসিতেই শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বিনয়কে পাঠাইলেন কালী সিং-এর গলিতে প্রতিমা দর্শন করিতে, আর বিল্বষষ্ঠী পূজা দর্শন করিতে। ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীম-র মন আনন্দলহরে লীলায়িত। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীম দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে তিনি ষষ্ঠীর বোধন দর্শন করিতে যাইবেন। ভক্তগণ কেহ বসিয়া রহিলেন, কেহ প্রতিমা দর্শন করিতে গেলেন।

এখন রাত্রি নয়টা। শ্রীম ফিরিয়াছেন, দোতলার বারান্দায় পূর্বপ্রান্তে বসিয়াছেন বেঞ্চেতে উত্তরপূর্ব দিকে দক্ষিণাস্য। ডাক্তার ও অমৃত দক্ষিণের বেঞ্চেতে উত্তরাস্য। আর ছোট জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি দরজার পশ্চিম দিকের বেঞ্চেতে দক্ষিণাস্য বসিয়াছেন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব বসিয়া রহিলেন। তারপর পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই মা-ই (দুর্গা) ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে সর্বদা কথা কইতেন রূপ ধারণ ক'রে। ঠাকুর একদিন একজন ভক্তের (শ্রীম-র) জন্য প্রার্থনা করছেন, মা, তোমার এই ভুবনমোহন রূপটি

একটিবার একে দেখাও।

এই মা-ই জগতের মা, ব্রহ্মশক্তি। ইনিই গায়ত্রীর লক্ষ্য। এই মায়ের পূজা হচ্ছে ঘরে ঘরে আজ প্রতিমাতে। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী ইনিই। ইনিই আবার মানুষ হয়ে এসেছেন আমাদের মা-ঠাকরুণ হয়ে।

আহা, দক্ষিণেশ্বরে জগতের মাকে নিয়ে কত লীলা ঠাকুরের। কত ব্যাকুল ক্রন্দন, তবে দর্শন। তখন কত রঙ্গ কত মান অভিমান, কত আনন্দ!

কখনও বলতেন, তিনি আদ্যাশক্তির অবতার। কে বুঝবে এ রহস্য? নিজেই মা নিজেই ছেলে, যিনিই মা তিনিই ছেলে? আবার নিজেই বলছেন, শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। এ হেঁয়ালী বোঝবার যো নাই, না বোঝালে। ব্রহ্ম, শক্তি, অবতার, ভক্ত — একই চার, চারই এক। লীলায় ভাগ ভাগ হয়।

দক্ষিণেশ্বর এই লীলাভূমি। কেন যায় না মানুষ? জগতে এমন স্থান বর্তমানে কোথাও নাই। সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। প্রতি ধূলিকণা পবিত্র, রাস্তাঘাট পবিত্র। বৃক্ষলতা পবিত্র। ঘরবাড়ি মানুষ পবিত্র। বাতাবরণ পবিত্র। ভগবানের দিব্য আবির্ভাবে সব জাগ্রত জীবন্ত, সব শুদ্ধ প্রবুদ্ধ।

এই জীবন্ত পরমাণুর প্রভাব পড়ে, যারা যায় তাদের মনের উপর। পরমাণু সমষ্টিই মন — সূক্ষ্ম পরমাণু। তার উপরের শরীরটি কারণ-শরীর। এ-টিও তার চেয়ে আরও সূক্ষ্মতর, পবিত্রতর, অধিকতর স্থায়ী পরমাণুতে গঠিত। একে ঠাকুর ভাগবতী তনু বলতেন। এই ভাগবতী তনু জাগ্রত হয়ে ওঠে জীবন্ত শক্তিশালী দিব্য পরমাণুর সংস্পর্শে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি এই দুর্লভ অপার্থিব বস্তুতে পরিপূর্ণ। আবার অবতার না আসা পর্যন্ত ইহাই তীর্থরাজ।

শ্রীম অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু ওখানে যেতে হলে অনেক ভেবে যেতে হয়। নইলে তীর্থের অমর্যাদা হয়। ঐ দিনের কথাই মনে পড়ছে। আমাদের বড়ই অন্যায় হয়েছে।

ওখানে আনন্দোৎসব করতে হলে প্রথমে রামলালদাদার অনুমতি নিতে হয়। তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভোজন দিয়ে তুষ্ট করতে হয় — গুরুপুত্র কি না! ইনি ঠাকুরের মেজো ভাই রামেশ্বরের ছেলে, আবার ঠাকুরের সেবক।

তা ছাড়া, আজ পর্যন্ত মা ভবতারিণীর ইনিই প্রধান পূজারী।

তারপর ঠাকুরের সাধুদের সেবা করা দরকার। মঠ, উদ্বোধন, অদ্বৈতাশ্রম প্রভৃতির সাধুদের নিমন্ত্রণ করা উচিত।

সেদিন খাওয়ার সময় আমার কি লজ্জা হতে লাগলো! আবার রামলালদাদা পাশে বসে আছেন। তবুও খানিকটা হয়েছে, ফল মিষ্টান্নাদিতে তাঁর পূজা করে। আর মিষ্ট বচনে তুষ্ট করে। ওঁদের তুষ্ট করে তবে সব।

এমনি কর্মকাণ্ড! দেবীকে খাওয়াতে হলে আগে সাঙ্গোপাঙ্গদের খাওয়াতে হয়। দুর্গাপূজায় দেখ নাই? ইঁদুর, পেঁচা, ময়ূর, ভূত প্রেতকে আগে খাইয়ে তবে শেষে দেবীর ভোগ দেয়।

দক্ষিণেশ্বরে কিছু করতে হলে ওঁদের সব বলতে হয়। ওঁদের বাদ দিলে যেমন শিবহীন যজ্ঞ।

ওখানে কিছু করতে গেলেই, খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হলেই তাঁদের আগে বলতে হয়। আগে তাঁদের তুষ্ট করতে হয়।

অমৃত — ঐ বারে তা হলে আমাদের অন্যায় হয়েছে। আর আমরা তো জানি না কিছু।

ডাক্তার বক্সী — ঐ রকম হবে বলে তো কথা ছিল না, কিন্তু হয়ে গেল।

মোহন — তখন তো এ সব কথা আপনি আমাদের বলেন নাই? তখন বলেছিলেন, ঐখানে রান্না-বান্না ক'রে খেলে ঐ স্থানের সব জিনিস মুখস্থ হয়ে যায় — বেশী জানা থাকায়, আর বার বার দেখায়। মুখস্থ হলেই পরে মনস্থ হয়ে যায়। আমরা তো সেই জন্য এই বনভোজনের আয়োজন করেছিলাম।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, আমি যদি এ বেলা ওখানে রান্না ক'রে খাই, তা হলেও করতে হবে ওরূপ আচরণ?

শ্রীম — না, তা নয়। যদি পরামর্শ করে বড় কিছু করতে হয়, তা হলে ঐরূপ করতে হবে। দু'জন খাও না — রান্না করে খাবে। পরামর্শ করে যদি কিছু করতে হয়, কিম্বা উৎসব করতে হলে, ঐ করা দরকার।

শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। আর একজন ভক্তের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করিয়া খান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওর খুব ভাগ্য, অমন স্থানে বাস আবার।

অন্তেবাসী ও ছোট জিতেন — ওরা মা'র পেট থেকে বের হয়েই ঐ করে।

শ্রীম — ভাবলে, ও আপনাদের সকলকে হারাবে। বেদ মুখস্থ করছে। দু'পাতা পড়ে, কিংবা বি.এ., এম.এ পাস ক'রে কত করছে লোক।

একজন যুবক — কেন আমরা যাব বেদ পড়তে? ঠাকুরের অত সোজা কথা পেয়েছি — বেদের সার সব কথা।

শ্রীম (সহাস্যে) — আচ্ছা কাজ নেই আর ঐ কথা তোলায়।

রাত্রি দশটা। ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

২

বেলুড় মঠ। দুর্গোৎসব। আজ মহাষ্টমী। শ্রীম মায়ের পূজা দর্শন করিতে আজ মঠে আসিয়াছেন। এখন বেলা দশটা। আজ ৫ই অক্টোবর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। মর্টন স্কুলের ভক্তগণ শ্রীম-র আদেশে পূজা উপলক্ষে ৪ঠা থেকে ৭ই অক্টোবর বেলুড় মঠে বাস করিতেছেন। আর সাধুসঙ্গে থাকিয়া দিনরাত মায়ের সেবা করিতেছেন।

ঠাকুরঘর ও মঠবাড়ির মধ্যবর্তী স্থলে হোগলা দিয়া একটি মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। মণ্ডপের ভিতর দিক নানা রং-এর বস্ত্রাদিতে সুশোভিত। মা দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশাদিসহ মা মণ্ডপে বিরাজিতা দক্ষিণাস্যা। প্রতিমার সম্মুখে একজন ব্রহ্মচারী বসিয়া পূজা করিতেছেন। আর একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজারীর পাশে বসিয়া তন্ত্র-ধারণ করিয়াছেন। তিনি পূজারীকে পূজার ক্রম বলিয়া দিতেছেন। আর মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছেন। পূজারী সেই মন্ত্রে স-গণ মাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ-দীপ নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিতেছেন। মাঝে মাঝে শঙ্খ ঘন্টাদির নিনাদ শোনা যাইতেছে। অদূরে বাদ্যকর সানাই ও ঢাক বাজাইতেছে। ধূপধুনার সুবাসে আর বাদ্যযন্ত্রের বিঘোষে মঠভূমি মুখরিত।

আজ মহাষ্টমী, তাই খুব ভীড়। ভক্তগণ নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলে দলে আসিতেছেন। কোথাও উচ্চরাগের সঙ্গীতে মাকে আমোদিত করা হইতেছে। এই কয়দিন মঠের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

শ্রীম মণ্ডপে পূর্ব দক্ষিণ কোণে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পর তিনি মঠ পরিক্রমা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে বহু ভক্ত। প্রথমে ঠাকুর ঘর, তারপর ক্রমে স্বামীজীর ঘর, ব্রহ্মানন্দ মন্দির, মায়ের মন্দির, স্বামীজীর মন্দির দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এবার পুনরায় মায়ের মন্দিরে আসিয়াছেন।

এইখানে স্বামীজীর একনিষ্ঠ প্রেমিক ভক্ত মার্কিন মহিলা ব্রহ্মচারিণী মেকলাউড আসিয়া শ্রীম-র সঙ্গে মিলিত হইলেন। বহু সাধু ও ভক্তের জমায়েৎ বাঁধিয়াছে। দেবদারুকুঞ্জের সন্নিকটে মায়ের মন্দিরের সম্মুখে উপু হইয়া শ্রীম উত্তরাস্য বসিয়াছেন। মিস মেকলাউড শ্রীম-র সম্মুখে বসা দক্ষিণাস্য। সাধু ভক্তগণও কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন। শ্রীম ব্রহ্মচারিণী মেকলাউডের সঙ্গে আনন্দে নানা কথা কহিতেছেন। হঠাৎ শ্রীম মেকলাউডকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মিস মেকলাউড অপ্রস্তুত হইয়া উচ্চ আর্তকণ্ঠে ক্ষমা জানাইয়া বিনীতভাবে বলিতেছেন, Oh, oh! What do you do Mr. M.? You are Sri Ramakrishna's son! (আহা হা, শ্রীম, আপনি করছেন কি? আপনি যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান!)

শ্রীম প্রশান্ত কণ্ঠে সশ্রদ্ধভাবে উত্তর করিলেন — The Mother of the Universe, who is being worshipped in the image over there, the very same mother I am worshipping here in this human form. The same blissful mother is flowing before us, the Ganga. And here again she is in this temple as Holy Mother. You are the guardian angel of us all.

(ঐ মঠবাড়িতে মূর্তিতে যে জগদম্বার পূজা চলিতেছে, নররূপধারিণী সেই জগদম্বাকেই আমি প্রণাম-মুদ্রায় অর্চনা করিতেছি। সেই আনন্দময়ী মা-ই গঙ্গারূপে আমাদের সম্মুখে প্রবাহিতা। আবার সেই মাতাই এই মন্দিরে শ্রীশ্রী মা রূপে বিরাজিতা।)

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, কেন এই মহাপুরুষ, শিষ্যস্থানীয়া মিস্ মেক্‌লাউডকে এই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। নিশ্চয় আমাদের শিক্ষার জন্য।

আমরা ইঁহাদের স্বরূপ না জানিয়া অবজ্ঞা করি। তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে পারি না। আমাদের আচরণে ও কথায় ইহা প্রকাশ পায় শ্রীম-র নিকট। তাই বুঝি আমাদের চক্ষুকে অঙ্গুলি দিয়া নির্বাক বলিতেছেন, 'এঁরা' সব দেবী, মানবী নন।

কারণ তিনি ভক্তদের সর্বদা বলেন, ব্রজের গোপিনীদের কথা যাহা ভাগবতে রহিয়াছে ইঁহারা সেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী গোপিণী, — আট হাজার, দশ হাজার মাইল দূরে জন্ম নিয়াছেন। দেশ, স্বজন আরাম পরিত্যাগ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত এই মঠে বাস করিতেছেন, কেবল ভগবৎ-প্রেমের ভিখারিণী হইয়া। আবার বলেন, ঠাকুর তাঁহাকে মঠে রাখিয়াছেন, স্বামীজীর কাজের রক্ষাদেবীরূপে। শিষ্যের শিক্ষার জন্য গুরুদের কতই না কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শ্রীম-র এই আচরণ মূর্তিমান ধর্ম, ব্যবহারে উপদেশ, জীবন্ত বেদান্ত।

মর্টন স্কুলের ভক্তগণ গেস্ট হাউসের বারান্দায় এই কয়দিন রাত্রিবাস করিতেছেন। ছোট জিতেন, শচী ও জগবন্ধু বরাবর রাত্রিবাস করিতেছেন। বিনয়, রমেশ, মনোরঞ্জন, বলাই, ছোটনলিনী প্রভৃতি কোন কোনদিন রাত্রিবাস করেন। এবার পূজা তিনদিন। আবার এবার ভাসান হয় ঘাট হইতে, নৌকায় নয়।

শ্রীম চারতলের নিজকক্ষে বসিয়া আছেন বিছানায় দক্ষিণাস্য। তাঁহার সম্মুখে বসা ঢাকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার আর দুইজন সঙ্গী। ইঁহাদের বাড়ি ময়মনসিং।

আজ ৮ই অক্টোবর, শুক্লা একাদশী। এখন সকাল নয়টা। ছোট জিতেন, শচী ও জগবন্ধু মঠ হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। আজ আর তিনি বাধা দেন নাই। সাধারণতঃ শ্রীম এরূপ প্রণাম অনুমোদন করেন না।

পরের দিন সাধু ও ভক্তগণ ঁবিজয়ার প্রণাম করিতে অনেকে আসিতেছেন যাইতেছেন। শচী, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন পূজার ছুটিতে আসন পাতিয়াছেন দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে। এই ঘরেই তাঁহারা রন্ধন করিয়া নিত্য ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পান। সাধু ভক্তগণ প্রথমে এইখানে আসিয়া বসেন। তারপর শ্রীম-র সঙ্গে দেখা করেন।

তাহার পরের দিন ১০ই অক্টোবর। আজও সারাদিন সাধু ভক্ত শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিতেছেন। এখন অপরাহ্ণ ৪টা। শ্রীম-র নিকট বসিয়া আছেন স্বামী দয়ানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ ও ওঁঙ্কারানন্দ। একটু পর আসিলেন স্বামী সম্বিদানন্দ।

এখন সন্ধ্যা সাতটা। জগবন্ধু শ্রীমকে প্রণাম করিয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন। সঙ্গী হইলেন ছোট জিতেন ও বিনয়। তিনি শ্রীম-র আদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া ৺কাশীধাম দর্শনে যাইতেছেন।

শ্রীম দ্বিতলের ঘরে বসা। জিতেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত শীঘ্র উঠে পড়লেন কেন? জিতেন উত্তর করিলেন, আমি ও বিনয় জগবন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে যাচ্ছি। শ্রীম বলিলেন, তা হলে আসুন। সময় বেশী নাই।

জগবন্ধু বেনারস এক্সপ্রেসে রওনা হইলেন। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম বলিয়াছেন, তীর্থের ও তপস্যার বিবরণ মাঝে মাঝে পত্রে জানালে আমাদের খুব উপকার হবে। এখানে বসেই আমাদের সব দর্শন হয়ে যাবে। একজন কেউ তীর্থ ও তপস্যা করলে অপরদের লাভ হয়। এই কৌশলটি ঠাকুর শিখিয়েছিলেন।

তীর্থযাত্রী গাড়িতে বসিয়া ভাবিতেছেন, আমার শরীর দেখছি যাচ্ছে তীর্থরাজ কাশীতে। মনের উপরাংশ কাশীদর্শনের আনন্দে মগ্ন। কিন্তু, নিম্নাংশ দেখছি, শ্রীম-র কাছে বাঁধা। কানে বাজিতেছে শ্রীম-র শেষ আদেশ — মাঝে মাঝে তীর্থ ও তপস্যার বিবরণ চাই।

১০ই অক্টোবর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৩১ সাল,
শুক্রবার, শুক্লা দ্বাদশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানভক্তির ভাণ্ডার কাশী

১

মর্টন স্কুল। সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীম নিজকক্ষে বিছানায় বসিয়া আছেন। জগবন্ধু আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি এইমাত্র তিন সপ্তাহ পর কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিছানার দক্ষিণদিকের বেঞ্চেতে উপবিষ্ট। পাশে ছোট জিতেন ও শচী। কাশীর কথাই হইতেছে।

আজ ১লা নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। শনিবার শুক্লা পঞ্চমী, ৪৯ দণ্ড। ৪৩ পল।

শ্রীম — যেখানে ছিলেন সেখানে থেকে বিশ্বনাথ ও দশাশ্বমেধ ঘাট কত দূর, আর অদ্বৈতাশ্রম?

জগবন্ধু — এক মাইলের মধ্যে স্যর। আমি ছিলাম ১৭ নম্বর রামাপুরী। ওখানে বিনয়ের কনিষ্ঠ ভাই প্রভাস থাকে। বিশ্বাসমশায়ও থাকেন। তিনি তীর্থবাস করেন। স্টেশন মাস্টার ছিলেন। অনেকদিন হাতরাসে ছিলেন স্বামীজীরা প্রব্রজ্যার সময় অনেকেই তাঁর কাছে থাকতেন।

শ্রীম — আজ বুঝি হরতাল। হাওড়া থেকে এলেন কি করে?

জগবন্ধু — ট্রাম চলছে। কিন্তু আর কোন যানবাহন নাই। হাওড়া থেকে ট্রামে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে। সেখান থেকে হেঁটে — হাতে ব্যাগ, বগলে বাঘাম্বরী কম্বলের বাণ্ডেল। এইমাত্রই এলাম। আপনিও ঘরে ঢুকলেন আর আমিও তখনই চারতলায় উঠলাম। ছাদে জিতেন ও শচী বসা ছিলেন।

শ্রীম — নিত্য ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন হয়েছে তো? তীর্থবাস করতে গেলে তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিত্যদর্শন ও প্রণাম করতে হয় যদি শরীর সবল থাকে। তা না হলে অপরাধ হয়। মনে কর, মা ও বাপ

একই শহরে একস্থানে আছে। আর ছেলে আছে কর্মের জন্য অন্যত্র। ছেলে যেমন নিত্য মা বাপের সংবাদ নেয়, তেমনি এই। যারা ভগবানকে চায় তাদের এসব মেনে চলতে হয়। এরই নাম ভক্তি। ঈশ্বর পিতামাতার পিতামাতা।

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ। কখনও দু'বার দর্শন হতো যেদিন আরতি দর্শন করতাম। বসে জপ করতাম। খুব উদ্দীপন হতো। চরণামৃত ধারণ, পরিক্রমা এ-ও করতাম। ওর ভিতর ঢুকলে আপনি দেখেছি মন শান্ত হয়ে যায়।

শ্রীম — কাশীতীর্থ। ঠাকুর দর্শন করেছিলেন ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা। জাগ্রত জীবন্ত। কত অত্যাচার করেছে কত লোক। কিন্তু সদাই একরূপ। এর প্রমাণও এই — ঢুকলেই মন স্থির হয়ে যায়। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, তুমি তাঁকে ভাব। তিনি যার যা দরকার করেছেন। ঘাটিতে ঘাটিতে তীর্থ দেবতা। সংসার জ্বলন্ত অনল, ঠাকুর বলতেন। তাই তিনি ভক্তদের শান্তির জন্য তীর্থ, দেবালয়, সাধু করে রেখেছেন।

অদ্বৈতাশ্রম সেবাশ্রমে যেতেন তো প্রায়ই? শান্তানন্দ, চন্দ্র মহারাজ প্রভৃতি সাধুরা ভাল আছেন তো? বাইরে কোন্ কোন্ মঠ আশ্রমে যেতেন? দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করতেন তো? এইরূপ বহু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন শ্রীম। এই সকল প্রশ্নের ভিতর লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, — একটি প্রশ্নও বিষয় লইয়া নয়। সব প্রশ্ন, দেবতা, সাধু, মঠ, আশ্রম, ভক্ত, তীর্থ বিষয়ক।

শ্রীম — বিন্ধ্যাচল গিছলেন কি? বিন্দুবাসিনীর দর্শন হয়েছে তো? একান্ন দেবীপীঠের এক পীঠ ইহা।

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ, আমি, রামময় ও মুকুন্দবাবু এক সঙ্গে যাই। আবার সেবাশ্রম থেকে গিছলেন ছকুমহারাজ। বাঙ্গাল মাঈ-ও চপলাকে নিয়ে যান। আমরা পাণ্ডার বাড়িতে ছিলাম। দেবীর মন্দির দর্শন ক'রে আনন্দ হল। কিন্তু পাহাড়ের উপরে আরো বেশী আনন্দ হয়।

শ্রীম — বিন্ধ্যাচলে পাহাড়ের উপর সাধুদের সঙ্গে কিছু কথা হল?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ। বৃদ্ধ মহাত্মা পূর্ণানন্দের সঙ্গে। তিনি নগ্ন থাকেন অষ্টাভূজামন্দিরের কাছে, কুটীরে। তিনি অযাচিতভাবে ঠাকুরের

উপর কটাক্ষ করেন। তাতে আমার জেদ বাড়ে। তাঁর কথা কেটে ওঁকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তিনি আদর করতে লাগলেন।

আর এক স্থানে পাহাড়ের উপরই নিচে মন্দির। সেখানেও সাধু দেখলাম।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, সাধুমাত্রই নারায়ণ। রজোগুণী, তমোগুণী মহাত্মাও আছেন। সকলকেই প্রণাম করতে হয়। ত্যাগী বলে তাঁরা আমাদের পূজনীয়। সাধুকে কিছু বলতে হলে হাত জোড় করে বলতে হয়।

শ্রীম — কাশীতে কোথায় বসতেন গঙ্গার তীরে?

জগবন্ধু — কেদারঘাটে। বড় সুন্দর দৃশ্য। শত শত লোক বসে ধ্যান করছে — অনেকক্ষণ বসতাম। সামনে গঙ্গা বিশাল। মাঝে নৌকাযাত্রীর উচ্চরব — 'গঙ্গে হর'। বড় উদ্দীপনের স্থান!

শ্রীম — বেশ স্থান। গঙ্গাতীরের সব স্থানই পবিত্র। কিন্তু কেদারঘাট আরও পবিত্র। এর পাশের বাড়িতেই ঠাকুর ছিলেন রাজাবাবুদের বাড়িতে। অনুমান করা যায় ঐ ঘাটে গিয়ে প্রায়ই বসতেন, গঙ্গাদর্শন করতেন ও নাইতেন। কখনও সমাধিস্থ হতেন। কখনও প্রত্যক্ষ শিব পার্বতী দর্শন করতেন। ঠাকুরের ঐ সব চিন্তন, দর্শন, কথা কওয়া, মূর্তিমান হয়ে রয়েছে সূক্ষ্মে ঐ স্থানে। উপযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে ঐ সব ভাব আবির্ভূত হয় ঐ স্থানে গেলে। তাতেই অজ্ঞাত আনন্দে পরিপূর্ণ হয় ভক্তের হৃদয় মন।

এইরূপে অনন্তকাল থেকে ঐসব স্থানে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে ঋষি মুনি, অবতার মহাপুরুষদের আগমনে। অধ্যাত্ম দৌলতের ভাণ্ডার ঐ সব স্থান। যেমন রাজ-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার রাজকোষ, তেমনি ভক্তদের জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের ভাণ্ডার তীর্থ।

ঠাকুর বলতেন, কাশীতে শিব মুমূর্ষুদের কর্ণে রাম নাম শোনান আর মা অন্নপূর্ণা জীবের জন্মমরণ পাশ ছিন্ন করে দেন। তিনি নিজ চক্ষে দেখেছিলেন, আর সমাধিস্থ হয়ে গিছলেন মণিকর্ণিকায় — নৌকার উপর। বলেছিলেন, দেখলুম, 'মা কচকচ করে কেটে দিচ্ছেন মায়াপাশ'। আর বলেছিলেন, 'সমগ্র কাশী স্বর্গপুরী দেখলুম।' শাস্ত্রে এসব কথা আছে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস লুপ্ত হয়ে যায় সময়ের আড়ালে। আবার ঠাকুর এসে প্রত্যক্ষ ক'রে পুনরায় উদ্দীপিত জাগ্রত ক'রে দিয়েছেন ঐসব

সত্য, ভক্তদের কাছ। এইরূপে অনন্তকালের অক্ষয় ভাণ্ডার ঐ সব তীর্থ।

কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তিলাভ হয়, শাস্ত্রে আছে। ঠাকুর সেটা প্রায় প্রত্যক্ষ করালেন ভক্তদের কাছে। হৃদয়ের মায়ের বুকে পা দিয়ে বলেছিলেন, দিদি, কাশীতে তোমার মৃত্যু হবে। শেষে তাই হলো। অপরে ঐ কথা শুনেও গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু যখন তাই সত্য হল তখন তারা বিশ্বাস করলো। তিনি বড় বোন ছিলেন। ঠাকুরকে চিনেছিলেন অবতার বলে।

মানুষ এসব কি করে বুঝবে বিষয়-দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে? আশ্চর্য ব্যাপার সব। বিশ্বাস ছাড়া উপায় নাই — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। অবতারের বাক্যে বিশ্বাস। এটাই হল consistent position (স্থির সিদ্ধান্ত) বিশ্বাস — বিশ্বাস।

ভক্ত কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীম দেখিতেছেন যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ আসিয়াছেন। প্রেমসিঞ্চিত কত প্রশ্ন! কত আনন্দ! আহ্লাদে যেন চোখ মুখ উদ্ভাসিত। কাশীবাসী প্রায় একশত সাধুভক্তের নাম, কুশল ও তপস্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন — লোক যেমন প্রবাসে নিজ গৃহের কুশল সংবাদ নেয়।

ভক্তটি ভাবিতেছেন, কাশীতে গিয়া আমার যেরূপ আনন্দ লাভ হয় নাই, শ্রীম-র এই দৈবী উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার অধিক আনন্দ হইল। তিনি আরও ভাবিতেছেন, মহাপুরুষগণ বুঝি ঈশ্বরীয় স্থান ও ব্যক্তিদের যথার্থ আপনার বাড়ি ও স্বজন মনে করেন। তাই তাঁহারা সংসারে বাস করিয়াও অ-সংসারী।

রাত্রি আটটা। শ্রীম দ্বিতলের ঘরে মেঝেতে মাদুরে বসিয়া আছেন। তিনদিকে ভক্তগণ — শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, এটর্নি বীরেন ও তাঁহার সঙ্গী উকীল, ডাক্তার, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি। বীরেনের সঙ্গী উকীলকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — এই রকম চলেছে। একদল যাচ্ছে। আর একদল আসছে নূতন energy (শক্তি) নিয়ে। অফুরন্ত শক্তি তাঁর যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করেছেন।

কয়দিন থেকে আমাদের এখানে বুদ্ধচরিত পাঠ চলেছে। বুদ্ধদেব কুশীনগরে শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। এই শরীরটা থাকবে না। একে

নিয়ে চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে। গাড়ির একটা চাকা ভেঙ্গে গেলে যেমন ছেঁচড়িয়ে গাড়িটা চালায়, তেমনি মনে হচ্ছে এই শরীর। আর চলতে পারা যাচ্ছে না।

এই সব করছে লোক — সংসার বাড়িঘর রাজ্য। কিন্তু এ সব যে কিছুই থাকবে না। থাকবেন একমাত্র ঈশ্বর। তিনি চিরকাল আছেন, ও চিরকাল থাকবেন। তাঁরই সঙ্গে আত্মীয়তা কর। তাঁকেই অনন্তকালের বন্ধু বলে জান। আপনজন বলে জান। তাহলে আর এখানে থাকার সময়, আবার চলে যাবার সময় শোকমোহে আচ্ছন্ন হবে না। আনন্দে থাকবে আনন্দে যাবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ না কি কাণ্ড! গোপা এসে প্রণাম করলেন বুদ্ধদেবকে। তিনি চিনতে পারলেন না তাঁকে, যেন কে। শেষে তিনিও সন্ন্যাসিনী হলেন। তিনি স্বতন্ত্র মঠ করলেন স্ত্রীলোকদের জন্য। সাত বছরের বালক পুত্র রাহুল সন্ন্যাসী হল। Step brother (বৈমাত্রেয় ভাই) আনন্দ heir apparent (যুবরাজ), তিনি এই সব দেখে আর ঘরে গেলেন না। সমগ্র পরিবার সন্ন্যাসী।

এ সব personality (ব্যক্তি) যার সংস্পর্শে তৈরী হল, সেই ব্যক্তি কেমন লোক? তিনি কে গো? (একটু ভেবে) A tree is known by its fruits (গাছের পরিচয় ফলে)।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, ওরা (শ্রীশ্রীমা) দেশে যাবে। আমায় এসে প্রণাম করলে। আমি ভাবছি, এ কে এলো — যেন আমার পরিচিতই নয়।

দেখ, অবতার পুরুষ, তাঁর এ অবস্থা!

কেন বলছেন এসব কথা? না, লোকশিক্ষার জন্য।

শ্রীম (উকীলের প্রতি) — কি হবে এসব — টাকাকড়ি, বাড়ি-ঘর, লোকজন দিয়ে? কিছুই তো সঙ্গে যাবে না। তবে আর অত কেন? সঙ্গে যাবে কেবল ভক্তি বিশ্বাস। তাই উপার্জন ও সঞ্চয় করতে হয়। তারই জন্য ঈশ্বর বানপ্রস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিন্ত মনে ওখানে বসে এই অপার্থিব জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস উপার্জন করতে হয়।

আগে শুনতে পেতাম বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেলেই বানপ্রস্থ অবলম্বন

করতো লোক। এখন আর সে সব কথা প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সঙ্গে কিছুই যাবে না। যাবে কেবল ঈশ্বরের নাম, তাঁর প্রতি ভালবাসা।

সম্প্রতি শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পার্শীবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করার জন্য সায়েন্স কলেজে স্মৃতিসভা হইবে। দুইটি যুবক আসিয়া শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। কয়দিন হইতে ভক্তগণ শ্রীম-র ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছেন। শরৎবাবুর শরীর ত্যাগের পর হইতেই শ্রীম-র এই অবস্থা। এখন স্মৃতিসভার কথা শুনিয়া যেন শ্রীম-র বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া গেল। শরৎবাবু বয়োকনিষ্ঠ। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরার শ্রীম কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — মহৎ লোক — one of the noble souls. কাজ ফুরিয়েছে, চলে গেলেন। এঁদের যখন শ্রদ্ধা করতে লোক শিখেছে তখন বুঝতে হবে দেশ উপরে উঠেছে! ইনি নিষ্কাম কর্মবীর।

জগবন্ধু আজ সকালে ৺কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। ইনি ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি দেবদেবীর প্রসাদ আনিয়াছেন। বিনয় তাহা বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — নাম ক'রে ক'রে দিতে হয়। তাহলে ঐ সব স্থানের উদ্দীপন হবে।

প্রসাদ-দর্শন-স্পর্শন-প্রণাম, সেবন আবার নামশ্রবণ করতে হয়। এ করতে করতে ভক্তি হয়। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন প্রসাদ খেলে ভক্তিলাভ হয়। ৺জগন্নাথের আঁটকে প্রসাদ দিলে প্রথমে নিতে চায় নাই। বলেছিল, এ খেলে কি লাভ হবে — এই শুকনো চাল? তখন ঠাকুর ঐ বললেন এ খেলে ভক্তিলাভ হয়। তখন নরেন্দ্র নির্বিচারে নিল, এমনি কাণ্ড।

শ্রীম দৌহিত্র বুলেকে দিয়া তিনতলা হইতে একটি বাটি আনাইয়া উহাতে প্রসাদ সব রাখিলেন। তারপর এই প্রসাদ উপরে পাঠাইলেন মেয়েদের মহলে গিন্নীমা প্রভৃতিকে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভক্তি আকাশ থেকে পড়ে না, অর্জন করতে হয়। এইরূপ করতে করতে হয় —

'অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং'। (গীতা ৬ : ৪৫) (শুকলাল ও ডাক্তারের প্রতি) আপনারাও প্রসাদ বাড়ি নিয়ে যান।

২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মর্টন স্কুল। দ্বিতলের সভাগৃহে শ্রীম বসিয়া আছেন। এই মাত্র ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন। ভক্তগণ তিন দিকে বসা, মেঝেতে মাদুরে।

আজ ৭ই নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২১শে কার্তিক ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, শুক্লা একাদশী ২৪।২ পল।

দুর্গাপদ মিত্রের প্রবেশ। ইনি হিলিংবামের ম্যানেজার। তিনি খুব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আর ভক্তিমান। প্রণাম করিয়াই তিনি রাজনীতির কথা তুলিলেন।

দুর্গাপদ — সি. আর. দাশ বেঙ্গল বিধান সভাতে বিজয়ী — ব্রিটিশ সরকারকে হারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্বরাজ্য পার্টির বিজয়ের কথা আজ সকলের মুখে। স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনে গান্ধী মহারাজের প্রথমে মত ছিল না। পরে অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের ব্রিটিশ সরকার বিব্রত। ইত্যাদি।

শ্রীম অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্বাক এই সব কথা শুনিয়াছেন। এইবার তিনি কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (আহ্লাদে) — আহা, গান্ধী মহারাজ যেন ত্যাগ-মূর্তি। যেখানে weakness (দুর্বলতা) সেখানেই তিনি যোগদান করছেন। এতে দুর্বল সবল হয়!

'যতো ধর্ম্মস্ততো কৃষ্ণঃ যতো কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ'। ধর্ম মানে — সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, সংযম, ত্যাগ — এইসব। মনুসংহিতায় আছে, ধর্মের কথা — দশ লক্ষণযুক্ত ধর্মের কথা।

আবার আছে, 'জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।'

গান্ধী মহারাজ যোগ দেওয়ায় দাশ মশায়ের পার্টি strong

(শক্তিশালী) হলো। আমরা আশঙ্কা করছিলাম, এই বুঝি দাশ মশায়কেও ধরবে।

এখন গভর্ণমেন্ট কি চাল দিবে জানেন? এখন মুসলমানদের হাত করার চেষ্টা করবে। এটা দেখতে পাচ্ছি।

সরকার যাই করুক পেরে উঠবে না। ভারতকে আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভারত উঠুক। তাই এমন সব মহাপুরুষ এসে রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। গান্ধী মহারাজ, দাশ মশায় এঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে দুঃখবরণ করেছেন — স্বদেশের উদ্ধারের জন্য। আর পারবে না রাখতে। স্বরাজ লাভ নিশ্চয় হবে।

যারা এ সব শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না তারা মোহান্ধ। সর্বস্ব ছেড়ে নিষ্কাম ভাবে যে নেতৃত্ব তার সঙ্গে যে ভগবৎ শক্তি রয়েছে! ভগবৎশক্তির কাছে অন্য শক্তি হীন, অতি হীন। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যেন পশুশক্তিরই জয়। কিন্তু তা নয়। দেবশক্তির বিজয় শেষ অবধি নিশ্চয়। তাই বেদে আছে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ (মুণ্ডক ৩/১/৬)।

এক পক্ষ লড়ছে নিজের ভোগের জন্য। অপর পক্ষ ভগবানের জন্য। এই দুই-ই কি এক? আকাশ পাতাল তফাৎ। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'।

পরের দিন শনিবার। মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম পূর্বাস্য হইয়া কোণে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণ কেহ বারান্দায় বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন, কেহ ঘরের ভিতর ধ্যান করিতেছেন। প্রায় এক ঘন্টা পর শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মাদুরে পূর্বাস্য উপবিষ্ট। কথোপকথন হইতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — ঈশ্বরকে কি মানুষ জানতে পারে?

শ্রীম - তাঁকে যদি জানা যাবে তবে তিনি ঈশ্বর কেন? জানা মানে তো আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা? যেমন আরও দশটা বস্তু জানি — বাড়িঘর, গাড়িঘোড়া। তা দিয়ে কি করে জানা যায়? তিনি যে ইন্দ্রিয়ের বাইরের বস্তু — 'অবাঙ্মনসগোচরম্'।

অবতার এলে একটু একটু বোঝা যায়। তার সবটা জানা যায় না। দিগন্তব্যাপী একটা মাঠ। তার মাঝে একটা দেয়াল রয়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওপারের। যদি ঐ দেয়ালে একটু ক্ষুদ্র ছিদ্র করা যায় তা হলে

ঐটে দিয়ে ওপারের কিছু কিছু দেখা যায়।

অবতার ঐ ছিদ্র, ঠাকুর বলেছিলেন। নিজের পরিচয় নিজে দিলেন হেঁয়ালীর ছলে ঐ ভাবে।

একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) জিজ্ঞাসা করলেন, বল দেখি ঐ ছিদ্রটা কি? ভক্ত তক্ষুনিই উত্তর করলেন, সেটা আপনি। খুব আহ্লাদে তিনি বললেন, 'ইয়া'।

বাপ যেমন নিশ্চিন্ত হয় আর আনন্দ প্রকাশ করে ছেলে লায়েক হয়েছে দেখে, তেমনি আনন্দ প্রকাশ করলেন ঠাকুর ঐ ভক্তটির উত্তর শুনে। মানে, ভক্ত তাঁকে চিনতে পেরেছেন, অবতার বলে।

সে কি ভক্তের বাহাদুরী? তিনি ধরা দিলেন তাই তাঁকে ধরতে পারলেন। তিনি চিনালেন তাই চিনলেন। কার সাধ্য তাঁকে চিনে?

ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সার বস্তু নিয়ে আসেন মানুষ শরীর ধারণ করে, অবতার হয়ে। অবতার যেন গরুর বাঁট।

বলেছিলেন, যেমন গরুর শরীরের শ্রেষ্ঠ জিনিস দুধ। আর সেই দুধ আসে তার বাঁট দিয়ে। তেমনি ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন করলেও, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হলেও, তিনি মানুষের শরীর নিয়ে আসেন। আর সেই শরীরের ভিতর দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ প্রেম সমাধি, ভক্তদের দেখান। এইগুলিই হল শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য — এই সচ্চিদানন্দ রূপ।

সচ্চিদানন্দের greatest manifestation হয় অবতারে। এর একটু বুঝতে পারলেই কাজ হয়ে গেল। মানুষ ধন্য হয়ে গেল, কৃতকৃত্য হয়ে গেল।

বলেছিলেন, গঙ্গার সবটা ছোঁয়ার কি দরকার — গঙ্গোত্তরী থেকে গঙ্গাসাগর? এক স্থানে ছুঁলেই হল গঙ্গা-ছোঁয়া। তেমনি অবতারের ভিতর ঈশ্বরকে দেখতে পেলেই ঈশ্বর দেখা হল, ঈশ্বরকে জানা হল। অবতার আর ঈশ্বর এক — 'I and my Father are one' (St. John 10:30) — ক্রাইস্ট বলেছিলেন।

ঠাকুর ঈশ্বরকে, সচ্চিদানন্দকে মা বলতেন। তিনিও বলেছিলেন, 'মা আর আমি এক।'

তাই বলেছিলেন, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে। মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ছেলেদের ছবি দেখায়। এক পয়সা করে নেয়। বাক্সের ভিতর ছবি থাকে। একটা রিং টেনে দিল অমনি একটা ছবি বের হলো। একটা গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখে। বেশ সুর করে বলে — এই দেখ, মক্কা শহর এল, এই এল কাশী।

ছেলেরা এ সব ছবি আগেও দেখেছে কিন্তু বুঝতে পারে নি। কারণ অভিনিবেশ নেই। একটা লোক যখন interpret (ব্যাখ্যা) করলো তখন বুঝতে পারলো।

তেমনি আমারও সব দেখছি — জীব, জগৎ — এই সব। কিন্তু বুঝতে পারছি না। অবতারকেও দেখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না, যতক্ষণ না তিনি বোঝান, interpret (ব্যাখ্যা) করেন।

এই কথা লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'॥

(গীতা ৯:১১)

আমাকে মানুষ অবজ্ঞা করছে আমার ঈশ্বর-ভাব জানতে না পেরে। কিন্তু যখন অর্জুনকে জানালেন, তখন তিনি স্তব করছেন, 'দেবেশ জগন্নিবাস' বলে। (গীতা ১১:২৫)।

অবতার যখন interpret (ব্যাখ্যা) করেন, তখন বোঝা যায়, জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। তিনিই পরিচালক। নইলে মনে হয়, আপনিই এ সব হয়েছে। খেয়ালই নেই, কি এ সব, কেন এ সব, কোথা থেকে এলো এ সব। আবার মানুষের জন্ম মরণ হয় কেন? কোথায় তার শেষ?

অবতার এসে explain (ব্যাখ্যা) করলে তবে এ সব বোঝা যায়, এই mystery solved (এই হেঁয়ালির সমাধান) হয়।

শ্রীম দীর্ঘকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অনুভব তো সহজ। পাখার হাওয়া গায়ে লাগছে। বোঝা যাচ্ছে, একজন লোক টানছে। তাকে না দেখলেও অনুমান হচ্ছে। এ-ও এক রকম অনুভব, এক রকম জানা।

জল চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু ফল ফুল — যে সময়ের যা, এই সব দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, একজন আছেন এ সবের পেছনে। তিনিই এ সব সৃষ্টি করছেন, চালাচ্ছেন। এ বিশ্বাস হলেও অনেকটা হল।

কিন্তু এরও ওপরে আছে — তাঁর দর্শন, সাক্ষাৎকার। ভক্তের কাছে রূপ ধরে আসেন ভগবান। ঠাকুর নিজে দেখেছেন, ভক্তদেরও দেখিয়েছেন।

একদিন বললেন, 'এই যে মা এসেছেন — বেনারসী পরে। মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' অনুভবের ওপর হল, এই দর্শন — সাক্ষাৎকার। একঘর লোকের মধ্যে বলছেন এই কথা। বিজয় গোস্বামী প্রভৃতিও রয়েছেন। প্রায় সবাই sceptic (নাস্তিক)।

তাঁর এই কথাকে challenge (প্রতিবাদ) করতে পারে, কার এ সাধ্য আছে? দর্শন তো শুধু নয়, আবার কথা কওয়া! আবার সে কথা মিলে যাচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে।

ঠাকুরের সঙ্গে যে সব কথা কয়েছেন মা দর্শন দিয়ে, ঠাকুর ঐ সব কথা ভক্তদের বলেছেন। ঐ সব কথা আবার কাজে সত্য হয়েছে, ফলেছে। তবে আর কি করে বলা যায়, এ সব মনের ভ্রম?

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — ঈশ্বর মানুষ হয়ে না এলে ঈশ্বরতত্ত্ব কেউ কখনও বুঝতে পারতো না। মানুষ হয়ে এসে বুঝিয়ে দেন এই তত্ত্ব। প্রথম নিজেকে বোঝান, নিজেকে চেনান। তারপর এই জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্ত বুঝতে পারে by analogy (উপমা দ্বারা) ঈশ্বর কি। তারপর বোঝান — আমিই ঈশ্বর। ঠাকুরকে যারা বুঝেছে তারা ঈশ্বরকে জেনেছে। ঠাকুর অবতার, গুরুরূপে ভক্তদের আপন আপন ঘর বলে দিয়েছেন — এ এই, যার যা ঘর।

The greatest manifestation of God in man is the Avatar (অবতারে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ)। The Avatar tells men, ye are divinities (অবতার বলে দেন মানুষকে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান — অমৃতস্য পুত্রাঃ)।

অবতারের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য ভক্তদের আপন স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া। আর তাঁর রূপ, লীলা ও বাণী চিন্তা ক'রে ভক্তরা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যাতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতে পারে, তার উপায় দেখিয়ে দেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমাকে চিন্তা করলেই হবে। আর বলেছিলেন, আমি অবতার। আমাকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হল।

৮ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২২শে কার্তিক ১৩৩১ সাল।
শনিবার, শুক্লা দ্বাদশী, ২৩ দণ্ড। ৩৫ পল।

সপ্তম অধ্যায়

সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ হয় ঈশ্বরদর্শনে

মর্টন স্কুল। রাত্রি আটটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, পূর্ব ধারে পূর্বাস্য। তিনি বুদ্ধিরামের সহিত কথা কহিতেছেন।

পাশে বসিবার ঘরে ভক্তগণ বসিয়া আছেন মেঝেতে মাদুরের উপর। শ্রীম এইমাত্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিয়াছেন ভক্তদের সঙ্গে। অনেক ভক্ত আজ আসিয়াছেন। ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় অমূল্য, গদাধর, মনোরঞ্জন, রমেশ, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি ঘরের মধ্যে বসা। পরে বুদ্ধিরাম আসিলেন। সুরপতি দুই একজন সঙ্গী বন্ধুর সহিত আসিয়াছেন। কেহ দক্ষিণাস্য, কেহ পশ্চিমাস্য, কেহ উত্তরাস্য উপবিষ্ট। ভক্তগণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম সকলের শেষে গৃহে প্রবেশ করিয়া বাঘাম্বরী কম্বলের উপর বসিয়াছেন পূর্বাস্য। তাঁহার পশ্চাতে ঘরের পশ্চিমের দেয়াল।

উকীল শ্রীললিত ব্যানার্জী রাস্তায় শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

শ্রীম বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভক্তদের সমালোচনা শুনিয়াছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বসলেই মনে হয় যেন তিনি (ঠাকুর) কথা কইছেন। ওখানে তাঁরই সব কথা শুনতে পাওয়া যায়। আজ কেশববাবুর কেমন কথা হল, 'ইচ্ছা হয় তাঁর জন্য শুধু শাক ভাত খাই'। আহা, কি কথা! গীতায়ও আছে একথা — 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' (গীতা ৮:১১)। শাক ভাত খাওয়া মানে — কঠোরতা করা, ব্রহ্মচর্য করা, তপস্যা করা। কি কথা! কি ব্যাকুলতা!

ভগবানের জন্য কি না করা যায়! তাঁর ওপর কতখানি গভীর ভালবাসা হলে একথা আসে মন থেকে। নরেন্দ্রও বলেছিলেন, তাঁর জন্য

প্রায়োপবেশন করবো, পশ্চিমে কোনও বাগানে বসে। 'ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।' — এ-ও গীতার কথা (গীতা ১৭:১৪) । ভগবানলাভের জন্য লোক ব্রহ্মচারী হয়।

ঠাকুরের সব কথাই এঁরা, ব্রাহ্মরা নিয়েছেন! ঠাকুর কি impression (কি প্রগাঢ় ছাপ) এঁকে দিয়েছেন! তাঁর কথা ভুলতে পারেন নাই, কত কাল হয়ে গেছে তবুও। সেই 'মা মা, লক্ষ্মী সরস্বতী জগদ্ধাত্রী, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' — এ সবই ঠাকুরের কথা — আজ যা শোনা গেল ওখানে। তাঁদের লিডারের ভিতর ঢুকিয়ে দিছলেন কিনা। তাই filtered down (প্রবাহিত) হচ্ছে এঁদের ভিতর দিয়ে।

বড় অমূল্য — younger generation (তরুণ বংশধরগণ) এ কথা স্বীকারই করেন না যে, তাঁরা ঠাকুরের কাছ থেকে 'মা, মা' পেয়েছেন।

শ্রীম (তীক্ষ্ণ তিরস্কারের স্বরে) — ও কথা তো হচ্ছে না। ওরা কি, সে বিচার তিনিই করবেন। আমরা কিন্তু তাঁরই (ঠাকুরের) কথাই শুনতে পাচ্ছি সেখানে। ওঁদের কাছে গেলে মনে হয় যেন তিনিই (ঠাকুরই) কথা কইছেন। কথা, গান, ভাব সবই তাঁর জিনিস।

কি বলে, orbit-এ (বৃত্তের ভিতর) থাকলে genial heat (স্নিগ্ধ উত্তাপ) পাওয়া যায়। তা না করে, একেবারে tangent-এ (বাইরে) চলে গেলাম। কম্বলের উপর আঙ্গুল দিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া — এই orbit (বৃত্ত) —। তার ভিতর না থেকে একেবারে tangent-এ (বাইরে) যাওয়া।

বড় অমূল্য — তাঁরা অস্বীকার —

শ্রীম (কথা শেষ না হইতেই প্রবল বাধা দিয়া) — না মশায়, ও কথা আর বলবেন না।

শ্রীম কিছুকাল নিরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেউ কেউ ওঁদের 'বেম্ম বেম্ম' বলে। ও কথা শুনলে আমাদের বড় কষ্ট হয়।

Offensive (অপ্রীতিদায়ক) হবার সময় কোথায়? শোক দুঃখ দাসত্ব — আবার ইন্দ্রিয়, এদের জ্বালায় সর্বদা অস্থির! এ অবস্থায় offensive (আক্রমণকারী) হওয়া কি সাজে? Always on the

defensive (সর্বদা আত্মরক্ষা করা)।

কি বলে, 'ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে।' ভিতরে ইন্দ্রিয়, আবার বাইরে শোক দুঃখ, এই সব। এদের জ্বালায় অস্থির।

ওঁদের দোষ থাকে তিনি দেখবেন। তিনি আছেন না? তিনিই চালিয়ে নেবেন এঁদের সকলকে — in their own way (তাঁদের অনুকূল পথে)। এ সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে।

দেখ না, মরুভূমির মাঝে কোত্থেকে 'নিরাকার' বেরুল — মহম্মদের মুখ থেকে। আবার দেখ Christianity (খ্রীষ্টধর্ম)। — এ সবই তিনি করছেন।

(উচ্চ কণ্ঠে) No leisure, no time to be critical. Simply you can not afford to be critical. (অবসর কোথায়? সমালোচনা করার সময় কোথায়? না, না। সমালোচনা করা তোমার মুখে একেবারেই সাজে না)।

শ্রীম নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — একজন পণ্ডিত ভাগবত শোনাতো এক রাজাকে। রাজাকে প্রায়ই বলতো, বুঝেছেন? রাজা বলতো তুমি আগে বোঝো। বলে, এ দিকে নিজের ঘর পুড়ে যাচ্ছে, তা দেখছে না। আবার অন্যের ঘরের আগুন দেখতে যাওয়া।

ক্রাইস্ট তাই বলেছিলেন, why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? অপরের চোখে একটু কুটো পড়েছে তার উপর তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে একটা মস্ত বড় কড়িকাঠ পড়ে আছে। সেখানে তুমি একেবারে অন্ধ। আমার সময় কোথায় ও সব দেখবার?

বড় অমূল্যের দুই বৎসর বয়স্কা একটি কন্যার দেহত্যাগ হইয়াছে দুই মাস হইল। তাহা স্মরণ করাইয়া শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ না, একটা শোকে কেমন ওলটপালট করে দিয়ে যায়। আবার একটা রোগ হলে সব ভুলে যায়।

শ্রীম পুনরায় নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি, লক্ষ্য বড় অমূল্য) — তোমাদের কলকাতার লোকদের ঐ এক রোগ, খালি লেকচার দেয়, ঠাকুর বলতেন। দু'এক পাতা পড়ে ভাবে, আমি সব জেনে ফেলেছি। সেকেণ্ড ডে-তে (দ্বিতীয় দর্শনে) আমাকে বলেছিলেন এ কথা। (সহাস্যে) খালি লে-ক-চা-র দেয়।

আবার শ্রীম নির্বাক। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বাবুরা পান চিবুতে চিবুতে হেসে হেসে আফিসে যাচ্ছে নৌকোতে। ঠাকুর দেখে বলতেন — দেখ দেখ, দাসত্ব করতে যাচ্ছে, তাতে কি আনন্দ!

বাবা, মহামায়ার কি কাণ্ড! কোথায় জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা, তা না করে দাসত্ব করতে যাচ্ছে। এতে আবার অত আনন্দ!

অবতারের কথা, সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা আলাদা। ঠাকুরকে দেখেছি, এই একমাত্র পুরুষ যাঁর সর্বদা আনন্দ। নিজেকে জেনেছিলেন কিনা, আনন্দময়ীর সন্তান। একবার যাঁর বোধ হয়, আনন্দময়ীর সন্তান আমি, তিনি সর্বদা আনন্দ করবেন না তো কি?

আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (স্বগত) — কি করে অন্যের দোষ দেখে মানুষ? এই শরীরটাই যে একটা সংসার — সকল দোষের আশ্রয়স্থল। শরীরধারণই মহাদোষ। শরীর ধারণ ক'রে কি দাসত্বের বোঝা বওয়া! শোক দুঃখ, অভাব দারিদ্র্য, অসুখ বিসুখ, এ সবের জ্বালাও রয়েছে আবার।

শরীরটা যে একটা অগ্নিকুণ্ড! মরণের দরজাগুলি — কাম ক্রোধ রিপু — সর্বদা সজাগ হয়ে আছে। গীতায় ভগবান স্পষ্ট করে এ কথা বলেছেন। কোথায় তার হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া, তার চেষ্টা করবে — তা না করে অন্যের criticism (সমালোচনা)! কি বলে — 'মা থেকে করণী, তাকে বলে ডাইনী'।

ঈশ্বরই দেখছেন সবাইকে, সমগ্র জগৎকে। তিনিই সকলকে তাদের নিজ নিজ পথে নিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — বুদ্ধদেব এইটি বুঝেছিলেন — শরীরটা একটা অগ্নিকুণ্ড। ঠাকুরও বলেছিলেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। শরীরটাই সংসার কিনা — macrocosm. বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন অশ্বত্থতলে

বসে — 'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরং', এখানেই নিভে যাক্ এই অগ্নিকুণ্ড।

সাধুরা তপস্যা করে এই জন্য। এইগুলি দমন রাখবে বলে — কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে। এত কষ্ট, এত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে কেন? এই জ্বলন্ত অনল নিভাবার জন্য। তবে ঈশ্বরলাভ হয়।

একবার ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সঙ্গে গিছলেন আমাদের মঠের দু'জন সাধু। একখানে আহারের সব যোগাড় হয়েছে। সকলেই পঙ্গতে বসেছে। মঠের সাধু দু'জনও গেলেন। বৈষ্ণবরা এঁদের দেখে মহা ক্রুদ্ধ। বলছে, পঙ্গতে এ দু'টো কেন? দে, তাড়িয়ে দে। গোঁড়া বৈষ্ণবরা সন্ন্যাসীদের বলে পাষণ্ড। তাই এই রাগ। এঁদের সংস্পর্শে খাদ্য অপবিত্র হবে বলে ভয়। এঁদের দৃষ্টিতে আহার অপবিত্র হয়ে যাবে। ওঁরা তো সরে পড়লেন। তারপর ওদের সকলের আহার শেষ হয়ে গেল। তখন একজন এসে বললো, আপনারা কিছু খান। ওঁরা উত্তর করলেন — না, আমাদের আহারের আজ আর প্রয়োজন নেই। (সহাস্যে) যে তিরস্কার খেয়েছেন, তার উপর আবার আহার?

এই যে অপমান, তা সহ্য করে কেন? তাঁর জন্য, তাঁকে পাবে বলে। তাই বলে, 'মানুষ যারা জ্যান্তে মড়া'।

সুরপতির সঙ্গী — তা হলে শরীরটা রক্ষা করা কেন?

শ্রীম — শরীর রক্ষা না করার কথা তো হচ্ছে না। যে মাটিতে পড়ে লোক, সেই মাটি ধরেই আবার ওঠে। যে শরীরে এত কাণ্ড, সেই শরীর দ্বারাই আবার তাঁকে পাওয়া যায়। তপস্যার দ্বারা ঐগুলি, রিপুগুলি দমন থাকে — কামক্রোধাদি। নইলে মনের বড় বাজে খরচ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়গুলি মনকে টেনে বের করে নিয়ে যায় — 'হরন্তি প্রসভং মন'। তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি ভেতরে ঢোকে। তখন মন ঈশ্বরের দিকে যায়। তপস্যা মানে, মনকে ঈশ্বরমুখীন করা, একাগ্র করা।

বাহ্য কার্যেও মন একাগ্র হয়। যেমন, বৈজ্ঞানিকগণ একটা গবেষণার সময় মনটা তা'তে লাগিয়ে রাখে। অভেদানন্দ স্বামী এডিসনকে দেখতে গিছলেন। তিনি বালব্ আর গ্রামোফোন সৃষ্টি করেছেন। দেখলেন, তিনি ধ্যানমগ্ন। সমস্তটা মন ঐ চিন্তায় মগ্ন। পাশেই টেবিলে খাবার পড়ে আছে, দু'বারের খাবার। হুঁশ নাই।

এ-ও তপস্যা। তবে এতে 'পরাং শান্তিং' মিলবে না। কিন্তু যদি এই তৈরী মন ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেয় তবে সেই মন দ্বারাই তাঁর দর্শন হতে পারে।

ঠাকুরও বিদ্যাসাগরকে এই কথাটাই বলতে গিছলেন। বলেছিলেন, তোমার এই দয়ার কাজই ঈশ্বরের জন্য যদি কর তবে এতেই ঈশ্বরলাভ হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সকলের কি এক জন্মে হয়? কারও দশ জন্ম, কারও বিশ, কারও অনেক জন্ম লাগে। খালি প্রার্থনা করতে হয় ঈশ্বরের কাছে — ভুলিও না মা, ভুলিও না, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না।

অনন্তকালের তুলনায় একশ জন্মই বা কি — অতি সামান্য। তাই প্রার্থনা, সর্বদা প্রার্থনা। এ-বৈ আর উপায় নাই।

শ্রীম (একজনের ভক্তের প্রতি) — শাস্ত্রে তিনি নেই। বেদ বেদান্তে তাঁকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র-টাস্ত্র, এই ভাগবতাদি পাঠ, এ সবই অপরা বিদ্যা। আমরা যে এই সব বলছি, এও অপরা বিদ্যা। বা'র-বাড়ির কথা এ সবই। বাড়িতে বা'র-বাড়ি ভিতর-বাড়ি আছে না? এ সব বা'র-বাড়ি। তবে কেউ কেউ বা'র-বাড়ি দিয়েও ভিতর-বাড়িতে ঢুকতে পারে — বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হলে।

কেউ কেউ একেবারে ভিতর-বাড়িতে থাকে, যেমন ঠাকুর। ভিতর-বাড়ি মানে, সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা।

বেদও অপরা বিদ্যা। তাতে যদি তাঁকে না পাওয়া যায়, তবে দু'পাতা পড়ে এত অহংকার কেন? এতে তাঁকে লাভ হলে আর রক্ষা ছিল না। ঠাকুর কি পড়েছিলেন?

পরা বিদ্যা — 'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' — জ্ঞান ভক্তি। প্রয়োগ জানলে অপরা-বিদ্যাও পরা-বিদ্যা লাভের সহায় হতে পারে। পূজা পাঠ, জপ ধ্যান, এগুলি অপরা বিদ্যার অঙ্গ হলেও নিষ্কামভাবে করলে, ঈশ্বরলাভের জন্য করলে, এর দ্বারাও পরা বিদ্যা লাভ হতে পারে। এ সব ভাল তাঁর জন্য হলে। নইলে আরও দৃঢ়তর বন্ধনের কারণ হয়ে পড়ে।

সাধুসঙ্গও তাই, অপরা বিদ্যার এলাকা — strictly speaking

(বিচারের দৃষ্টিতে), কিন্তু ঈশ্বরলাভ উদ্দেশ্য হলে এগুলি সহায় হয়।

'পড়ার চাইতে শোনা ভাল, শোনার চাইতে দেখা ভাল', ঠাকুর বলতেন। পড়া ও শোনা, এ দুটোই 'শ্রবণ'-এর অন্তর্গত। তারপর 'মনন', deep thinking. তারপর 'নিদিধ্যাসন' — মানে, গভীর ধ্যান, concentrated meditation. তারপর দর্শন, বস্তুলাভ। এ সব পর পর ভাল।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষ তাঁর কাজ বুঝতে চায় এই বুদ্ধি দিয়ে! কি আশ্চর্য! দুঃসাহস মাত্র। তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর! পূজা পাঠ, জপ ধ্যান, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা — এইসব নিষ্কামভাবে করলে এ দিয়ে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দর্শন হয়, তাঁর কৃপায়। নির্মল জলে ছাপ পড়ে, ঠাকুর বলতেন।

দেখ না, একটা অঙ্ক slove (সমাধান) করা কত কষ্ট। আর তাঁর কাজ solve (সমাধান) করা এত সহজ?

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — তুমি অঙ্ক কষ নি? আচ্ছা, বল দেখি, তিনকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

বুদ্ধিরাম — আজ্ঞে না। আমি কিছুই করি নি।

শ্রীম (আহ্লাদে) — বেশ বাবা। এই ঠিক পাত্র! সাদা কাগজ। হিজিবিজি দাগ কাটা থাকলে কি আর তাতে কিছু লেখা যায়? মানুষগুলি তো কেবল এই হিজিবিজি দাগে পূর্ণ।

৯ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৩শে কার্তিক, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী, ২৩ দণ্ড। ২৫ পল।

অষ্টম অধ্যায়

কোনটা শ্রেষ্ঠ 'কালচার' — শুধু পাণ্ডিত্য, কি আত্মজ্ঞান

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কই রে তুই examine (পরীক্ষা) দিলি না? নরেন্দ্র 'ল' পরীক্ষা (বি.এল.) দিচ্ছিল। নরেন্দ্র উত্তর করল, যা শিখেছি তা ভুলতে পারলে বাঁচি। আবার examine (পরীক্ষা)!

সুরপতির অপর সঙ্গী — তা'হলে (না পড়লে) culture (সংস্কৃতি) হবে কি করে? —

শ্রীম (কথা শেষ করিতে না দিয়া) — culture (সংস্কৃতি) হবে তাঁকে চিন্তা করলেই। দু'পাতা পড়লেই কি কেবল culture (সংস্কৃতি) হয়? তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে হয়।

কই, ঠাকুর তো লেখাপড়া প্রায় করেন নি। তাঁর কি রকম করে হল? দেখেছি, কত বড় বড় পড়ালেখা করা লোক তাঁর পায়ের নিচে বসে থাকতো হাত জোড় করে। লাটু মহারাজ কিছু জানতেন না। এখন কত লোক তাঁকে পূজো করছে।

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, do not lean on a broken reed, for such is man : এই দুর্বল মানুষের ওপর নির্ভর কোরো না, নির্ভর কর ঈশ্বরের ওপর।

জগবন্ধু — ক্রাইস্টের পার্ষদরা সব নিরক্ষর ছিলেন — কেউ জেলে, কেউ অন্য রকম।

শ্রীম — হাঁ। সব জেলে মালো হল তাঁর অন্তরঙ্গ। ক্রাইস্ট পিটারকে ডেকে বললেন, come and follow me (চলে এসো আর আমার কথামত চল)। পিটার তখন জাল মেরামত করছিলেন। পিটার উত্তর করলেন, কাজ না করলে অন্নবস্ত্র আসবে কোত্থেকে? ক্রাইস্ট তখন তিরস্কার করে বললেন, ওরে অবিশ্বাসী — oh ye of little faith, তুমি দেখতে

পাচ্ছ না, ঈশ্বর সকলের অন্নবস্ত্র যোগান? পশুপক্ষীদের পর্যন্ত জীবনধারণের আহার ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করছেন!

Behold the fowls of the air; for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth these. Are you not much better than they? (St. Matthew 6:26)

বললেন, অতএব 'these things'-এর (এগুলোর) জন্য ভেবো না, ভোগাসক্ত সংসারী মানুষদের মত। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন এ কথা। তুমি বরং ঈশ্বরচিন্তা কর! For these things the nations of the earth seek after, seek ye rather the Kingdom of Heaven.(St. Matthew 6:33)

ঠাকুরও ভক্তদের বলেছিলেন, 'ওগুনো' অত ভেবো না। 'ওগুনো' মানে, বাড়িঘর, টাকাকড়ি, সংসার, স্ত্রীপুত্রাদি। তুমি তাঁকে ভাব। তিনি দেখবেন। তিনি ভার নেন তুমি যদি শরণাগত হও। ঠাকুর অন্তরঙ্গদের এই কথা বলতেন।

ক্রাইস্ট পিটারকে আরও বললেন, মাছ ধরা ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে চল। তোমরা মানুষ মাছ ধরবে — I will make you fishers of men, মানে জগৎপূজ্য হবে, জগৎগুরু হবে।

এঁদের culture (সংস্কৃতি) হল কি করে?

ক্রাইস্ট নিজে লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে ভণ্ডরা, মানে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ অবাক হয়ে যেতো আর বলত বিস্ময়ে — সূত্রধর জোসেফের এই শিশু পুত্র এই জ্ঞান কি করে লাভ করলো? সে তো কখনও লেখাপড়া করে নি!

ঠাকুরও তাই। তাঁকে অত বড় সায়েন্সের পূজারী ডক্টর মহেন্দ্র সরকার বলতেন, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। জগৎমান্য কেশবও বলতেন, জগতে এঁর মত লোক নেই। এঁকে গ্লাস-কেসে (কাঁচ ঘরে) রাখা উচিত।

মহেন্দ্র সরকারকে ঠাকুর আরও বলেছিলেন — বল দেখি, একি হল? আমি মুখ্যু। তবুও ইংলিশম্যানরা কেন আসে এখানে?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেদে আছে, 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্ ভবতি' (মুণ্ডক ১:১:৩)। শৌনক ঋষি ছিলেন নৈমিষারণ্য গুরুকুলের কুলপতি (Chancellor), দশ হাজার বিদ্যার্থী ছিল সেখানে। তিনি সাংসারিক বিদ্যার শেষ নাই দেখে, আর এসব বিদ্যায় চিত্ত শান্ত হচ্ছে না বুঝে, ঋষি অঙ্গিরসকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ বিদ্যা লাভ করলে সর্ববিদ্যা লাভ হয়? তিনি উত্তর করলেন, পরা বিদ্যা লাভ করলে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানতে পারলে সর্ববিদ্যা লাভ হয়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — কি আছে গীতায় — যং লব্ধ্বা — ভক্ত — যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। (গীতা ৬:২২)

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেদ ও গীতা বলছেন, তাঁকে জানলে সব জানা হলো। আবার আছে (বেদে) 'ঐতদাত্মমিদং সর্বং' (ছান্দোগ্য ৬:১২)। এই সমগ্র জগতের অধিষ্ঠান তিনি। এটা জানলে তখন সরস্বতী কণ্ঠে বাস করেন। ঠাকুর বলেছিলেন, তখন মা জ্ঞানের রাশ ঢেলে দেন।

অত বড় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী! ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ঠাকুরদের নৈনানের বাগানে। কেশব সেনও সেখানে ছিলেন। দেখা হতেই ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ। তখন একজন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) দয়ানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার এই অবস্থা লাভ হয়েছে কি? তিনি উত্তর করলেন, না। শাস্ত্রে যা পড়েছি, সে অবস্থা দেখছি এঁর (ঠাকুরের) লাভ হয়েছে। আর বললেন, 'মেরী পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়'।

অভিমান থাকলে সমাধি হয় না। পাণ্ডিত্যাভিমানই হোক, বা অন্য কোন রকম অভিমান হোক।

শ্রীম (সুরপতির সঙ্গীর প্রতি) — একে culture (সংস্কৃতি) বলছো, এই অভিমানকে, না, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে?

শোন, অতবড় লোক নিজ মুখে বলছেন, পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়। তাই সমাধি হচ্ছে না।

লেখাপড়া করলেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান হতো, তা হলে রক্ষা ছিল না। লেখাপড়া না করে — দেখ, ঠাকুর culture-এর (সংস্কৃতির) highest point-এ (সর্বশ্রেষ্ঠ শিখরে) সমারূঢ়, চব্বিশ ঘন্টা, সারা জীবনভর।

কোন্‌টা culture (সংস্কৃতি) — পাণ্ডিত্য, না আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন?

একজন ভক্ত — আপনার মুখেই শুনেছি, সূক্ষ্ম-শরীরের আহারের দরকার। তা দিয়ে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় — power of judgement and reasoning (যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি) প্রবল হয়। তা দিয়ে ব্রহ্মবিচার চলে।

শ্রীম — হাঁ, তা বটে। শেষে পাণ্ডিত্য ছেড়ে সাধনে লেগে যায়। বই পুস্তক তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিসে বস্তু লাভ হয় তার জন্য ব্যাকুল হয়।

বিদ্যা হল means (উপায়), কিন্তু, end (উদ্দেশ্য) নয় — end (উদ্দেশ্য) ব্রহ্মদর্শন।

কতকগুলি কথা গেলার নাম বিদ্যালাভ নয়। এতে যদি চিত্ত একাগ্র না হয়, তা হলে সবই নিস্ফল।

বিদ্যা ছেড়ে সাধনে লাগা। তারপর হয় বস্তুলাভ। তখন বালকের অবস্থা, যেমন ঠাকুর। বেদে আছে, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা। 'পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'। পাণ্ডিত্য ছেড়ে বালকের মত হয়। মৌন হয়, তখন বস্তু লাভ করে।

ঠাকুর বলতেন — বিদ্যা, বিচারের শেষ — বিশ্বাস — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তারপর সাধন, গুরুর উপদেশ। শেষে বস্তুলাভ ঈশ্বরের কৃপায়।

যার বিশ্বাস হয় না গুরুবাক্যে, তার জন্যই পড়ার ব্যবস্থা। সব ঘেঁটে ঘুঁটে দেখে, ওতে কিছু নাই। তখন গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে। এরা সেকেণ্ড ক্লাস। যার গুরুবাক্যে প্রথমেই বিশ্বাস — সে ফার্স্ট ক্লাস। সব অভিমান ছেড়ে 'দীন' না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

বেদে নারদের গল্প আছে। সর্ববিদ্যা লাভ করেও নারদের শান্তি লাভ হয় নাই। তখন ঋষি সনৎকুমারের উপদেশে সকল অভিমান ছেড়ে দীনভাবে সাধন করে ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন শান্তি।

শ্বেতকেতুর এই অবস্থা। বিদ্যা লাভ করে 'অনুচানবাচী' হন, অর্থাৎ অভিমানী হন। তিনিও পিতা আরুণি ঋষির উপদেশে দীনভাবে সাধন করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তখন শান্তি।

শৌনক এইরূপ। বিদ্যা লাভ করে অশান্ত হন। তিনিও দীনভাবে ঋষি অঙ্গিরসের কাছে শরণাগত হন। তাঁর উপদেশে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন।

তখন শান্ত হন।

কিন্তু সত্যকাম জাবালি প্রথম থেকেই গুরুবাক্য বিশ্বাস ক'রে, গরু চরাতে চরাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিদ্যালাভ এই জন্য করা, এতে 'পরাং শান্তিং' লাভ হয় না, এই কথাটা জানতে। তর্কপ্রধান লোকদের এসব জানা দরকার। তাদের সংশয় যেতে চায় না কিছুতেই। এইটা জেনে, সব বইটই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'মা-মা' বলে কাঁদা।

ঠাকুর কেঁদে কেঁদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এটা সোজা পথ এ যুগের পক্ষে। তাই ঠাকুর এ পথটা নিয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। কলির জীব দুর্বল। মনে বল নাই। অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম। মন চঞ্চল। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা, শরণাগত হয়ে কাঁদ। এতেই কাজ হয়ে যাবে।

তাঁর সব কিছু লোকশিক্ষার জন্য। তিনি নিজমুখে বলেছেন এই কথা।

নির্বিকল্প সমাধি তাঁর লাভ হয়েছিল তিন দিনে। তোতাপুরী তো দেখে অবাক্। বিস্ময়ে বললেন — 'আরে, এ কেয়া রে!' তিনি এই সমাধি লাভ করেন চল্লিশ বছরের একটানা চেষ্টায়। তোতাপুরী শেষে জেনেছিলেন, ঠাকুর অবতার। ঠাকুর আমাদিগকে বলেছিলেন এই কথা।

নির্বিকল্প সমাধিকে ঠাকুর বলতেন জড় সমাধি। তখন এক নাই, দুই নাই, কিছুই নাই। তখন কি হয় ভিতরে তা মুখে বলা যায় না। তবুও যদি কেহ সাহস করে বলতে, তবে এইমাত্র বলা চলে, যে একের সঙ্গে দুই সংযুক্ত নয় সেই এক হয় — 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬:২:১)। মানে relativity (কার্যকারণ সম্বন্ধ) সব completely annihilated (একেবারে তিরোহিত) হয়। একটা absolute existence (অখণ্ড সত্তা) মাত্র বিরাজ করে।

সুরপতি — এ কি রকম?

শ্রীম — এটা জানতে হলে আগে তপস্যা করতে হয়। তারপর জিজ্ঞাসা। বেদে আছে, ছোট ঋষিরা সব গেছেন প্রশ্ন করতে, সমিধ হাতে। বড় ঋষি দেখে বললেন, বাবা, আগে এক বছর তপস্যা করে

এসো, তারপর বলবো। তপস্যা করলে মন একাগ্র হয়। তখন বললে ধরতে পারে। দীন ভাব তখন আসে। দীন না হলে তিনি দর্শন দেন না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেব ন্যায় ও বেদান্তের খুব পণ্ডিত ছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী হেরে গেল তাঁর কাছে। বয়স তখন মাত্র ষোল। এ বয়সেই অত বিদ্যা অর্জন করেন। বেদের ষড়ঙ্গের জ্ঞান ছিল — শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। শেষে এ সবই ছেড়ে কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতে লাগলেন। তাঁর তখন বয়স বিশ। চব্বিশ বছরে সন্ন্যাস নিলেন।

একবার কাশীতে গেলেন। সেখানে সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রকাশানন্দ। এক সভায় চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে meet (দেখা) করলেন। চৈতন্যদেব সেখানে পাপোষের উপর বসে রইলেন, ঐ দূরে। যাঁরা নিয়ে গিছলেন, প্রকাশানন্দ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কই তোমাদের ভক্ত? তাঁরা বললেন, ঐ বসে আছেন। তিনি তখন ডেকে বললেন — এদিকে এসো, এদিকে এসো। চৈতন্যদেব জোড়হাতে বললেন — না প্রভু, এখানে বেশ।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন — আচ্ছা, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে 'সোঽহং' বল না কেন — 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কর কেন? তিনি তখন অতি বিনীতভাবে উত্তর করলেন — প্রভু, আমার গুরু আমায় হীন অধিকারী জেনে ঐ করতে বলে দিয়েছেন। তাঁর দীনভাব দেখে প্রসন্ন হয়ে তিনি বললেন — আচ্ছা, তোমার এতেই হবে।

এরপর অন্য একদিন এক স্থানে কীর্তন হচ্ছিল। চৈতন্যদেব উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করছেন। আর ভাবে একেবারে বিভোর। শেষে সমাধিস্থ, সব স্থির। ঐ দেখে প্রকাশানন্দ একেবারে পায়ে এসে পড়লেন।

পুরীতে, (ওড়িয়া ভক্তদের প্রতি) তোমাদের দেশে, চব্বিশ বছরের ছেলেমানুষ দেখে বাসুদেব সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করলেন, অত অল্প বয়সে তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ কেন? দেখি, তোমার জিভ দেখি। জিভ বের করলে তাতে খানিকটা চিনি রেখে দিলেন। মুহূর্তে সেই চিনি হাওয়ায় উড়ে গেল, যেমন কাগজের ওপর থেকে উড়ে যায়। এই দেখে তখন উনি

বললেন — দেখছি, তোমার ইন্দ্রিয় সংযম হয়েছে।

আর একবারও সার্বভৌম বললেন, তুমি সন্ন্যাসী, বেদান্ত পড়। সন্ন্যাসীদের বেদান্ত পড়তে হয়। উনি বললেন, আচ্ছা প্রভো।

(গদাধরের প্রতি) — ওহে, বল না গোটাকয়েক বেদান্তের — উপনিষদের নাম?

গদাধর অটল মিত্রের সংস্করণের বত্রিশটা উপনিষদের নাম মুখস্থ বলিলেন। শ্রীম তাঁহাকে ঐগুলি মুখস্থ করাইয়াছেন।

শ্রীম — বা বা, ধন্য ধন্য! তুমি কত বেদান্তের নাম কণ্ঠস্থ করেছ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বেদান্ত মানে উপনিষদ্। বেদের অন্ত ভাগে আছে বলে বেদান্ত। বেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে। এই জ্ঞানকাণ্ডের নামই বেদান্ত। তার অপর নাম উপনিষদ্। আবার বেদান্ত মানে বেদান্ত দর্শন, বেদব্যাস বিরচিত — The Philosophy of the Vedanta. উপনিষদে নানাস্থানে অনেক আপাতঃ contradictory (বিরুদ্ধ) কথা আছে বেদব্যাস সেগুলির সমন্বয় করেছেন। সেসব কথা সূত্রে গ্রথিত। তখন ছাপাবার মেসিন ছিল না। কত আর মানুষ মনে রাখতে পারে। তাই ঐ ব্যবস্থা। মুখস্থ করে ফেলতো এই সূত্রগুলি।

শ্রীম (পূর্বানুবৃত্তি করিয়া সকলের প্রতি) — তারপর বেদান্ত দর্শন হচ্ছে। সার্বভৌম ব্যাখ্যাতা, চৈতন্যদেব শ্রোতা। সাত দিন বুঝি শুনলেন। চৈতন্যদেব কিছু বলছেন না — হাঁ, না। কেবল শুনেই যাচ্ছেন। তখন সার্বভৌম বললেন — কি হে, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না বুঝি? উনি উত্তর করলেন — প্রভো, সূত্র যখন পড়ছেন তখন বুঝতে পারছি, ভাষ্য বুঝতে পারছি না। অর্থাৎ, এতে apparently (স্পষ্টভাবে) শঙ্করভাষ্যের criticism (সমালোচনা) করলেন।

শঙ্কর অনেক স্থলে ভক্তিকে twist করে (মুচড়িয়ে) মায়াতে ফেলেছেন। আর ইনি জ্ঞান ভক্তি দুই-ই নিয়েছিলেন।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেবের কিছু কিছু দৈবভাব প্রকাশ পেয়েছিল ছেলেবেলাতেই। রঘুনন্দন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। চৈতন্য অল্প বয়সেই একখানা ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রঘুনন্দনও একখানা গ্রন্থ

লিখেছিলেন ন্যায়ের।

দু'জন একবার গঙ্গার ওপর দিয়ে চলেছেন নৌকোয়। তখন উভয়ের গ্রন্থই মেলালেন। রঘুনন্দন দেখে বললেন, তোমার বই প্রকাশিত হলে আমার বই কেউই ছোঁবে না। এই কথা শুনে চৈতন্য তক্ষুনি নিজের গ্রন্থখানা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, কি হবে এ দিয়ে?

তখনও তিনি গয়ায় যান নি। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখাও হয় নি। তিনি বুঝেছিলেন গ্রন্থ দিয়ে কি হবে? পাণ্ডিত্যে দরকার কি? তাঁর কণ্ঠে যে সরস্বতী বাস করছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি চাহিয়া) — একটু মুখস্থ বল না যাজ্ঞবল্ক্য থেকে।

গদাধর — ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক, যাজ্ঞবল্ক ও মৈত্রেয়ী সংবাদ)।

শ্রীম (সুরপতির প্রতি) — মুখস্থ করতে হয়। এতে তো তাঁরই কথা আছে। আবৃত্তি করলে মনন হয়। নিজের আনন্দ হয়। আর অপরকেও আনন্দ দেওয়া যায়।

ঠাকুরকে যারা ধ্যান চিন্তা করে, তাদের এসব বুঝতে দেরী লাগে না! অনায়াসে বুঝতে পারে। (গদাধরকে দেখাইয়া) ইনি তাঁর চিন্তা করেন কিনা। তাই সহজ হয়ে গেছে।

ডাক্তার — কি রকম ধ্যান করতে হয়?

শ্রীম — তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করা। আর অন্যের সঙ্গে যখন কথা বলতে হয় তখনও তাঁর কথা বলা! শয়নে স্বপনে জাগরণে তাঁর চিন্তা করা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৯ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৩শে কার্তিক, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী, ৩৩ দণ্ড। ২৫ পল।

নবম অধ্যায়
রাসে রসময় শ্রীম

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম দর্জিপাড়া রওনা হইলেন রাস দেখিতে। আজ পূর্ণিমা। কিন্তু রাস উৎসব আগামী কাল। আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। ২৪শে কার্তিক, ১৩৩১ সাল। শ্রীম-র ইচ্ছানুসারে জগবন্ধু, বিনয়, রমেশ ও গদাধর পদব্রজে যাইতেছেন। শ্রীম ঁমদনমোহন দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। সেই সময় পালেদের বাড়ির সম্মুখে ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাসের পুতুল এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয় নাই, রং বাকী।

পরের দিন। আজ রাস। শ্রীম কয়দিন হইতেই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা স্মরণ-মনন করিতেছেন। পাঁচ হাজার বৎসর হইয়া গেল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিনে অনেকগুলি ভক্তকে একসঙ্গে ঈশ্বর দর্শন করাইয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসে ইহা একটি দুর্লভ ঘটনা। কেবল ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসেও দুর্লভ। আত্মদর্শন অতি সুদুর্লভ বস্তু। ইহা স্বয়ং ভগবান করাইতে পারেন, আর কাহারও সাধ্য নাই। যদি কোন মানুষ ঈশ্বর দর্শন করান তবে বুঝতে হইবে, ইনি স্বয়ং ভগবান, নরদেহধারী — 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। (কঠোপনিষদ্ ১:২:২৩)।

যাঁহারা এই দিনে ঈশ্বর দর্শন করিলেন তাঁহারা সকলেই নারী এবং নিরক্ষর, সংস্কারশূন্যা। বেদাদি পাঠে তাঁহাদের অধিকার নাই। একমাত্র ভালবাসার দ্বারা মুনিঋষির অগম্য এই ব্রহ্ম পদবী লাভ করিলেন। বালক কৃষ্ণকে তাঁহারা সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার শরীরে যৌবনের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রজগোপিণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ আমাদের প্রিয় কান্ত। তাঁহারা 'জার' বুদ্ধিতে (উপপতি জ্ঞানে) তাঁহার নিকট উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন — আমি ঈশ্বর, বাক্যমনের অতীত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আমার রূপগুণকে ভালবাসিলে আমাকেই ভালবাসা হইল। আমার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ, যে অঙ্গকেই ভালবাসুক, বস্তুতঃ আমাকেই ভালবাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। গোপিনীগণ তাঁহার রূপকে ভালবাসিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা হইল। তাই ভগবান ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, ভক্তের ইচ্ছানুরূপ।

স্থূল শরীরে যে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-রস উপভোগ করা সম্ভব রাসলীলা তাহারই পরাকাষ্ঠা। রাসলীলা তাহারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। জড়, চেতনের সত্তা লইল রাসে। জড় শরীর-মন আজ সচ্চিদানন্দ চেতনায় সচ্চিদানন্দময়। এখানে স্ত্রীপুরুষ ভেদ কোথায়! এক সচ্চিদানন্দময় সব। শরীর মন বুদ্ধি জীবাত্মা, সব আজ পরমাত্মা। সব চৈতন্যময়। সব ব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণময়, তাঁহাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চৈতন্যময়। গোপীগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ক'রে কৃষ্ণময় রাসে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসাগরে নিমগ্ন। আজ গোপীগণ এক একটি চৈতন্যের পুতুল। তাঁহাদের হস্তপদাদি সর্বাঙ্গ চৈতন্যময়। কৃষ্ণচৈতন্য গোপীচৈতন্য! চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন, আলিঙ্গন। সমাজ-দৃষ্টি, স্বাভাবিক-দৃষ্টি এখানে অন্ধ। জড় ভোগের কথা এখানে ওঠে না। ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের মিলন রাস। আজ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ গোপী, সচ্চিদানন্দ বিশ্বসংসার।

ক্ষুদ্র জীব, তোমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তুমি 'পরপুরুষ' 'পরস্ত্রী' বলিয়া কৃষ্ণ ও গোপীগণকে দেখিতেছ। জন্ম জন্ম দুঃখ কষ্টের আবর্তে পড়িয়া শ্রীভগবানকে আর্ত স্বরে ডাকিতে ডাকিতে যখন তোমার উচ্চ দৈবী ব্রহ্মদৃষ্টি খুলিবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে রাসলীলা কি! তখন বুঝিবে একই প্রেমময় ভগবান রাসে দুইটি বাহ্য রূপ ধারণ করিয়া — 'কৃষ্ণ' ও 'গোপী'রূপে এই প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন।

ভক্ত গোপীর বাসনা, ভগবানকে পতিরূপে লাভ করে। যেমন অন্য ভক্ত কেহ প্রভু, কেহ মিত্র, কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ মাতারূপে লাভ করে। যখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিলেন, তখন তাঁহাদের দেহ মন বুদ্ধি আত্মা কৃষ্ণময় — নরনারী ভেদ বিলুপ্ত। গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহার ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নামটি সার্থক করিলেন।

সম্পূর্ণ মানুষ ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর, মায়াময় ও মায়াতীত, জড় ও চেতন, ইন্দ্রিয়যুক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত, মানুষ ও ভগবান, স্ত্রী ও পুরুষ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা — এইসব বিরুদ্ধ ভাবের মিলনভূমি শ্রীরাসে।

শ্রীম রসরাজের ভাবে ভরপুর কয়দিন। কয়দিন হইতে ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ চলিতেছে। ধ্যানে গোপীকৃষ্ণ, কথায় গোপীকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ অন্বেষণে। কলিকাতায় কোথায় রাসোৎসব, শ্রীম তার সংবাদ লইতেছেন। ভক্তগণকে নানাস্থানে পাঠাইতেছেন।

একটি ভক্ত বলিলেন, চিংড়িহাটায় রাস হয়। সেখান রাসের সময় ভগবানের নানা লীলার অভিনয় হয় মৃন্ময় প্রতিকৃতিতে। আনন্দমেলা, নৃত্যগীতাদি হয়।

এই রাসমেলায় চলিয়াছেন শ্রীম মোটরে। সঙ্গে জগবন্ধু, ডাক্তার ও বিনয়। মোটর চলিয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বেলিয়াঘাটা রোড, ক্যাম্বেল (অধুনা নীলরতন), শিবতলা লেন পার হইয়া মোটর আসিয়া দাঁড়াইল চিংড়িহাটার রাসস্থলীর সম্মুখে।

বৈদ্যুতিক আলোকমালার বন্যা। লোকে লোকারণ্য। আনন্দের হাট বসিয়াছে। আমোদে আহ্লাদে পরিপূর্ণ রাসনগর। রাধাচক্রে বালক বালিকারা সকলে ঘুরিতেছে। নাগরদোলায় বড়রা চড়িয়াছে। নানা রকমের বাঁশির ঝনঝন শব্দে মুখরিত রাসভূমি। দূর হইতে খোলের তাকুটি-তাকুটি শব্দ শোনা যাইতেছে। গানের বিলম্বিত রাগিনী, — 'বাবা, দাদা, মা' ও 'কেশব, মণি, কালু' রবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, 'এক পয়সার পাঁপড় দাও, আর এক পয়সার ডালভাজা, দু' পয়সার পানবিড়ি, এক আনার মিঠাই দাও' — প্রভৃতি রকমারী শব্দরাগ।

শ্রীম রসপূর্ণ। ব্রহ্মরসের এই স্থূল লীলাস্থলীতে আসিয়া শ্রীম বালকের মত আনন্দময়। চোখ মুখ আনন্দের আবিরে রঞ্জিত।

এবার রাসমণ্ডপ। শ্রীম সদর ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন ভক্তসঙ্গে। প্রথমেই দর্শন করিলেন 'দশাবতার' — পৃথক পৃথক বড় রঙ্গিন মৃন্ময় দশটি মূর্তি।

সমগ্র মণ্ডপক্ষেত্র নানা পত্র পুষ্প ও রঙ্গে রঞ্জিত। যেখানে যে-টি শোভা পায় সেখানে সে-টি। আর বিজলীর আলোকের ঝলক — নানা

রঙ্গের — লাল নীল সবুজ আদি। নাটমন্দিরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া শ্রীম আনন্দে নিমগ্ন। বিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন — আহা, এখানে যেন আনন্দের ঢেউ খেলছে। জগবন্ধুবাবু আমাদের কি খোঁজই দিলেন! আজের দিন সার্থক হল। কি সুন্দর সব এঁকেছে, গড়েছে। তাই উনি বলেছিলেন, দর্জিপাড়ার রাসের কথায় — 'উহা যেন pigeon-hole' (পায়রার খোপ)।

শ্রীম — (ডাক্তারের প্রতি) মেয়েদের দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তবুও যদি একটু উদ্দীপন হয়। (সকলের প্রতি) দেখুন, 'বামনটি' কেমন সুন্দর, যেন সত্যিকার লীলা।

শ্রীম এতক্ষণে ঠাকুরবাড়ির অন্তরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

উত্তর দিক হইতে দর্শন করিতেছেন। প্রথম মূর্তি, 'নৌকা বিহার'। তারপর 'দেবীগোষ্ঠ' ও 'কৃষ্ণকালী'। কৃষ্ণ দেখিয়া শ্রীম মুগ্ধ। নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছেন। দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ কৃষ্ণে। একটু পর সহাস্যে বলিলেন — ওরে, এ (রাধার পতি আয়ান ঘোষ) চণ্ডাল।

এবার দেখিতেছেন — 'রাখাল গোষ্ঠ', 'রাই রাজা', 'নবনারী কুঞ্জ'। তারপর 'বস্ত্রহরণ', 'কালীয়দমন', 'অষ্ট সখী', 'বনবিহারে বলরাম ও কৃষ্ণ' দেখিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

এরপর দেখিলেন, 'ননীচুরি, 'গোদোহন', 'কণ্বমুনির আহার চুরি' ও 'নন্দোৎসব'।

এবার 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম' দেখিতেছেন। কোলে শিশু কৃষ্ণ, বসুদেব যমুনা পার হইতেছেন। গাভীরা মুখ তুলিয়া চাহিয়া আছে তাক্ লাগাইয়া। শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন — দেখ, কেমন সুন্দর। গাভীগুলি যেন সত্যিকার গাভী। আর এটি দেখ, কেমন কণ্বমুনি। আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা বাড়ির কেহ বসে আছে। যমুনার তীরে একটি শৃগাল হলে বেশ হতো। এখানে দেখ, কি আনন্দ গোপ-গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মে। অজ্ঞাতভাবে সকলে আনন্দিত।

বাড়ির ভিতর উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া শ্রীম বলিতেছেন, কি সুন্দর, কি চমৎকার ভাব! কত টাকা ব্যয় করেছে। এ সব জিনিস মনে মনে imagine (কল্পনা) করা এক, আর দেখা এক। অনেক তফাৎ।

দেখাতে একশ গুণ বেশী উদ্দীপন হয়। একেবারে মনে গেঁধে যায়।

শ্রীম চলিতেছেন। 'কৃষ্ণকালী'র সম্মুখে আসিয়া আবার দাঁড়াইলেন। বলিলেন, দশ টাকার টিকিট করলেও মানুষ এমন জিনিস দেখতে পায় না।

২

রাসস্থলী সুপ্রশস্ত স্থান। মধ্যস্থলে সঙ্গীতের আসর, শামিয়ানার নিচে। পূর্বদিকে নানা মূর্তি। পশ্চিমে পাকা বাড়ি। দক্ষিণে উৎসবের রন্ধন ও আহারের স্থান। উত্তরে কোণে রাসমঞ্চ।

শ্রীম এবার আসরের পূর্ব দিকের সব মূর্তি দর্শন করিতেছেন। 'লক্ষহীরা' দেখিয়া 'গৌর জন্ম'-স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবদ্বীপে ভগবান অবতীর্ণ। তাহাতে শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এ দৃশ্যটি শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, শ্রীমকে গৌর-পার্ষদরূপে চৈতন্যসংকীর্তনে। ইহা দেখিয়া বুঝি বা শ্রীম-র পূর্ব স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। তাই আনন্দে বলিতেছেন — দেখুন দেখুন, কি নৃত্য, কি আনন্দ বৈষ্ণবদের। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

'দাতাকর্ণ'। কর্ণের অতিথি-সৎকার। কর্ণ করাত দিয়া পুত্রকে ছেদন করিতেছেন। শ্রীম এই চিত্রটি দেখিয়া খুব আর্ত স্বরে বলিলেন, তবে লোক বলবে, হাঁ ইনি বড় দানী — কি নিষ্ঠুর কাজ!

'সাবিত্রী-সত্যবানে'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শ্রীম। সাবিত্রীর সিঁথিতে সিন্দুরের রাশি। ইহা দেখিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঃ এ সিঁদুর কে দিলো? অন্তেবাসী বলিলেন, মেয়েরা। এঁরা বাড়ি থেকে সিঁদুর এনে সাবিত্রীর সিঁথিতে দিয়েছেন।

এখন দর্শন করিতেছেন, 'শৈব্যা-হরিশচন্দ্র'। শ্রীম বলিলেন, হরিশ্চন্দ্রের মলিন বসন দিলে বেশ হতো, শৈব্যারও। 'ধ্রুবের তপস্যা' দেখিয়া 'সপ্তরথী'র কাছে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীম ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, কি আশ্চর্য সংসার! দ্রোণও রয়েছেন এখানে। একজন ভক্ত বললেন, ভীষ্মও যে রয়েছেন এতে। শ্রীম উত্তর করিলেন, না। তা হলে এ অন্যায় হতে পারে?

শ্রীম এতক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইলেন 'ভীষ্মের শরশয্যা'র নিকট। মাতা

গঙ্গা পুত্রের শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম নিবিষ্ট মনে গঙ্গা মাতাকে দর্শন করিতেছেন। এরপর 'শীতলা দেবী'। পৌরাণিক দৃশ্যাদি এইখানেই শেষ হইল।

এর পরও আছে আর একটি দৃশ্য। এটি সামাজিক আর আধুনিক। বৃদ্ধ পিতামাতা দর্পিত পশুভাবাপন্ন পুত্রের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

উহা দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, এইটি মায়া। মায়া illusion (ভ্রমাত্মক বস্তু) নয়। It is a matter of fact (ইহা একটি বাস্তব ঘটনা)। এতো অপমান, তবুও স্নেহবদ্ধ জীব। স্নেহই মায়া।

ওয়েস্টের পণ্ডিতেরা মায়াকে একটি অবাস্তব সত্য বলে থাকেন। কিন্তু ঋষিগণের মতে, ইহা একটি সত্তা। ভগবানের অঘটন-ঘটন পটিয়সী শক্তি! এই শক্তির প্রভাবে সত্য, অসত্য বলে বোধ হয়। আর অসত্য, সত্য বলে দেখায়। ঠাকুর তাই সর্বদা প্রার্থনা করতেন, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না মা। এর হাত থেকে নিস্তারের এই এক শরণাগতি।

সঙ্গীতের আসর। এখানে কীর্তন হইতেছে — কৃষ্ণলীলা। কীর্তনীয়া দক্ষিণ মুখী হইয়া গান গাহিতেছেন। শ্রীম দক্ষিণ দিক হইতে ঝাঁকি দর্শন করিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে রাসমঞ্চে আরোহণ করিলেন। ইহা বেশ উচ্চ একটি বেদিকা, দোলমঞ্চের মত। এখানে রসরাজ কৃষ্ণ প্রেয়সী গোপীগণের প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ। শ্রীম ডাক্তার বক্সীকে বলিলেন — দিন দিন, পয়সা দিয়ে প্রণাম করুন। চরণামৃত লইয়া নিচে নামিতেছেন। পাশেই একটি সমাধিস্থান দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন, উহা এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতার সমাধি।

শ্রীম নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন। এইবার কীর্তনীয়াদের সাজ ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি দিলেন। এখন কীর্তন শুনিতেছেন। তিনি আসরের পশ্চিম দিকে পাকাবাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন। ঠিক মধ্যস্থলে। গায়ক বেলেঘাটার চুনাপট্টির 'অধিকারী'। দুইটি খোল বাজিতেছে। চারজন দোহার। একটি বালকও দলে আছে। কীর্তনীয়া কত অঙ্গভঙ্গীতে গাহিতেছেন 'রাসলীলা' পালা।

যমুনা-পুলিন। রাসস্থলী। কার্তিক-পূর্ণিমা। অতি উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত। মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত। ভগবানের এই দিব্যলীলার জন্য প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ ও মনোরম রূপ ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কান্তভাবে গোপীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন শুভক্ষণে। আজ সেই শুভক্ষণ।

দিব্য প্রেমরসে কিশোর কৃষ্ণ আজ ভরপুর। তিনি বাঁশি বাজাইতেছেন। গোপীগণ ঐ রব শুনিয়া পাগলিনী। গৃহ-স্বজন ছাড়িয়া চলিল। পতি পুত্রকন্যা পিতামাতা ভ্রাতা কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। কেন? না, এখানে মায়া হীনবল। কৃষ্ণ-প্রেয়সী মায়াতীত। কেন? কৃষ্ণময় যে। কে এই কৃষ্ণ? ব্রহ্ম সনাতন বুঝি?

গায়ক গাহিতেছে —

মায়ার বন্ধন ছাড়িল।
যোগীগণের অসাধ্য সাধন গোপীগণ পাইল॥
তারা প্রেমময়ের প্রেমরসে সিঞ্চিত হইল।
গোপীগণ মায়ার বন্ধন ছাড়িল॥

ব্যাকুল ভক্তের নিকট কৃষ্ণ, পরমাত্মা বাঁধা। তাই মোহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় তাহাদের। গোপীগণের কর্ণে বাঁশির রব পৌঁছিয়াছে। আর পৌঁছিয়াছে গাভীগণের কর্ণে। কিন্তু সংসারাসক্ত জীবগণ উহা শুনিতে পাইল না। তাহারা আজ বধির। স্নেহান্ধ যে, তাই!

কেবল কৃষ্ণপ্রেমে গোপীগণ জীবন্মুক্ত। কৃষ্ণকে মনপ্রাণে ভালবাসিয়া গোপীগণ জগৎপূজ্যা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন রাসলীলা।

কীর্তন-চলিতে লাগিল। শ্রীম কীর্তনীয়ার হাতে একটি সিকি দিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি পুনরায় আহারের স্থান দর্শন করিতে গেলেন।

দ্বারে দারোয়ান দাঁড়াইয়া আছে, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। বহু লোকের আহারের আয়োজন হইতেছে। দুইজন কুলী মাটির গ্লাসের বোঝা লইয়া শ্রীম-র পাশ দিয়া রন্ধনস্থলীতে প্রবেশ করিল।

শ্রীম মেলাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন। নানা রঙ্গরস উপভোগ করিতেছেন। সামনে একটি সার্কাস। একটি নৃমুণ্ড নানা রঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ইহা একটা ব্যাটারীতে সংযুক্ত। শ্রীম পুতুলপংক্তি দিয়া চলিতেছেন। দুই দিকে

দোকান। বিভিন্ন দেবদেবীর পুতুল রহিয়াছে। শ্রীম এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে চলিতেছেন।

এবার মিষ্টান্নের বাজারে প্রবেশ করিলেন। বালসুলভ চপলতা, কৌতূহলে শ্রীম এক একটা দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেছেন ঠেলিয়া ঠুলিয়া। আর সমুখঠেলা বৃহৎ নয়নযুগলে আনন্দ ধরে না। যেন খাইবার জন্য উৎসুক। এখানে বালকবালিকার খুব ভীড় লাগিয়াছে। শ্রীম তাহাদের একজন। মা বাপকে যেমন ছেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলে, দেখ কত মিষ্টি, তেমনি শ্রীম আনন্দে ভরপুর হইয়া ভক্তদের বলিতেছেন, দেখ দেখ কত রকমের, কত রং-এর মিষ্টি।

নাগরদোলা দেখিয়া অন্তেবাসী বলিলেন, এই রাধাচক্র। শ্রীম শুনিয়া আনন্দে বলিলেন — বা, বেশ নামটি তো ইনি দিয়েছেন। আমরা বলি নাগরদোলা। কতজনে কত নামে বলে। 'রাধাচক্র' নামটি তো বেশ। কিন্তু বস্তু এক।

এখন পুতুলনাচ দেখিতেছেন। পুতুলগুলি ঝগড়া করিতেছে, আবার প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। আবার আনন্দে নৃত্য করিতেছে। নাচাইতেছে একটি লোক বাঁশির তালে তালে।

শ্রীম গম্ভীরভাবে বলিলেন, এই দেখ পুতুলনাচ। আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা। ঈশ্বর সূত্র ধরে নাচাচ্ছেন। আমরা মনে করি, আমরা নাচছি। তাই অত কষ্ট। যদি বুঝতে পারে বাজীকর তিনি, তবে আনন্দ শাশ্বত। নইলে আজ আনন্দ, কাল নিরানন্দ। বিষয়ানন্দ ক্ষণস্থায়ী। বাজীকরকে জানতে পারলে আর নাচতে হয় না। তখন সদানন্দ।

শ্রীম-র ভিতর একটা আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। তাই সর্বত্র সর্ববস্তুতে আনন্দময়কে দর্শন করিতেছেন। যাঁহাদের ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছে গুরু কৃপায়, তাঁহারাই বিষয়ানন্দেও আনন্দিত। আনন্দ-স্বরূপকে সর্বত্র দর্শন করেন।

এখন শ্রীম রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে মোটর। রাসস্থলী পশ্চাতে।

মর্টন স্কুল। রাত্রি আটটা। শ্রীম দ্বিতলের ঘরে বসিয়া আছেন। সামনে কতকগুলি ভক্ত। ছোট জিতেনকে পাঠাইয়াছিলেন দর্জিপাড়ার রাসে।

তিনি মদনমোহন দর্শন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ওদিককার দুই স্থানের রাসের বিবরণ লইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, আগামী কাল গিয়ে চিংড়িহাটায় রাস দর্শন করে আসবেন। বড় সুন্দর। সারাজীবন কলকাতায় রইলুম, কিন্তু আজ মাত্র এই আনন্দোৎসবের দর্শন হল। জানতামও না। কেউ বলেও নাই। অত কাছে ভগবান। তার খবর নাই। এও ঠিক তেমনি।

ভক্তগণ শ্রীম-র আদেশে ভাগবত পাঠ শুনিতেছেন, রাসপঞ্চাধ্যায়। শ্রীম আহার করিতে উপরে তিনতলায় গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া শেষ অধ্যায়টি পুনরায় পাঠ করিতে বলিলেন। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে আর উহা পাঠ হইল না। চিংড়িহাটার রাসের কথাই হইতে লাগিল।

একজন ভক্ত বলিলেন, যাদের রাস তারা খুব নিম্ন জাতি। শ্রীম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন — কি, যাদের এত ভক্তি, তারা যে ব্রাহ্মণ! কত বড় ভক্তের হৃদয় থেকে এই আনন্দলীলাটি বের হয়েছে। বললেই হলো? ঠাকুর বলতেন, যাদের অত ভক্তি তারা যে ব্রাহ্মণ!

১১ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৫শে কার্তিক, ১৩৩১ সাল।
মঙ্গলবার, রাসপূর্ণিমা, ২৭।৫৩ পল।

দশম অধ্যায়

আজের দিনটা সফল হ'ল

১

মর্টন স্কুল। সকাল আটটা। চারতলার কক্ষ। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। দক্ষিণদিকের বেঞ্চেতে বসা স্টুডেন্টস্ হোমের অমর ও একটি সঙ্গী। এই বেঞ্চেতে ছোট জিতেন ও বিনয় বসা। অন্তেবাসী একটু পর আসিলেন। তিনি টেবিলে হাত রাখিয়া পূর্বাস্য দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর আসিল গদাধর। বুদ্ধিরাম ছাদে বসা। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — মাঝে মাঝে গয়লাকে বলবে, কচি বাছুরের দুধও দিয়ো না, আর ছাড়ন্ত বাছুরেরও না। মাঝে মাঝে বললে তার হুঁশ থাকবে।

ঠাকুর বলেছিলেন, যা শালা এক্ষুনি যা। ফেরৎ দিয়ে আয়। যোগেন সাতটা পান এনেছিল এক পয়সায়। এগারটা পাওয়া যায় এক পয়সায়। বললেন, যদি তোর বেশী হয়, পাড়ায় বিলোবি। তবুও ঠকবি না।

বাবুরা বাজারে যায়। বলে, কত করে এটা? দোকানদার হয়তো বললো এতো। অমনি বলে, আচ্ছা দাও। যাচাই করবে না।

ঠাকুর এই যে বললেন, এর value (দাম) নাই? মানে, যে এতে ঠকে যাবে, সে কামক্রোধের আক্রমণের সময় আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

আজ ১২ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৬শে কার্তিক বুধবার।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অমরের প্রতি) — সত্যকে ধরে থাকলে, তার আর ভয় নাই। তার বার আনা হয়ে গেল।

আহা, আজ সেই memorable night (স্মরণীয় রাত) মনে পড়ছে। একসঙ্গে গাড়িতে আসছি। শোভাবাজারের মোড়ে ঠাকুর বললেন, দেখ, যদি সত্য ধরে থাক, তাঁকে পাবে। কি কথা!

যদু মল্লিক চণ্ডীর গান দিবে বলেছিল। দেয় নাই দেখে ঠাকুর বললেন, কই তুমি গান দিলে না?

আর একদিন বলেছিলেন, কেমন তোমার বিদ্যাসাগর? আসবে বলে এলো না। ঠাকুরকে কথা দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। কিন্তু যান নাই।

ঠাকুর বলতেন, মরদকা বাত হাতীকা দাঁত। হাতীর দাঁত যেমন একবার বের হলে আর —

(গদাধরের প্রতি) — কি হয়?

গদাধর — আর ভিতরে যায় না।

শ্রীম (সঙ্গে সঙ্গে) — আর ভিতরে যায় না। তেমনি যা মুখ থেকে বের হয়ে গেছে তা পালন করা উচিত।

শ্রীম (নরহরির প্রতি) — তোমাদের দেশের লোকেদের, শুনতে পাই, কথার ঠিক নাই। আর ঐ কুলুপ দেওয়ার মত কাজ কর তোমরা আধা খেচড়া। তোমার সব কাজই ঐ রকম।

অমর জিলিপি আনিয়াছিল। বুদ্ধিরামের হাতে দেয়। বুদ্ধিরাম ছাদে বেঞ্চের উপর রাখিয়া দেয়। তখন বুদ্ধিরাম ও গদাধর ছাদে উপবিষ্ট ছিল। অন্তেবাসী টিনের ঘরে। বুদ্ধিরাম শ্রীম-র ঘরে আসিয়া অমরকে জিলিপির কথা বলে, অমর ছাদে গিয়া উহা লইয়া আসিল। বুদ্ধিরাম ছাদে গমনোন্মুখ।

শ্রীম (অমরের প্রতি) — রেখে দিন। ঠাকুরকে দিতে হবে।

অন্তেবাসী — ঠাকুরসেবা চলবে না ওতে।

শ্রীম — কেন?

অন্তেবাসী — কাকে ঠুকরিয়েছে। আর বেঞ্চের উপর রেখেছে।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — তুমি ঘরে রাখলে পারতে।

বুদ্ধিরাম (গদাধরকে দেখাইয়া) — উনি ছিলেন তাই রেখেছিলাম।

গদাধর — কই আমাকে তো বলে নি।

এই জিলিপি পরের দিন পাখীদের সেবায় উৎসর্গ হইল। শ্রীম দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন।

অপরাহ্ণ একটা। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, টালীগঞ্জে রাস হয়। একবার দেখে এলে হয়। আপনারা আগে দেখে এসে রিপোর্ট দিলে,

একবার দেখে এলেও হয়।

জগবন্ধু তখনই রওনা হইলেন টালিগঞ্জ, সঙ্গে গেলেন ছোট জিতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন রাত্রি দশটায়। ফেরার পথে কেওড়াতলা শ্মশান, মা-কালী ও গদাধর-আশ্রম দর্শন করেন। খুব ক্লান্ত থাকায় নিচের তলায় বিনয় ও গদাধরের সঙ্গে বসিয়া রাসের কথা বলিতেছেন। নিচের কথাবার্তা শুনিয়া শ্রীম বেয়ারা জীবকে দিয়া তাঁহাদিগকে উপরে ডাকাইলেন। শ্রীম তাঁহাদের রিপোর্টের জন্য বসিয়া আছেন।

শ্রীম — কি দেখলেন?

জগবন্ধু — ভাল নয়। বেলিয়াঘাটার রাসের কাছে ও কিছু নয়। সিন্‌ও বেশী নাই। আবার লোকের অসম্ভব ভীড়। নড়া চড়া যায় না। ঠেলাঠেলি। আপনি গেলে choked (দম বন্ধ) হয়ে যাবেন।

শ্রীম — না, তা হলে আর যাওয়া হবে না। অত ভীড় সইবে না। আপনারা একবার দেখে আসুন না মল্লিকদের বাড়ির রাস। ভক্তরা গোষ্ঠ মল্লিকের বাড়িতে রওনা হইলেন রাস দেখিতে। রাত্রি প্রায় এগারটা।

পরের দিন বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা ছয়টায় শ্রীম ডাক্তার বক্সীর মোটরে চিংড়িহাটায় রওনা হইলেন রাস দর্শনে। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার, গদাধর ও স্বামী সদ্ভাবানন্দ। অন্তেবাসী বলিলেন, আমরাও পরে যাব ভক্তদের নিয়ে। শ্রীম বলিলেন, বেশ তো, যাবেন।

সন্ধ্যা সাতটা। মর্টনের ছাদে অনেকগুলি ভক্ত শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন — ছোট জিতেন, বিনয়, নলিনী, শান্তি, রমেশ, জগবন্ধু, প্রভৃতি। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন ভক্ত দুর্গাপদ মিত্র আসিয়াছেন। ইনি বিদ্বান বুদ্ধিমান ও শ্রীম-র উপর অতিশয় শ্রদ্ধাবান। কথায় কথায় বিচার চলিল — গৃহস্থাশ্রম বনাম সন্ন্যাস-আশ্রম — কোন্‌টা বড়। ভক্তগণ অনেকে যোগদান করিতেছেন। শেষ অবধি এক পক্ষে দুর্গাপদ, অপর পক্ষে জগবন্ধু দাঁড়াইলেন। তুমুল তর্কযুদ্ধ, দমিবার নয় কেহ। যুক্তি, শাস্ত্র, আপ্তবাক্য — সব অস্ত্রই উপস্থিত। কোন পক্ষই রণে ভঙ্গ দিবার নয়। অনেক বাদানুবাদের পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সর্ত — each is great in its own place — আপন আপন স্থলে উভয়েই মহৎ। 'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ' (গীতা ৫:২)।

অন্তেবাসী, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন, প্রভৃতি বেলেঘাটায় শুকলালের গৃহে উপস্থিত। শুকলাল অতি আদরে ভক্তগণকে প্রচুর আহার পরিবেশন করিলেন। তারপর ভক্তগণ নিকটস্থ চিংড়িহাটার রাস দর্শন করিতে চলিলেন। রাসস্থলী আজও রসপূর্ণ আনন্দের হাট। মর্টন স্কুলে ফিরিলেন রাত্রি বারটায়।

পরের দিন। রাত্রি সাতটা। শ্রীম দ্বিতলের ঘরে বসিয়া আছেন মাদুরের উপর কম্বলাসনে পূর্বাস্য। তিন দিকে ভক্তগণ উপবিষ্ট — শুকলাল, বড় অমূল্য, বড় জিতেন, ডাক্তার, ছোট জিতেন, বিনয়, বলাই, বড় নলিনী, গদাধর, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি। আজকাল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা চলিতেছে। আর ভক্তসভায় শুধু রাসের কথাই চলিতেছে। চিংড়িহাটার রাসের কথা হইতেছে। শুকলাল এই রাসের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মার কথা কহিতেছেন।

শুকলাল — যিনি এই রাসমেলার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর নাম ছিল আনন্দ জানা। জাতিতে নমঃশূদ্র। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে মাছের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ঐ অর্থে এই বিরাট ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি ভেক গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হন। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। চৌদ্দ বছর সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন।

শ্রীম (অতি আনন্দের সঙ্গে) — আমি তাই ভাবছিলাম, কোন মহাত্মার তপস্যার ওপর এই আনন্দোৎসব স্থাপিত! পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে, তেমনি এই মহাত্মার দৈবী ঐশ্বর্য তাঁর পুত্রগণ লাভ করেছেন। ধন্য তাঁরা পিতার এই দুর্লভ ঐশ্বর্য লাভ করে! যাঁদের এমন ভক্তি ও ত্যাগ, তাঁরা যে ব্রাহ্মণ! সমাজ তাঁদের যা-ই বলুক তাঁরা সদ্বংশ। ঈশ্বর তাঁদের কাছে বাঁধা ভক্তিতে। ঠাকুর, যিনি অবতার হয়ে এসেছিলেন, এ তাঁর কথা। সমাজ যাই বলুক আমরা শুনবো অবতারের কথা।

পরের দিন শনিবার। সকাল সাতটা। জগবন্ধু, ছোট জিতেন ও বিনয় দ্বিতলের ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এই ঘরেই থাকেন। ভৃত্য জীব কতকগুলি কথামৃতের প্রুফ লইয়া আসিয়া জগবন্ধুর হাতে দিয়া বলিল, বড়া বাবুজী নে ভেজা দেখনেকে লিয়ে। জগবন্ধু ছোট জিতেনের সহায়তায় প্রুফ দেখিয়া উহা শ্রীম-র কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

নয়টার সময় শ্রীম দ্বিতলে নামিলেন। বারান্দায় বসিয়া আছেন

বেঞ্চেতে সিঁড়ির সামনে। শ্রীম-র বাম হাতে ছোট জিতেন ও বিনয় একই বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। জগবন্ধু সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে প্রুফ দেখাইয়া শ্রীম বলিতেছেন — এই দেখুন, এখানে wrong font (ভিন্নশ্রেণীর অক্ষরটা) কাটেন নাই। এসব কেন দেখাচ্ছি? Future guidance-এর (ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার) জন্য।

জগবন্ধু (স্বগত) — একটি স্থানে মাত্র একটি অক্ষর ভাঙ্গা। তা-ও এঁর দৃষ্টিতে পড়েছে। কি powerful brain (কি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা), আর কি সুতীক্ষ্ণ একাগ্রতা, এই বৃদ্ধ বয়সেও! আমাকেও এই ক্ষুদ্র ভুলটি দেখান হচ্ছে আমারই কল্যাণের জন্য, যাতে সব বিষয়ে accurate (নির্ভুল) হতে পারি। পাছে আমার মনে কষ্ট হয় ভুল দেখানোর জন্য, তাই আবার সঙ্গে সঙ্গে explanation (কৈফিয়ৎ) দিচ্ছেন।

মানুষ নিজের ভুল দেখতে পায় না। অন্যে দেখালেও শুনতে চায় না। ভুলও করবে আবার অভিমানও করবে। এই precarious situation (ভয়ঙ্কর অবস্থা) থেকে বাঁচাবার জন্য শ্রীম-র কত চেষ্টা, কত ভাবনা! গরজ যেন তাঁর। লাভ আমার। কষ্ট পরিশ্রম দয়া তাঁর। তাই বিনম্র মধুর ভাব। পাকা আচার্য। আত্মদ্রষ্টা পুরুষ। তিনি আমাদের সব দুর্বলতা জানেন। তাই অহেতুক করুণায় নিজে নীচু হন ভক্তদের কাছে — যেমন বাপ মা হয় অবোধ সন্তানের কাছে।

শ্রীম এখন চারতলার ছাদে আসিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। উজ্জ্বল মধুর সূর্যকিরণ দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতেছেন। বলিতেছেন — বা, কি সুন্দর রোদ উঠেছে। তিনি সূর্যকে পাঠিয়ে দেওয়ায় জগৎ যেন হাসছে।

একটি ভক্ত শ্রীম-র বিছানা রৌদ্রে দিলেন।

অপরাহ্ন দুইটা। বিনয় ও তাঁহার দাদা ডাক্তার বক্সী, মোটর লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম যাইবেন কাশীপুর রাস দেখিতে। আর তাঁহার ধর্মপত্নী গিন্নীমা যাইবেন ডাক্তারের কাশীপুরের বাসায়।

শ্রীম দ্বিতলে আসিয়াছেন। স্কুল ছুটি হইয়া গিয়াছে। একটি যুবক শিক্ষককে বলিলেন, আপনাদের জল কোথায় থাকে? ভক্ত উপর হইতে এক মগ জল লইয়া আসিলেন। তাহা দিয়া শ্রীম মুখ হাত ধুইতেছেন।

জলের দরকার, জল নিয়ে এসো — একথা বলিলে ভক্ত কৃতার্থ

হন। শ্রীম এরূপ বলিবেন না। ইহা যে অভিমানের ভাষা তাঁহার মতে। তিনি প্রয়োগ করিলেন প্রচ্ছন্ন আবেদনের ভাষা — সেবকের ভাষা — সেব্যের নয়।

ভাষাও বদল হইয়া যায় আত্মদর্শনে। তাই বুঝি অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' (গীতা ২:৫৪) — ইঁহাদের সর্বপ্রকার ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে নিজের সঙ্গে compare (তুলনা) করা চলে।

একটু পর শ্রীম দ্বিতলে উত্তর-পশ্চিম দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। নিচে মর্টন স্কুলের অঙ্গনে একটি মুরগী চরিতেছে। সঙ্গে দুইটি বাচ্চা। শ্রীম এক দৃষ্টিতে উহা দেখিতেছেন। শ্রীম-র পাশে একটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে শ্রীম বলিতেছেন — এই দেখুন, এই হচ্ছে। (আহার শয়ন মৈথুন ভয়)। জৈব ধর্ম এই-ই। তবুও কি লোকের চৈতন্য হচ্ছে?

সন্ধ্যা। দ্বিতলের বৈঠক। শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন ভক্তসঙ্গে। ভক্তসঙ্গে দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বড় নলিনী, বিনয়, রমণী, অমৃত, বলাই, ছোট নলিনী, মনোরঞ্জন, গদাধর, বুদ্ধিরাম, শান্তি, ফকির, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়া ধ্যানে যোগদান করিতেছেন।

আটটা। শ্রীম দেবী-ভাগবত পাঠ করিতে বসিলেন। রমণী পাঠ করিতেছেন। আজ শ্রীম খুব ক্লান্ত। ক্লান্তি দূর করার জন্যই এই ধ্যান। ভক্তরা সর্বদাই ইহা দর্শন করেন। আবার কখনও দেখা যায় ক্লান্তি দূর করার জন্য ঈশ্বরীয় কথার যেন বান ডাকিয়াছে। অনর্গল কথা। ভগবৎ গুণকীর্তনে দেহ বুদ্ধি নিম্ন-মন ছাড়িয়া ঊর্ধ্বে ভগবতানন্দে নিমগ্ন। সচরাচর দৈহিক ক্লান্তির পর শ্রীম শাস্ত্র পাঠ করিতে বলেন, অথবা গান গাহিতে বলেন। তাই আজ দেবী ভাগবত পাঠ হইতেছে। পাঠের শেষে রমণী গাহিলেন —

রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে
মজরে মন মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয় কেতকী।
থেকো না থেকো না তাহে বিভোর॥ ইত্যাদি

২

মর্টন স্কুলের দ্বিতল। সকাল সাতটা। শীতের আমেজ পড়িয়াছে। শ্রীম বারান্দায় বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। গায়ে সাদা সোয়েটার। ছোট জিতেন, বিনয় ও জগবন্ধু শ্রীম-র কাছে বসিয়া আছেন। এ-কথা সে-কথা হইতেছে। তিনি ভক্তদের বলিলেন, তা হলে আপনারা উঠুন। বেলা হয়ে গেছে। মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে আসুন। আমরা রাত্রে সব শুনবো। মানুষ আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। ভক্তদের আত্মীয়-কুটুম্ব ঠাকুর। আর তাঁর নামে যারা সর্বস্ব ছেড়ে দিবানিশি তাঁকে ডাকছে তারা। তারা whole-time men (জীবনব্রতী ভক্ত)। তাঁদের দর্শন করতে হয়। তবে ধাত ঠিক থাকে। নইলে আদর্শ ভুলে যায় মানুষ। মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। মানে, নিজেকে জানা। মঠে যারা থাকে তাদের এই উদ্দেশ্য। তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা উচিত।

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর। শ্রীম ভক্তদের মাঝে মাঝে এইরূপ করাইয়া লন। সারাদিন তাঁহার দর্শন (ঈশ্বরদর্শন) ও ঈশ্বরচিন্তায় কাটান। ইহাকে তিনি বলেন practical (ব্যবহারিক) বেদান্ত। ঠাকুর বলতেন, বুকে হাঁটু দিয়ে ঔষধ খাওয়ান। ঠাকুরের ভাষায় ইহা উত্তম বৈদ্যের কাজ।

ভক্তগণ বেলুড় মঠে তিন ঘন্টা ধ্যান ভজন দর্শনাদিতে অতিবাহিত করিয়াছেন। কেহ ঠাকুরমন্দিরে, কেহ মায়ের মন্দিরে, বসিয়া ধ্যান করিয়াছেন। তারপর, বেলা বারটায় স্টীমারে দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। মায়ের ভোগারতি হইতেছে। উহা দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়াছেন। তখন রামলালদাদার পুত্র, মা-কালীর পূজারী, ভক্তদের জন্য এক পাতা কালীমাতার প্রসাদ দিলেন। বেলা তিনটার সময় বিনয় কোনও কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ছোট জিতেন ও জগবন্ধু পুরাতন বটবৃক্ষ-বেদিকায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর তাঁহারা চৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস লইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহার নবীন রূপ দেখিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবসন পরিধান আর মুখে সদা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম। তাঁহার ত্যাগীর বেশ, জনগণকে

নির্বাক উপদেশ দিতেছে। ভগবান লাভের জন্য সংসারের সকল বিষয়সুখ ছাড়িলে তবে ব্রহ্মানন্দ লাভ। যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিবে তাহাদেরও আদর্শ, এই ভগবান দর্শন করা। তাহারা নামেমাত্র গৃহস্থ, কিন্তু অন্তরে সন্ন্যাস। সর্বকর্ম তাহারা করে নিষ্কাম বুদ্ধিতে, শ্রীভগবানে ফল সমর্পণ করিয়া। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, বড়ঘরের দাসীর মত সংসারে থাক। দাসীর কর্মে অধিকার, কিন্তু ফলে নয়। গৃহিণী যাহা দিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

বেলা ছয়টার সময় ভক্ত দুর্গাপদ মিত্র আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে, ভক্তদের সর্বত্যাগ ও গৃহে থাকিয়া দাসীর মত থাকা, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল।

দুর্গাপদ — যদি ঈশ্বরলাভ উদ্দেশ্য হয় তবে অন্য সব কাজ ছেড়ে — সর্বস্ব ছেড়ে, ঐ আদর্শ লাভের চেষ্টা করাই তো উচিত। কিন্তু মানুষ তা পারে না সকলে। বোঝে, কিন্তু পারে না। কেউ কেউ পারে। সংখ্যায় অতি অল্প। কেন এরূপ?

একজন ভক্ত — কিছু ভোগ বাকী আছে. তাই সর্বত্যাগ করতে পারে না। তাইতো ঠাকুর বলেছেন দাসীবৎ সেবা করতে। নিষ্কাম কর্ম বা ঈশ্বরার্থে কর্ম করা। কথায় ও কাজে দাসীবৎ সেবা অতি কঠিন হলেও ঠাকুর ভরসা দিয়েছেন। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২:৪০)। আন্তরিক চেষ্টা করলে তিনি এসে সব বলে দেন।

গুরুজনদের মুখে শুনেছি, ভগবান জানেন মানুষ দুর্বল। তাই তাঁকে কেঁদে কেঁদে বললে তিনি অসম্ভব সম্ভব করে দেন। ঠাকুর বলেছিলেন শ্রীমকে, যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর, সেই দুর্জয় সমস্যাও সমাধান করে দেন, অঙ্গুলী সঞ্চালনে। তাই বলেছেন, সেই বাজীকরের শরণ নিতে। আর যারা তাঁর শরণ নিয়েছে তাদের সঙ্গ ও সেবা করতে। ঠাকুর আরও বলেছেন, নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বল। তিনি অবশ্য মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। গুরুমুখে শুনে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা — কর্তব্য কি। এটা প্রথম, তারপর চেষ্টা করা বিচারানুকূল পালন করতে সৎসঙ্গের সহায়তায়। তা পারলে তখন কেঁদে কেঁদে বলা তাঁকে — এই কথা ঠাকুর বলেছেন। শ্রবণ, বিচার, চেষ্টা, ক্রন্দন —

এই পথ।

মন্দিরে মা-কালীর আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ সব ছাড়িয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। তাহার পর ঠাকুরের ঘরে হাত তালি দিয়া তাঁহারা ঠাকুরের নামকীর্তন করিতে লাগিলেন নৃত্য করিতে করিতে।

ভক্তগণ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন মোটর বাসে। ঠনঠনের কালীমাকে দর্শন করিয়া সকলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা শুনিতেছেন। আচার্য বলিতেছেন ব্রহ্মানন্দের কথা। তিনি (কেশব সেন) বলিতেন, 'মা মা' বলে কাঁদ ভাই — অবশ্য দয়াময়ীর কৃপা হবে।

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের গৃহ। শ্রীম-র দরবার। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন মেঝেতে মাদুরের উপর। গৃহী ভক্তদের গৃহাশ্রম পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — মাইনে দেয় বলে কি সর্বদা খাটাতে হবে? চাকর বাকরদের অত খাটাতে নেই। সকাল থেকে আরম্ভ করে এত রাত্রি হলো, সমানে খাটছে। (মোটর চালকের) concentration (একাগ্রতা) কত! লোক না পড়ে।

আমি রোজ সকালে একবার ধ্যান করতে বসি। বাবা, মনে হলে মাথা ধরে। কম concentration (মনের একাগ্রতা)! কত দিক থেকে মনকে কুড়িয়ে এনে তবে তাতে বসান।

কথা কহিতে কহিতে দক্ষিণেশ্বর হইতে ফেরৎ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই কথা বন্ধ হইয়া গেল। ব্যাকুলভাবে বলিলেন — বলুন, বলুন, আপনাদের আজের তপস্যার সংবাদ বলুন।

ছোট জিতেন — মঠে ঠাকুর ও সাধুদের দর্শন ও প্রণাম করে পৃথক পৃথক বসে ধ্যান হল। তারপর স্টীমারে দক্ষিণেশ্বর। সেখানে গঙ্গাস্নান করে মায়ের ভোগারতি দর্শন করি। ঠাকুরের ঘরে ধ্যানান্তে যৎসামান্য প্রসাদ খেয়ে পঞ্চবটীতে গিয়ে বিশ্রাম করি। তারপর দুই ঘন্টা ধ্যান বটতলায়। তারপর চৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়।

শ্রীম — A good day's work (দিনের ঠিক সদ্ব্যবহার)! ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সময় ব্যতীত হয় তাই সুসময়। কে পাঠ করলেন? কোনখানটা পাঠ হলো?

ছোট জিতেন — ইনি পাঠ করলেন। চৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছেন। ভক্তরা তাঁকে ভুলিয়ে নবদ্বীপে নিয়ে এলেন। উনি যেতে চেয়েছিলেন বৃন্দাবন।

শ্রীম — বেশ স্থানটি পাঠ হলো! ভগবানের জন্য চৈতন্যদেব সর্বস্ব ত্যাগ করলেন। এটাই জীবের আদর্শ। ভগবান-লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টা আগে, পরে অন্য সব চেষ্টা।

আর, বেশ স্থানে বসে পাঠ হলো। ঐ বটতলায় কত দর্শন হয়েছে ঠাকুরের। সেখানে বসে ধ্যান, জপ, পাঠ করলে শীঘ্র উদ্দীপন হয়। আগুন জ্বলছে, পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। বসলেই মন স্থির হয়। একজন ভক্তকে ঠাকুর নিজে এই কথা বলেছিলেন। ওখানে ধ্যান করতে।

শ্রীম — আজ রঘুনাথ দাসের তিরোভাব উৎসব বৃন্দাবনে হচ্ছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের অধিকাংশই লেখেন কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথের কাছে শুনে। কতক অংশ লেখেন স্বরূপ দামোদরের করচা দেখে। রঘুনাথ ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজপুত্র — একমাত্র সন্তান। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এতো বৈরাগ্যের তেজ যে, ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন পুরীতে। মাত্র উনিশ বছর বয়স। পরমাসুন্দরী স্ত্রী আর অতুল ঐশ্বর্য সব ছেড়ে পুরীতে গিয়ে উপস্থিত। চৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষার ভার দিলেন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বরূপ দামোদরের হাতে। ইনি দিনলিপি লিখতেন। এই দিনলিপিই চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্যতম source (আকর)।

বৃন্দাবনের বৃদ্ধ সাধুগণের আদেশে চৈতন্য-চরিতামৃত লেখা হয়। কবিরাজ গোস্বামী তখন বৃদ্ধ, প্রায় আশী বছর বয়স। তিনি নিজে দেখেন নি চৈতন্যদেবকে।

অমৃত — আর চৈতন্য-ভাগবত লেখেন কে?

শ্রীম — বৃন্দাবন দাস, শ্রীবাসের দৌহিত্র। ইনি দেখেছিলেন চৈতন্যদেবকে। তখন তাঁর বয়স বুঝি বছর পাঁচেক। সকলে বলে, এঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন চৈতন্যদেব। তাই এই ভাগবত লেখা হয়।

চৈতন্য-চরিতামৃত সম্বন্ধে শোনা যায়, লেখার পর অনেক কাল পড়ে ছিল। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের প্রায় একশ বছর পর বুঝি প্রকাশ হয়। তখন বাংলায় লেখা বইয়ের আদর ছিল না। পুরানো কাগজপত্রের সঙ্গে

ঐ বইয়ের পাণ্ডুলিপি যমুনায় ফেলে দেয়। যমুনার স্রোতে বইয়ের বাণ্ডিল এক ঘাটে গিয়ে আটকে যায়। একজনের চোখে পড়ে এটা। জল হতে তুলে নিয়ে পড়ে ফিরিয়ে দেন কা'কে। এই করে বেঁচে যায়। মস্ত একটা ফাঁড়া গেছে বইটার!

আর একটা ফাঁড়াও গেছে। নিত্যানন্দের শিষ্য শ্রীবাস ঐ পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান বাংলা দেশে। পথে বিষ্ণুপুরের কাছে ঐ বই-এর প্যাঁটরাটা চুরি হয়। ওখানকার রাজা হাম্বিরের সহায়তায় পুনরায় বইটার উদ্ধার হয়।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রঘুনাথ দাসের জীবনটি একটানা তীব্র বৈরাগ্যমণ্ডিত। বার বছর ছিলেন পুরীতে চৈতন্যদেবের কছে। তারপর তাঁকে পাঠান শ্রীবৃন্দাবনে — রূপ সনাতনের কাছে, বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধারের সহায়তার জন্য।

বৃন্দাবনে যাবার সময় বলে দেন — 'গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। আর ব্রজের রাধাকৃষ্ণ ভজিবে'। অক্ষরে অক্ষরে উহা পালন করেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বসে দিনরাত রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে। পরনে কৌপিন। আর শেষের দিকের আহার ছিল এক দোনা ঘোল। কঠোরতায় সনাতনকেও হার মানিয়েছিলেন শোনা যায়। সনাতন এসে কখনও এত কঠোরতা করতে মানা করতেন। কিন্তু শোনে কে? কারণ 'রঘুর নিয়ম যেন পাষাণের রেখা'।

৩

রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, রঘুনাথ, সনাতন — এই সব কথায় কথায় ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। এই সঙ্গে রাসলীলা আর চিংড়িহাটার রাসমেলার কথাও উঠিল। একজন ভক্ত বলিলেন, এখানকার কর্তারা ছোট জাত। শ্রীম তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

শ্রীম (গম্ভীর স্বরে ভক্তের প্রতি) — বলেন কি? যাঁর ঘরে এই ভক্তির সরোবর তিনি যে সত্যিকার ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' মানে ঈশ্বর। তাঁকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁকে না জানলে, তাঁ'তে অটুট বিশ্বাস না

হলে অমন ভাবে অকাতরে পয়সা খরচ করতে পারে মানুষ? কত বড় আধার! যাঁদের এমন ভক্তি তাঁরা যে যথার্থ ব্রাহ্মণ!

শ্রীম-র এই তীব্র তিরস্কারে সকলে নীরব। শ্রীমও নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নববিধান ব্রাহ্মসমাজে গিছলুম। আজ বেশ সুন্দর সুন্দর কথা হলো। কিছুক্ষণ কেশববাবুর কথা পাঠ হচ্ছিল। শুনে মনে হচ্ছিল, আহা, এ সবই ঠাকুরের কথা!

কেউ কেউ বলে, ব্রাহ্ম সমাজ তা স্বীকার করে না। তা নাই বা করলো। বাপের ঐশ্বর্য যদি পুত্র পায় তবে কি সে রাস্তায় রাস্তায় বলে বেড়ায় — ওগো, আমি বাপের ঐশ্বর্য পেয়েছি! সে আবার বলবে কি? তার ঐশ্বর্যই নির্বাক্ বলে দেয়, এসব বাপের ঐশ্বর্য। 'বাপ' মানে অবতার।

শ্রীম পুনরায় অন্তর্মুখ। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — আহা, কেশববাবুর way of putting (বলবার ঢং) কি সুন্দর! এক জায়গায় বলছেন, আচ্ছা বাবা, তোমার তো জাত নেই। তুমি ব্রাহ্মণও নও, বৈদ্যও নও, কায়স্থও নও — কিছু নও। তা হলে, তোমার ছেলের জাত থাকবে কেমন করে? (হাস্য)। ভারি beautiful putting (সুন্দর বর্ণনা-রীতি)।

ভক্তি থাকলে, সমাজ যাকে হীন জাত বলে, সেও ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। আর ভক্তির অভাবে ব্রাহ্মণও হীন জাতরূপে পরিণত হয়। চৈতন্যসম্প্রদায়ের একটি মহাবাণী আছে। (একজন ভক্তের প্রতি) কি সেটি?

ভক্ত — চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সহাস্যে) — কেদার চাটুয্যেকে একবার ঠাকুর বলেছিলেন, তোমরা না খেয়ে গেলে অধরের ভারি কষ্ট হবে।

হালিশহরে তাঁর বাড়ি। একবার ব্রহ্মজ্ঞানী (ব্রাহ্ম) হয়েছিলেন। তাই সমাজ তাঁকে একঘরে করেছিল।

একদিন ঠাকুর গেছেন অধর সেনের বাড়ি। খাওয়ার আয়োজন হচ্ছে। টের পেয়ে কেদারবাবু পালাতে চাইছেন। ঠাকুরকে বললেন —

প্রভো, অনুমতি করুন। চলে যাবেন (হাস্য), ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। বললেন, তোমরা না খেয়ে চলে গেলে অধরের ভারি কষ্ট হবে।

আবার বললেন, ভক্তের আবার জাত কি? ভক্ত সব এক জাত। সব ভগবানের সন্তান। তাই তাঁরা আপনার লোক। আত্মীয়-কুটুম্বকে ছাড়া যায়, কিন্তু ভক্তকে ছাড়া যায় না। ভক্তকে খুশি করলে, পূজো করলে, ভগবানকেই পূজো করা হয়। ভক্তের অন্ন শুদ্ধ।

কেদারবাবু করজোড়ে বললেন, প্রভো, একবার গোলমালে পড়তে হয়েছিল। তা হলে এখন আসি।

ঠাকুর অনুমতি দিলেন না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকে একঘরে হয়েছিলেন সেই ভয় (হাস্য)।

একটু পরই অধরবাবু এলেন। বললেন, পাতা হয়েছে। ঠাকুর উঠে পড়লেন। সকলকে বললেন, চলো চলো। সকলকে সঙ্গে নিয়ে বসে খেলেন। আহারের পর কেদারবাবু ক্ষমা চাইছেন। বললেন, প্রভো, আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি যেখানে খেয়েছেন সেখানে আমি কোন্ ছার?

ভক্তের মর্যাদা ভগবান রাখলেন। অধর যে তাঁর আপনার সন্তান। তিনি কি কেবল পরকালের ভার নেন? এ জন্মের ভারও তাঁর উপর। এখন অধরের বাড়ি এসেছেন। অধর অন্তরঙ্গ ভক্ত — শরণাগত। তাই তাঁর সব ভার ঠাকুর নিলেন। অন্যদিকে কেদারবাবুর অকল্যাণ হতো যদি অধরের মনে কষ্ট দিতো, না খেয়ে। কেদারবাবুকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করলেন।

তাঁর এই আচরণের মানে কি? ঈশ্বর অবতার, সমাজ-বন্ধনের ঊর্ধ্বে। সমাজ রক্ষার জন্য তিনিই নিয়ম করেছেন সমাজপতিদের ভিতর প্রবেশ ক'রে। কিন্তু যেখানে ভক্তের অপমান হয় সেখানে তিনি সমাজ-বন্ধন লঙ্ঘন করেন। সমাজের উপর ভগবান। আবার ভক্ত ও ভগবান এক। তাই ভক্তের — অধরের মান রাখলেন।

বড় সুধীরের প্রবেশ। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সুধীর মর্টন স্কুলের পুরাতন ছাত্র, ভক্ত, তাই শ্রীম তাহাকে খুব স্নেহ করেন। ইদানীং তাহার মাথা একটু গরম হইয়াছে। তাই সে অসংলগ্ন অনেক কথা বলিতেছে।

সুধীর (শ্রীম-র প্রতি) — আমার বাড়িটা বিক্রি করতে হবে।

শ্রীম — কেন, কিছু ঋণ-টিন হয়েছে নাকি?

সুধীর — না।

শ্রীম — কেন, তা হলে?

সুধীর — বেড়াতে যাব।

শ্রীম — কোথায়?

সুধীর — আমেরিকায়।

শ্রীম (সস্নেহে, আবদারের সুরে) — না, না। এটা এখন নয়। আমরা বুড়ো হয়েছি। কোন্ দিন মরে যাই। ইচ্ছে হয় তোমাদের সর্বদা দেখি। ও তো, আমরা মরে গেলেও হতে পারবে! তোমার বয়সই বা কত? কয়েক বছর পরে না হয় যা ইচ্ছে তা করো?

সুধীর — আজ্ঞে আচ্ছা।

একজন ভক্ত (স্বগত) — আচার্যের কর্ম বড় কঠিন। ভক্তদের কল্যাণের জন্য কত ভাবনা! সুধীর ঠাকুরের ভক্ত, তাই তার জন্য অত ভাবনা। আবার ভক্তের কাছে শ্রীম করুণায় কত নেমেছেন!

শ্রীম কিছুকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (সুধীরের প্রতি) — ও কি বিক্রী করতে আছে? একে বলে real property (স্থায়ী সম্পত্তি) — পাকা বাড়ি, জায়গা, এসব!

শ্রীম — এখন থাক কোথায়?

সুধীর — হাওড়ায়।

শ্রীম — মাথায় তেল মাখ?

সুধীর — আজ্ঞে হাঁ — লক্ষ্মীবিলাস।

শ্রীম — আর দই ভাত, ঘোল ভাত খাবে। আর স্নান করবে। আর খুব ঘুমুবে।

অমৃত — লক্ষ্মীবিলাস তো নারকেল তেল। তিল তেল ভাল।

শ্রীম — হাঁ। তিল তেল মাখবে। পরমহংসদেব মাখতেন। তাঁরও একটু বায়ুর দোষ ছিল কিনা।

অমৃত — উনি যা বলেন তা করুন।

শ্রীম — হাঁ, এসব আমাদের মিটিং-এর মত। আর মাঝে মাঝে এক একবার এখানে আসবে। আমরা সকলে রোজ এখানে বসি। মাঝে মাঝে

এসো।

একটি ভক্ত সৃতষ্ণ নয়নে এই দিব্য আচরণ দেখিতেছেন। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দে, ভরসায় ও কৃতজ্ঞতায়। তিনি ভাবিতেছেন, আমরা ধন্য। ঠাকুরের প্রেমলীলার স্পর্শ আমাদের হৃদয়েও অনুভূত হইতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গদের ভিতর দিয়া। সত্যই আমরা ধন্য। পিতা-মাতা-স্বজনহীন সুধীর আজ একা অসহায় নহে। সে যে দিব্য বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত পরিবারের লোক!

১৬ই নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ৩০শে কার্তিক ১৩৩১ সাল।
রবিবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী ৫২ দণ্ড। ১ পল।

একাদশ অধ্যায়

বিচারের পরেও একটা জিনিস আছে

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম নিজের কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। দরজা অর্গল বদ্ধ। ভক্তগণ কেহ কেহ আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। কেহ ছাদে অন্তেবাসীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

আজ ১৭ই নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ ১লা অগ্রহায়ণ সোমবার কৃষ্ণা ষষ্ঠী ৫৬ দণ্ড। ১৪ পল।

এখন পাঁচটা। ডাক্তার, বিনয়, রমেশ, শান্তি, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। শ্যামবাজার হইতে একটি ভক্ত আজ প্রথম আসিয়াছেন। ভক্তগণ আনন্দে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের প্রবেশ। ইনি রামকৃষ্ণ মঠের গদাধর আশ্রম শাখার মহন্ত। তিনি শ্রীমকে দর্শন করিতে মাঝে মাঝে আসেন। বিশ মিনিট বসার পর সন্ধ্যার আলো আসিল। এখন প্রায় ছয়টা। ভৃত্য নিচ হইতে হ্যারিকেন জ্বালাইয়া সিঁড়ির ঘরে রাখিয়া গেল।

শ্রীম হঠাৎ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। কোনও দিকে দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ। নিঃশব্দে বেঞ্চের উপর হইতে হ্যারিকেনটি লইলেন। পুনরায় সবেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহের ভিতর পূর্ব দেয়ালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি বিলম্বিত। তাহার পাশেই আছে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ক্রাইস্ট, চৈতন্য প্রভৃতি নরদেবতাদের ছবিও। আর শিবাদি দেবগণের ছবি।

শ্রীম সকল ছবির সম্মুখে হ্যারিকেনের আলো দেখাইতেছেন আর নত মস্তকে প্রণাম করিতেছেন তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া — জয় রাম, জয় কৃষ্ণ, জয় শিব।

শ্রীম-র পাশে অন্তেবাসী। লণ্ঠনের আলোতে আরতি শেষ হইলে অন্তেবাসী বলিলেন, ললিত মহারাজ বাইরে বসে আছেন। শ্রীম দরজার

কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, কই ললিত মহারাজ? এসো এসো।

ললিত মহারাজ পশ্চিমাস্য চেয়ারে বসিয়াছেন শ্রীম-র বিছানার পাশে। শ্রীম বলিলেন, একটু স্তব শোনাও না। ললিত মহারাজ স্তব আবৃত্তি করিতেছেন। 'ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং দ্বন্দ্বাতীতং' ইত্যাদি। 'আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে' ইত্যাদি জগদ্ধাত্রী স্তব। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবমহেশ্বরঃ' ইত্যাদি গুরু-স্তুতি। 'ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যং অনন্তরূপং ভক্তানুকম্পয়াধৃতবিগ্রহং বৈ। ঈশাবতারং পরমেশমিড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি।' ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতি।

কিছুক্ষণ পর মন্মথ চ্যাটার্জী আসিয়াছেন। তিনি সিঁড়ির ঘরে ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া আছেন। ইনি সাউথ সবার্বন স্কুলের শিক্ষক। বয়স চুয়ান্ন। বাড়ি রানাঘাটে। অন্তেবাসী শ্রীমকে বলিলে তিনি তাঁহাকে ঘরে আসিতে বলিলেন। শ্রীম-র ইঙ্গিতে তিনি বিছানায় বসিয়াছেন তাঁহার সম্মুখে, পূর্বাস্য। শ্রীম উত্তর পশ্চিমাস্য।

দেখিতে দেখিতে বড় জিতেন, উকিল ললিত ব্যানার্জী, ছোট জিতেন, নলিনী, বলাই, বড় অমূল্য, মোটা সুধীর প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বসিয়াছেন পূর্বদেয়ালের গায়ে বেঞ্চেতে পশ্চিমাস্য। তারপর আসিলেন ডাক্তার বক্সী, শান্তি, গদাধর, ছোট নলিনী, বিনয়, রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতি। তাঁহারা বসিলেন বিছানার দক্ষিণের বেঞ্চেতে, উত্তরাস্য। শ্রীম-র গৃহটি বেশ বড়। উত্তর দিকে একটি কাঠের ছোট পার্টিশান আছে। ভক্তগণ কেহ কেহ পার্টিশানের বাহিরেও বসিয়া আছেন। বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে আজ। অন্তেবাসী উঠিয়া গিয়া বিছানার পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পিছনে পুস্তকরাশিতে পূর্ণ একটি বড় টেবিল।

মন্মথ আজ প্রথম দর্শন করিলেন শ্রীমকে। কথামৃত ভাল পড়া আছে — নানা কারণে তিনবার বিবাহ করিতে হইয়াছে। বৃহৎ পরিবার। তিনটি ছেলে, ছয়টি মেয়ে। অধিক পরিশ্রম করিতে হয় অর্থোপার্জনের জন্য। সৎসঙ্গের সময় হয় না। তাই মনে দুঃখ। কথাপ্রসঙ্গে এই সকল সংবাদ পাওয়া গেল। মন্মথ অতিশয় বিনয়ী। নম্রভাবে শ্রীমকে আপন মনের কথা নিবেদন করিতেছেন।

মন্মথ (শ্রীম-র প্রতি) — আমি ঠাকুরের সম্পর্কিত সকলকেই অতি

আত্মীয় বলে বোধ করি। তাই আপনার কাছে কোনও formality (লৌকিকতা) দেখাতে পারলাম না।

আপনার যেমন ঠাকুরের নিকট বিচার দ্বিতীয় দিনেই বন্ধ হয়ে গিছলো, আমার তেমনি 'কথামৃত' পড়ে বিচার ভেঙ্গে গেছে। এমন জিনিস হয় না — এমন সহজ সরল ভাষা। যেখানে খোলা যায় সেখানেই অতি সুন্দর। আর আপনার reflection-গুলি (মন্তব্যগুলি) ভারী সুন্দর। ঠাকুরকে দর্শন করে কখন কোন ভাব হতো তার বিবরণ বড়ই মনোমুগ্ধকর। বিচার কি করবো আমরা? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে?

শ্রীম (জিহ্বার শব্দে অনুমোদন করিয়া) — আহা!

(সহাস্যে) তাঁর sledge hammer-এর (কামারের ভারী হাতুড়ীর) নিদারুণ আঘাত খেয়ে বিচার গেছে।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — আচ্ছা মাস্টারমশায়, বিচার দরকার নেই — বস্তু বিচার করবে না লোক?

শ্রীম — একদিন দুপুরবেলায় ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, উপায় কি? ঠাকুর তক্ষুনি ready answer (সঙ্গে সঙ্গে উত্তর) করে বললেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

নিরাকার সাকার হয়, একথা এক ছটাক বুদ্ধিতে বোঝে কি করে মানুষ? বস্তুবিচার ভাল। পণ্ডিতদের বিচার করতে বারণ করতেন ঠাকুর।

মন্মথ — আত্মা এক কি বহু, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার — এসব বিচার করবার কাজ কি? তাঁকে ডাকলে তিনিই বলে দিবেন, ঠাকুর বলতেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — আত্মা এক কি বহু, এসব বিচারের দরকার নাই? তবে শঙ্করাচার্য কেন এসব করলেন?

শ্রীম (কমলেশ্বরানন্দের কথা শেষ না হইতেই) — বিবেকানন্দ কখনও কখনও বলতেন, শঙ্করাচার্যের realisation (আত্মদর্শন) হয়েছিল। কখনও বলতেন, He is a mere Pandit (তিনি কেবল একজন পণ্ডিত) (হাস্য)। বিচার, a mere intellectual somersault (কেবলমাত্র বুদ্ধির একটা ডিগ্‌বাজী)।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — এ তো সকলের সম্বন্ধেই হতে পারে।

একজন ভাল বলছে, অন্য একজন অন্য রকম বলছে।

শ্রীম — কিন্তু সব শাস্ত্রই শেষে বলছে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরুর definition-ই (সংজ্ঞাই) হলো — যে কাশী গিয়েছে, অর্থাৎ ভগবানদর্শন করেছে।

তা হলেই দাঁড়াচ্ছে, এ সব individual case (ব্যক্তিগত ব্যাপার)। অর্থাৎ বিচার সকলকেই করতে হবে এমন কিছু কথা নয়।

আবার শঙ্করাচার্যের পক্ষে যা সত্য অপরের পক্ষে তা নয়।

তার জন্যই তো এতোগুলি ধর্ম — হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান।

মহম্মদের realisation (আত্মদর্শন) হয়েছিল। ক্রাইস্টেরও হয়েছিল। হিন্দুরা মহম্মদকে মানছে কই?

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — আমিও তো তাই বলছি।

শ্রীম — ডক্টর মহেন্দ্র সরকার আর আমরা বিচার করতাম। একদিন বিচার শেষ হয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, এখন একটু দর্শন হয় তো বেশ।

তা হলেই ইঙ্গিত করলেন, বিচারের উপরও একটা জিনিস আছে। বিচারই be-all and end-all of life (জীবনের সর্বস্ব) নয়। এর উপরও আরও একটা কিছু আছে।

শ্রীম অল্পক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আর বললেই কি বিচার বন্ধ করবে? কখনও শুনতুম, ঠাকুর মার কাছে plead (আবেদন) করছেন। বলছেন, কি করবে মা? এক একবার বিচার করবে না? তাদের দোষ কি মা?

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, এটা ভাল না।

ভক্তরা সব বিচার করতো। তাঁর ভাল লাগতো না। আবার কখনও নিজেই দুইজন ভক্তকে বিচারে লাগিয়ে দিতেন। আবার অন্য একজনকে কানে কানে বলছেন — দেখ, এসব আমার ভাল লাগছে না।

কেন লাগাতেন বিচারে? নিজের সিদ্ধান্তে কতটা সুদৃঢ় হয়েছে তা দেখতে।

সিদ্ধান্তটি ঠিক হয়ে গেলে তখন বিচার বন্ধ করে সাধনে লাগা। বিচারের প্রতিপাদ্য বস্তুটির অন্বেষণ করা। তাঁর দর্শন হলেই হয়ে গেল কার্যসিদ্ধি। সারা জীবন বিচারের দরকার নাই।

ঠাকুর ভক্তদের রুচি অনুসারে তাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত বলে দিতেন। এখন খালি সাধন করা, তপস্যা করা।

নরেন্দ্রকে বললেন, অখণ্ডের ঘর। রাখালকে বললেন, সাকারের ঘর। এ নিয়ে আর বিচার কি করা? ওটি নিয়ে সাধনে লাগা। বস্তু লাভ করা। নিজের স্বরূপকে জানা।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — বিচার relative (আপেক্ষিক) তা হলে। এক stage-এ (অবস্থাতে) এটা ভাল; অন্য stage-এ (অবস্থায়) ওটা ভাল।

শ্রীম — হাঁ। ঐ একটা stage (অবস্থা) আছে। তখন বিচার চলে। তারপর সব বন্ধ হয়।

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব। আবার কথা।

মন্মথ — আমাকে স্কুলের একটা ছেলে ছুরির ঘা মারে তাকে শাসন করায়। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না তার বিরুদ্ধে, ইত্যাদি।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — বেশ ভগবৎ প্রসঙ্গ হচ্ছিল —

মন্মথ — এও তো তাঁর কথা। তিনি কাকে কি ভাবে রেখেছেন। সবই তাঁর কথা মনে করলে তবে হয়।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (অতিষ্ঠ হইয়া) — এতে ইতর বিশেষ নেই মাস্টার মশায়?

শ্রীম (প্রশান্ত ধীর স্বরে) — ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম, ঈশ্বরের দু'টো ডিপার্টমেন্ট আছে — বিদ্যা-মায়া, আর অবিদ্যা-মায়া। অবিদ্যা-মায়াতে এই সব হয় — টাকাকড়ি, বাড়িঘর, মানসম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ। এতে ঈশ্বর থেকে দূর করে দেয়। আর দয়াটয়া, সাধুসঙ্গ, তীর্থ, তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ — এসব বিদ্যা-মায়ার কাজ। এর দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ্ (অতি ধীরে প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার সহিত) — এইটুকু যা তফাৎ! এই তফাৎটুকু কি সামান্য?

শ্রীম (নয়নহাস্যে) — ঠাকুর একটা গল্প বলতেন। একজন স্ত্রী lover-এর (প্রেমাস্পদের) সঙ্গে গাছে উঠেছিল। তা ঠাকুরঝি দেখে ফেলেছে। পরে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোর সঙ্গে কে ছিল গাছে? ও উত্তর করলো, কই কেউ তো ছিল না! আমি একাই ছিলাম। ঠাকুরঝি

বললো, আমি দেখলাম যে দু'জন। বউ উত্তর করলো, গাছে উঠলে ঐ রকম দেখায় (সকলের উচ্চহাস্য)।

তেমনি মহামায়ার ফাঁদ। রক্ষে আছে তিনি রক্ষা না করলে? Dualism আছেই শরীর ধারণ করলে — দু'টি থাকবেই। মহামায়ার ফাঁদে কোথায় উড়ে যায় সব।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — বাবুরাম মহারাজের হাতে-লেখা একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখছেন, শুধু গেরুয়া পরে একটা নাম নিলেই সাধু হয় না। তাঁকে ভালবাসলে তবে সাধু।

শ্রীম — আহা, আহা!

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — পূর্ববঙ্গে যখন গিছলেন, রাঢ়িখালে হিন্দু মুসলমান সকলে কেঁদে ভাসিয়ে দিছল। তখন তিনি ফিরে আসছিলেন। অত ভালবাসা। আমরা বোকা — যদি লিখে রাখতাম তখন।

শ্রীম — আহা, এ প্রেম মানুষে কি হয়? সার্থক নাম — প্রেমানন্দ।

শ্রীম — আমরা একটি গল্প শুনেছি বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে। একবার ইয়ার বাবুরা কলকাতা থেকে নৌকো করে যাচ্ছিল গঙ্গা দিয়ে। তারা মঠে উঠে, কি মর্জি হল, ঠাকুরঘর দেখতে গেল। তারপর চলে যাচ্ছে। বাবুরাম মহারাজ সেবককে বললেন, প্রসাদ দিয়েছিস তাদের? আজ্ঞে না, সেবক বলল। ডাক্ ডাক্। ততক্ষণে ওরা সব নৌকায়। তারপর ডেকে এনে প্রসাদ দিল।

তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন সেবকদের — এই যে প্রসাদ দিলাম এদের, কেন জানিস? যখন সংসারে এক একটা ঘা খাবে তখন এই প্রসাদের কথা মনে পড়বে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ দূরদৃষ্টি কার আছে? তাঁর (প্রেমানন্দ) নামের সার্থকতা করেছে। তাঁর কথা হলেই সকলে বলে — তিনি আমাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসতেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — বলতেন, ওরে আমি গেলে গালাগাল দেবার লোক পাবি না।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। তিনি কি ভাবিতেছেন।

বাবুরাম মহারাজ প্রথমে শ্রীম-র প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তারপর হইলেন

প্রেমময় গুরুভাই। তাঁহার অসংখ্য প্রেমলিপ্ত দিব্য স্মৃতি-কথা কি তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল?

সকলেই নীরব বসিয়া আছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

মন্মথ (শ্রীম-র প্রতি) — কি ভাবে সাধুদর্শন করতে আসতে হয়, তা জানি না। কোন অপরাধ হলে ভাই বলে ক্ষমা করবেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছেন, ভগবানের নাম করতে করতে আসাই শ্রেষ্ঠ উপহার।

শ্রীম — ব্রাহ্ম সমাজের গানে আছে — ভক্তি কুসুমহার চন্দনছিটা এই মাত্র আয়োজন। ইত্যাদি।

মন্মথ (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি? তারা কে কোথায় আছে? ইত্যাদি।

জগবন্ধু (বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া) — আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?

শ্রীম (বাধা দিয়া) — ও সব আর একদিন হবে।

স্বামী কমেলশ্বরানন্দ — এতে রসভঙ্গ হয়। যেখানে ঈশ্বরের কথা হয় সেখানে সকল তীর্থের সমাগম হয়। 'তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ ত্রিবেণী গোদাবরী, তত্র সরস্বতী চ।' ভাগবতে আছে, যে সর্বদা তাঁর কথা বলে — সে বক্তা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। সকলে বিদায় লইলেন। রাত্রি নয়টা।

২

পরের দিন মঙ্গলবার। শ্রীম ভক্তগণকে কয়েক স্থানে উপাসনা, ধর্মবক্তৃতা শুনিতে পাঠাইয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি সকল স্থানের ঈশ্বরীয় বিবরণ শুনিয়া আনন্দ করেন। সর্বদাই তাঁহার ইচ্ছা, সকল ধর্মের সকল স্থানের ভগবদারাধনা একসঙ্গে দর্শন ও শ্রবণ করেন। কিন্তু তা তো সম্ভব নয় মানুষ-দৃষ্টিতে। তাই এই অনুকল্প ব্যবস্থা।

আজ থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে বৈষ্ণব বক্তা কুলদা মল্লিকের প্রবচন হইবে। বিষয় — 'Power and Sacrifice' (শক্তি ও ত্যাগ) সম্বন্ধে। সেখানে পাঠাইলেন অন্তেবাসীকে। তিনি নিজে গিয়াছিলেন

তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্তী কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজে। আর মোটা সুধীরকে পাঠাইয়াছেন চিৎপুর রোডস্থিত আদি ব্রাহ্ম সমাজে।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম নববিধান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় তিনি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। পাশে বসিয়া আছেন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ। ইনি শ্রীম-র সহিত বিদ্যাপীঠের পরিচালনা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলদাবাবু কি বললেন? অন্তেবাসী বলিলেন, তাঁর বক্তৃতার মর্ম এই ঃ

শক্তি না থাকলে কিছু হয় না। দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক যে কোন কাজে শক্তির প্রয়োজন। প্রথমে শক্তি সঞ্চয় চাই। যদি কেউ পালোয়ান হতে চায় তবে তার দৈহিক শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তেমনি মনীষী হতে চাইলে মনের অনুশীলন চাই। আর আত্মার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের আত্মশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি সঞ্চয়ের একান্ত প্রয়োজন। আজকার আলোচ্য বিষয় — বিশেষ করে আত্মশক্তি।

যে কোন শক্তি লাভ করতে হলেই চাই ত্যাগ। ব্রহ্মশক্তি লাভ হয় বিষয়ত্যাগে। বিষয়ভোগে শক্তি ক্ষয় হয়। সঞ্চিত হয় ঐ শক্তি, ত্যাগে। আর তার প্রত্যক্ষ রূপটি হলো ব্রহ্মসম্পদ ভোগে। সংসারের সকল বস্তুতে অনাসক্তি। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুতে আসক্তি।

ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করলে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ হয়। এই শক্তির সহায়ে মানুষ দেবতা হয়, অমৃতত্ব লাভ হয়। এটাই মানুষ-জীবনের চরম লক্ষ্য। ইত্যাদি।

শ্রীম — বেশ সব কথা। ওখানেও শুনলাম এই সব কথাই। আর একটা দিক। এঁদের কথার ভিতর দিয়ে ঠাকুরের মহাবাণী সব বিগলিত হয়ে আসে। বললেন, ভগবানকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসতে হয় — তন মন ধন সব দিয়ে। তখন তাঁর দর্শন হয়। এটাই চরম লক্ষ্য।

মোটা সুধীর আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আজের আলোচনার বিষয় ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। তিনি ভারতে, বাংলায় এক নব জাগরণ আনিয়াছেন — ধর্ম, সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে। তাঁহার সামাজিক সংস্কারের প্রভাবে বহু

কুসংস্কার বিনষ্ট হয়। মানুষের নূতন আশা নূতন ভরসার সৃষ্টি করিয়াছে। উপনিষদ্ বেদাদির চর্চা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইত্যাদি।

শ্রীম সব শুনিয়া বলিলেন — সুধীর বাবু, আপনি এইটা পড়ে শোনান ভক্তদের। সুধীর 'তত্ত্ববোধিনী' হইতে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পাঠ শুনিতেছে। শ্রীম তিনতলায় উঠিলেন নৈশ আহার করিতে।

তার পরের দিন বুধবার। আজ শ্রীম নিজে গিয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজে ডাক্তারের মোটরে অপরাহ্নে। ফিরিবার পথে তিনি কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া ওভারটুন হল দেখিয়া আসিলেন। সেখানে সন্ধ্যার পর বক্তৃতা হইবে — কেশবচরিত। বক্তা, বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল।

ঢাকার ভক্ত হরিশচন্দ্র দাস আসিয়াছেন। শ্রীম বাহিরে গিয়াছেন। তিনি অন্তেবাসীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া গিয়াছেন। আগামী কাল আবার আসিবেন। তিনি শ্রীমকে দর্শন করিবেন।

শ্রীম সন্ধ্যার একটু পূর্বে ফিরিয়াছেন। অবিলম্বে তিনি অন্তেবাসীকে ওভারটুন হলে পাঠাইয়া দিলেন। দেশপ্রেমিক বিপিন পাল বক্তৃতা করিতেছেন। অন্তেবাসীর ভাল লাগিল না। তাই তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে আজও গেলেন। সেখানে আজও কুলদা মল্লিক ভাগবতরত্ন বক্তৃতা করিতেছিলেন।

রাত্রি আটটায় অন্তেবাসী ফিরিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন দ্বিতলের ঘরে। ভক্তগণ অনেকে বসা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি হলো সেখানে?

অন্তেবাসী — 'কেশবচরিতে'র রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন বিপিনবাবু। তিনি কেশববাবুকে একজন পলিটিসিয়ানের রঙে রঙিয়ে লোকের সামনে ধরেছেন। আমার এটা ভাল লাগলো না। তাই আমি চলে আসি থিওজফিক্যাল হলে। এখানে আজও কুলদা মল্লিক বক্তৃতা দিলেন। বিষয় 'অবতারতত্ত্ব'।

শ্রীম — কেশববাবু পলিটিসিয়ান্, বল কি? রক্ষে, যাই নাই ওখানে বক্তৃতা শুনতে! আদিসমাজে গেলে তবুও বেদপাঠ শোনা যায়। আর বেদের ভাঙ্গা বাংলা গান। ঈশ্বরীয় উদ্দীপন হয় এতে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ওখানে কি বললেন?

অন্তেবাসী — কুলদাবাবু বললেন, যখন ভক্তগণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েন ভগবানের জন্যে, তখনই ভগবান অবতার হয়ে আসেন। তাঁর আসার পূর্বে ধর্মের গ্লানি হয়। লোক বলে বেশী, কাজ করে কম। তাতে আবার অভাব আন্তরিকতার। কতকগুলি ভক্ত তখন খুব ব্যাকুল হন সত্যধর্মের জন্য। নিজেরাও পারেন না, অপরের মধ্যেও তা দেখতে পান না। সেই অবস্থায় তাঁরা নির্জনে গোপনে ক্রন্দন করেন। বলেন, প্রভু, তুমি এসো। আমরা বড় ব্যথিত। দর্শন দিয়ে কৃতার্থ কর। ভক্তের ক্রন্দনে ভগবান করুণায় বিগলিত হয়ে পড়েন। তখনই নরকলেবর গ্রহণ করেন। ভক্তের ডাক এত প্রবল — তাঁর ব্যাকুল ক্রন্দনের তড়িৎ বেগ এমন জ্বালাময়ী যে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। তাঁর সিংহাসন টলটলায়মান হয়। 'করাইব কৃষ্ণ দরশন'— অদ্বৈতাচার্যের ভক্তগণের নিকট এই অবিচল প্রতিশ্রুতির মান রক্ষার জন্য, আর সন্তানের আকুল ক্রন্দনে স্নেহময়ী জননীর আগমনের ন্যায়, অদ্বৈতাচার্যের উন্মাদ হুংকার এবং শ্রীবাসাদি ভক্তদের ব্যাকুল ক্রন্দনে আবির্ভূত হলেন শ্রীভগবান নবদ্বীপে নরকলেবরে নিমাইয়ের দেহে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। ইত্যাদি।

শ্রীম — বা-বা, বেশ সব কথা। ঠাকুরের কথার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, আমিই গৌর। আমাদের বলেছেন, ক্রাইস্ট, চৈতন্য আর আমি এক। ভক্তদের হৃদয়ের বেদনা বুঝতে পেরেছিলেন হৃদয়বিহারী। অনেকের হয়তো এ জন্ম তখনও হয় নাই। কিন্তু তাদের পূর্বজন্মের ব্যাকুলতার ডাকে তাঁকে আসতে হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে। যাঁরা ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন তাঁদের কথা হয়তো জগৎ জানে না, জানবেও না। কিন্তু তাঁদের নিজের ও জগতের কাজটি হয়ে গেল। ঠাকুর অবতীর্ণ হলেন। জগৎ জুড়ে তাঁর কত ভক্ত। কতজনে কতভাবে অপরের অজ্ঞাতে ডেকেছিলেন। তাইতো এলেন ঠাকুর সদলবলে। এসে তাঁর প্রথম কাজটি হল 'বাউলের দল'-টি একত্রিত ও সংগঠিত করা। নানাস্থানে তাঁদের জন্ম হয়েছে — তাঁদের ডেকে আনা তাঁর কাছে। দ্বিতীয়টি হল, তাঁদের দ্বারা দেশে ও বিদেশে জগৎময় তাঁর অভয় বাণী প্রচার ক'রে অশান্ত দুঃখিত চিন্তিত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রেমভক্তির ঝরণার

শীতল বারি সিঞ্চন করা।

'বাউলের দল' তৈরী হওয়ার পূর্বেও শোনা যায় ঠাকুরের নিকট বহু ভক্ত এসে তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন করে গেছেন, কৃতকৃত্য হয়েছেন — নানা ধর্মের, নানা স্থানের। শোনা যায় অনেক মুসলমান ফকির, খ্রীস্টান ভক্ত তাঁর কাছে এসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন।

'বাউলের দল' গড়ার পরেও কত ভক্ত কত ভাবে তাঁর কৃপায় চিরশান্তি চিরসুখ লাভ করেছেন, তার সংবাদ আমরা কতটা জানি?

তাঁর আগমন সমগ্র জগতের জন্য। দেখলে মনে হয় — যেন তিনি ক'টি লোকের জন্য এসেছেন। কোনও একটা দেশের বা স্থানের, তা নয়। কত লোক তাঁর স্থূল শরীর হওয়ার পূর্বেও তাঁকে আন্তরিক ডেকেছেন। তাঁরা হয়তো তাঁর আসার পূর্বে বা ঐ সময়ে জন্ম নিয়েছেন। কতজন বা তাঁর চলে যাবার পর জন্ম নিয়েছেন। এখনও জন্ম নিচ্ছেন, আরও অনেকে জন্ম নেবেন। আবার শরীর নিয়ে না আসা পর্যন্ত এই লীলা চলবে। দেশ বিদেশে সকলকেই তাঁর ভাবরাশির কাছে আসতে হবে। আর শান্তি সুখ, আনন্দ লাভ করবে।

গিরিশাদি উদ্ধার তাঁর নর-শরীরে থাকার সময় একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। কত জন্ম কেঁদেছেন, এই জন্মেরও হৃদয়ে অজ্ঞাত কত ক্রন্দন জমা ছিল, এই সবই অন্তর্যামীরূপে ঠাকুর জানতেন। তবেই নিজে গিয়ে কোলে তুলে আনলেন। মানুষ দেখে বাইরেটা। ঈশ্বর দেখেন ভিতরটা। আবার মানুষ নিজের জীবনের অজ্ঞাত বেদনা নিজে জানে না। সব জানেন, অন্তর্যামী।

অনন্ত জগৎ, অনন্ত জীব, অনন্ত ভক্ত। তিনি সকলকে জানেন। সকলের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ক্ষুদ্র জীব আমরা। তাঁর কি বুঝবো? এক সেরে ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না — এ ঠাকুরের কথা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৯শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ।
৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল, বুধবার। কৃষ্ণা অষ্টমী ৬০ দণ্ড।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিনাশের এই সাতটি ধাপ

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। সিঁড়ির ঘর। অপরাহ্ণ চারটা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন। পাশে বেঞ্চেতে বসা অন্তেবাসী গদাধর বিনয় প্রভৃতি।

ঢাকার হরিশবাবুর প্রবেশ। তিনি শ্রীমকে প্রণাম করিয়া ভক্তদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন। ইনি ভক্ত ও ব্রহ্মচারী। বয়স ত্রিশের উপর। ভগবানের জন্য ব্যাকুল। সাধু হইবার ইচ্ছা। কিন্তু গর্ভধারিণীর সেবার জন্য গৃহে কিছুকাল থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন ঠাকুরের সন্তান, মঠের প্রধানগণের দ্বারা। সম্প্রতি তাঁহার জননীর দেহত্যাগ হইয়াছে।

হরিশ নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কয়েকদিন হয় বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন। আর গৃহে যাইবেন না — সাধু হইবেন। শ্রীম আনন্দে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (হরিশের প্রতি) — আপনাকে দেখলে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যেতেন যে, এতো তীর্থ করেছেন। আপনাকে দেখলেই আমাদেরও তীর্থদর্শন হয়।

একজন বৃন্দাবন থেকে এসেছে বলায় ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। কি কি দেখলেন বলুন।

হরিশ — প্রথমে দর্শন হলো ৺কেদারনাথ। তারপর হলো ৺বদরী নারায়ণ। এরপর যাই কাশ্মীর। সেখানে দর্শন হলো ৺অমরনাথ আর ৺ক্ষীরভবানী।

ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রমও দর্শন হয়েছে। স্বর্গাশ্রমে সাধুরা গঙ্গার তীরে কুটিরে থাকেন। আর ভিক্ষা করে খান সত্র থেকে। বেশ উদ্দীপন হয়।

শ্রীম — বার বছর হয়ে গেল ফস্ করে! আমরা স্বর্গাশ্রমে কিছুকাল ছিলাম। বেশ স্থান — গঙ্গাতীর, হিমালয়। প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ওসব স্থানের। ঋষিকেশেও মায়াকুণ্ডে থাকা গিছলো। স্বামীজীরা এরও পূর্বে ছিলেন ওখানে। একটা সত্র ছিল মায়াকুণ্ডে। তারই একটা ঘরে ছিলাম। কনখল আশ্রমেও ছিলাম। বস্তীরামের সত্রের কাছে গঙ্গাতীরে গিয়ে বসতাম, একটা পাঠশালা ছিল, তারই একটা ঘরে। তখন সেবাশ্রমে রাখাল মহারাজ ছিলেন। হরি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজও ছিলেন। হল ঘরে আমরা থাকতাম। খুব স্থান ওসব! আবার অমন সঙ্গ!

শ্রীম — ক্ষীরভবানীতে স্বামীজী ছিলেন। মনে হয়, সেখানেই তাঁর চাবি খুলে দেন ঠাকুর। ঠাকুর বলেছিলেন স্বামীজীকে কাশীপুর বাগানে, এখন গিয়ে মায়ের কাজ কর। চাবি দিয়ে বন্ধ থাকলো। তারপর কত কাজ আমেরিকা ও ইউরোপে!

স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন, মা'র দর্শনলাভ হয়েছিল। উনি ভাবছিলেন মুসলমান রাজাদের অত্যাচারের কথা। আর মনে মনে বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকলে গায়ের রক্ত দিয়ে এসব রক্ষা করতাম। ওমনি মা উপর থেকে বললেন — বাবা, আমি তোমায় রক্ষা করি কি, তুমি আমায় রক্ষা কর। আমার ইচ্ছাতেই ওই সব হয়েছে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! মানুষ এর কি বুঝবে?

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (হরিশের প্রতি) — খুব দুর্ঘটনা হয়ে গেল ঋষিকেশে। অনেকগুলি সাধুর প্রাণ গেল জলপ্লাবনে। মঠেরও দু'জন গেল।

একজন ভক্ত — সর্বেশ্বরানন্দ আর ভবানী চৈতন্য।

শ্রীম (হরিশের প্রতি) — আপনি নৈমিষারণ্য কেমন দেখলেন — যায় কি করে?

হরিশ — হরিদ্বার থেকে ফিরবার পথে লক্ষ্ণৌর পঞ্চাশ মাইল আগে বালামৌ জংসনে নেমে অন্য একটা গাড়িতে যেতে হয় ১৫/১৬ মাইল।

নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীর পাট আছে গোমতী নদীর তীরে। ইনি ঋষি-মুনিদের প্রথম ভাগবত শোনান। পুরাণ সংকলন করেন বেদব্যাস ওখানে।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম উঠিয়া ছাদে গেলেন, ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আসিয়া বসিলেন জোড়া বেঞ্চেতে, ছাদের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পশ্চিমাস্য। হরিশ ও জগবন্ধু বসিলেন অন্য বেঞ্চেতে শ্রীম-র সম্মুখে। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (হরিশের প্রতি) — এই সব তীর্থ। আবার ধরতে গেলে সবই তীর্থ। ঋষিদের এই পৃথিবী ধারণ করেছিলেন। তাহলে সমগ্র পৃথিবীই তীর্থ।

আবার দেখ, বামন অবতারে তাঁর এক পদ পৃথিবী ধারণ করেছিল। আবার ঠাকুর বলেছেন, সবই তিনি হয়ে রয়েছেন — এই সব। তা হলে সকলই পবিত্র, সবই তীর্থ।

তবে আমরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে রয়েছি। তাই এই সব তীর্থে গেলে একটু উদ্দীপন হয়। এই যা। হাঁ, বড্ড ছোট জিনিস নিয়ে রয়েছি।

হরিশ মঠে যাবেন। জগবন্ধু শ্রীম-র আদেশে তাঁর হাতে একটা প্লেটে মিষ্টি আনিয়া দিলেন। এদিকে সন্ধ্যার আলো জ্বলিয়াছে। শ্রীম হরিশকে বলিলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঠাকুরের একটু নাম করে খান। মিষ্টিমুখ করিয়া হরিশ বিদায় নিলেন।

রাত্রি আটটা। সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে ও সম্মুখে বসা ভক্তগণ — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বিনয়, উকিল ললিত, বলাই, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র মটকো তিন তলায় গান গাহিতেছে। সুকণ্ঠ বালক। শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছে ঐ সঙ্গীতের লহরী। তারপর কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐখানে মনটা টেনে রেখেছে। গানে মন বড় স্থির করে দেয়। আর সাধুসঙ্গে।

বড় জিতেন — আমাদের মধ্যে কেউ গান জানে না।

শ্রীম — চেষ্টা নাই, তাই। নরেন্দ্র কত চেষ্টা করে শিখেছিলেন। এ ওস্তাদ ও ওস্তাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে। তাঁর গান কানে গেলে মন একেবারে স্থির হয়ে যেতো, একেবারে নিশ্চল। আর ঠাকুরের গানে ঐরূপ হতো।

কেন হতো? ব্রহ্মভাবটি প্রকাশ হতো গানে, সুরের ভিতর দিয়ে। তাই মনকে ম্যাগনেটের মত টেনে নিয়ে যেতো। জগৎ ভুল হয়ে যেতো। ঠাকুরের নৃত্যেও মনকে টেনে নিয়ে যেতো। তখন চোখ অন্য বস্তুতে ফিরাতে পারতো না। ঠাকুরের কথাতেও মন স্থির হয়ে যেতো। আবার যখন সমাধিস্থ হতেন তখনও ভক্তদের মন একাগ্র হতো — একেবারে তাক্ লেগে যেতো। গান সহজ সাধন, শীঘ্র স্থির হয় মন।

২

নববিধান ব্রাহ্মমন্দির। সন্ধ্যা ছয়টা। আজ শুক্রবার। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব। ইনি এই মত ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

এখন ব্রহ্মানন্দের জীবনচরিতের আলোচনা হইতেছে। আজের আচার্য গোপালবাবু। আলোচনার বিষয় — 'Keshav and National Problems' (কেশব ও জাতীয় সমস্যা)। সমাজ মন্দির পত্রপুষ্পে সজ্জিত। আর আলোকমালায় সমুজ্জ্বল।

শ্রীম, জগবন্ধু বিনয় ও ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। পশ্চিম ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীম কলিকাতা মাদ্রাসা স্কুলের হেড পণ্ডিতের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন। ইতিমধ্যে শিলচরের ভক্ত রজনী আসিয়া মিলিত হইলেন।

ভক্তসঙ্গে শ্রীম মন্দিরে প্রবেশ করিলেন পশ্চিম দিককার উত্তরের দরজা দিয়া। আর বসিলেন, বাম হাতের বেঞ্চে সারিসমূহের প্রথম সারির প্রথম স্থানে। মন্দিরে লোক অল্প। তাই এক জন সেবক আসিয়া শ্রীমকে অনুরোধ করিলেন আরও অগ্রে বসিতে। শ্রীম উঠিয়া গিয়া প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানে বসিলেন।

শ্রীম-র ডান হাতে বেদীতে যাইবার রাস্তা। এই রাস্তার ডান হাতের প্রথম সারিতে বসিলেন অন্তেবাসী। ছোট জিতেন বসিলেন অন্তেবাসীর পিছনের সারিতে। তাঁহার ডান হাতে একই বেঞ্চেতে বসিয়াছেন বিনয় ও রজনী। ডাক্তার বসিলেন শ্রীম-র সঙ্গে বাম হাতে। গদাধর বসিয়াছেন শ্রীম-র পিছনে দ্বিতীয় সারিতে। বলাই কিছুক্ষণ পর আসিলেন।

ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার এই সকল সমস্যা শ্রীকেশবের

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন পাইল। নূতন বিক্রমে প্রচারকগণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। সর্বত্র উত্তেজনা — আগে চল, আগে চল, ভাইসব। ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হইতেছে।

একঘন্টা পর শ্রীম ও ভক্তগণ মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। ধীর পদক্ষেপে সকলে মর্টন স্কুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চেতে বসিয়াছেন ভক্তসঙ্গে। বড় জিতেন, মোটা সুধীর, বড় অমূল্য, জগবন্ধু প্রভৃতিও শ্রীম-র পাশে বসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর শ্রীম আহার করিতে তিন তলায় উঠিলেন। বলিয়া গেলেন, আপনারা কিছু করুন। ভক্তরা নানা গল্প করিতেছেন। একটু পরেই পাঠ আরম্ভ করিবেন। কিন্তু আরম্ভ আর হইল না। এক ঘন্টার মধ্যে শ্রীম আহার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, কই, ভক্তগণ কই? এখনও ক্লাস আরম্ভ হয় নাই? অন্তেবাসী বলিলেন, এখন recreation (গল্পারাম) চলছে।

শ্রীম দ্বিতলের সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। মেঝেতে মাদুর ও কম্বল পাতা। শ্রীম কম্বলে বসিয়াছেন, পূর্বাস্য। ভক্তগণ সম্মুখে তিন দিকে বসা। শ্রীম আসন গ্রহণ করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি নীরব বসিয়া আছেন কিছুক্ষণ। তারপর গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছেন গীতা —

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।। (গীতা ১৩:৫)

শ্রীম মত্ত হইয়া বারবার গাহিতেছেন। স্বর ক্রমে উচ্চ ও মধুর হইতে মধুর গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছে। এই মন্ত্রটি শ্রীম-র অতিশয় প্রিয়। তাই প্রায়ই সুর সংযোগে উহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। পনের মিনিট ধরিয়া এই একই মধুর গম্ভীর ভাবপ্রবাহ চলিতে লাগিল। তারপর এই ভাবপ্রবাহের দুই একটি লহরী ভক্তগণকে পরিবেশন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা দেখুন, ঋষিদের কি মান দিচ্ছেন। বলছেন, ঋষিরা বলেছেন।

অর্জুনও কিন্তু বললেন — তুমি বলছো, তুমি ঈশ্বর। তাই আমি বিশ্বাস করছি।

আহা, দু'জনের কথাই ঠিক! অর্জুনও ভক্ত। ভক্তের ভাবে বেশ বলেছেন। আর তিনিও (শ্রীকৃষ্ণ) ঋষিদের মান রেখে যা বলবার বললেন।

যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে রাজসূয় হলো। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিলেন সকল ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিবার ভার। তখনকার ব্রাহ্মণরা সর্বদা ঈশ্বরকে ডাকতেন কিনা।

বড় জিতেন — তবে অন্য লোক শিখবে আবার।

শ্রীম (জিতেনের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া) — 'আবার' নয়। লোকশিক্ষার জন্যই (অবতার) আসেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, কেশববাবুর ওপর এদের কি ভক্তি! 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।'

তিনি (ঈশ্বর) জানেন, এই গুরুভক্তি কি জন্য। না, আমার জন্য।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কাল সন্ধ্যার সময়ে 'লিলি কটেজে' কেশববাবুর সম্বন্ধে কথকতা হবে। আমরা ওখানে যাব ভাবছি রিক্সা-ফিক্সা করে।

ডাক্তার — কেন, আমরা মোটর নিয়ে আসবো। তাতে গেলে হয়?

শ্রীম — না। আসবার সময় আনলেই হবে। ঐ দিক দিয়ে (কাশীপুর শ্যামবাজার সারকুলার রোড দিয়ে) আপনারা চলে যাবেন। আসবার সময় আসা যাবে।

ড্রাইভারকে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়। মাইনে দেওয়া হয় বলে কি তাকে অত খাটাতে হবে, ছি!

কাগজে বেরিয়েছিল। বিলেতে একজন আয়ার কাজ করতো। অনেক মাইনে কিনা তাদের। আর মেমদের অনেক engagements (সামাজিক কর্ম) — আজ থিয়েটার, কাল বায়স্কোপ। ছেলেদের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে এদের কাছে রেখে।

তা সেই আয়ার নিজের ছেলের অসুখ। সে ছুটি চাইল। মেম্ দিলে

না। বললে, তোমায় তো আমরা এই জন্যই রেখেছি। তা হবে না। তারপর দিন শুনলে, ছেলেটি মারা গেছে। আহা, দেখ টাকার জন্য কি হলো!

সর্বত্রই ঐ। যেখানে clashing of interest (স্বার্থ সংর্ঘষ) সেখানেই ঐ। সর্বদাই ঝগড়া চলছে। আবার temper lose (মেজাজ নষ্ট) হয়ে যায়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি ছেলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। একটি মেয়ে তখন চাল কাঁড়ছিল। মেয়ের হাতের চুড়ির ঝনর ঝনর শব্দ হচ্ছে। ছেলেটা ঐ শব্দটা বরাবর লক্ষ্য করে আসছে। পরস্পরের আঘাতে এক একটি করে চুড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে। যখন দু'হাতে মাত্র দু'গাছা চুড়ি রইল তখন আর শব্দ নেই। তাই দেখে ছেলে চলে আসছে। তখন মেয়েটি বললে — কই, দেখা করে গেলে না? তখন ছেলে বললে — না বাবা, একা থাকলে দেখছি শব্দ নেই। একাই ভাল।

৩

In the midst of disagreements, agreement (সকল বৈষম্যের ভিতর সাম্য স্থাপন) করা, সে কেবল অবতার-পুরুষ পারেন।

বড় জিতেন — স্বামী স্ত্রী, আর একটি ছেলে, এই আড়াই জনে মিল নেই।

শ্রীম — স্বামী স্ত্রী বলছেন কি? যেখানে দুইজনে মিলেছে সেখানেই ঐ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২:৬২-৬৩)

শ্রীম (আঙ্গুলে গণনা করিয়া) — (১) বিষয়চিন্তা, (২) আসক্তি,

(৩) কাম, (৪) ক্রোধ, (৫) সম্মোহ, (৬) স্মৃতিভ্রংশ, (৭) বুদ্ধিনাশ। তারপর বিনাশ।

These are the seven steps leading to destruction (বিনাশের এই সাতটি ধাপ)।

এ ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে। কিন্তু জানে না নাচাচ্ছে কে।

দেখ না, একটা আফিসে বড় সাহেব আছে। তার নিচে ছোট সাহেব। তার নিচে আর একজন। এইরূপ তার নিচে, তার নিচে সব রয়েছে। আবার এই এক সেট গেল। আবার আর একদল নাচতে নাচতে এলো। এমনি সংসার।

এখানে temper lose (মনের স্থৈর্য বিনষ্ট) হয়ে যায়।

তাই তো যারা এখানে স্থির থাকতে পারবে না, তাদের জন্য সন্ন্যাস।

মর্টন স্কুলের একজন শিক্ষক বামনদাস মুখার্জী। তিনি জ্ঞান রায় নামক একটি ছাত্রকে প্রহার করিয়াছেন। প্রহার একটু বেশী হইয়াছে। শ্রীম রেক্টার। তাঁহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তিনি বিচলিত হইয়াছেন!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অযুত হস্তীর বল যদি থাকে হৃদয়ে তবে যাও, সংসার কর গিয়ে। যদি সামান্য কারণেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তবে তোমার স্থান সংসারে নয়, সন্ন্যাস-আশ্রমে। যায় না কেন, সন্ন্যাস নিতে?

বড় জিতেন — রান্না ভাত দিবে কে? আর মশারিটি টাঙ্গিয়ে?

শ্রীম — তাই বল। কিন্তু এখানে অযুত হস্তীর বল থাকে তো যাও। নয়তো চলে যাও। সন্ন্যাস আশ্রমই হয়েছে যে এই জন্য!

একজন ভক্ত শিক্ষক — আমি রাখালকে ক্লাসে অপমান করেছি তিরস্কারের দ্বারা।

শ্রীম — জিজ্ঞেস করা যাবে আর একদিন, কি অপমান।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, এঁরা রাতদিন ঠাকুরকে চিন্তা করেন। এঁদেরই এই অবস্থা। আর অন্য লোকের না জানি কি দশা। হায়, ভক্তদেরই এই দশা!

তাই তো ঠাকুর বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল।

বড় অমূল্য — কলেজ স্কোয়ারে দু'জন ঝগড়া করছিল। একজন

হিন্দুস্থানী আর একজন বাঙ্গালী। একজন তুলসীদাসকে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান দিচ্ছে। আর একজন তা মানে না।

শ্রীম (আনমনাভাবে) — ঐ একটা নাচ হচ্ছে আর কি।

বড় অমূল্য — কাল কখন হবে ওদের ওখানে কথকতা?

শ্রীম — সন্ধ্যা ছ'টায়। লিলি কটেজে হবে। আর সকালে নববিধানের প্রচারাশ্রমে হয়। এঁরা সব যান (রজনী, বুদ্ধিরাম, গদাধর, বিনয়, ছোট জিতেন প্রভৃতি)।

ওখানে চার পাঁচ জন থাকেন। ওঁরা সব ভাল লোক। সাধু সব। অকিঞ্চন। সংসারের নামযশের privilege (সুযোগ) নিলেন না এঁরা। ত্যাগী সাধু।

কথায় বলে, এলে গেলে মানুষের কুটুম্। আনাগোনা করলে ওঁদের সঙ্গে আলাপ হয়।

ওঁরা হয়তো কত কথা বলেছেন — ঠাকুরের কথা। তা আমরা যাই নাই অত দিন। তা হলে কেমন করে জানবো? এঁদের অনেকে ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছেন। কেশববাবুর সঙ্গে যেতেন ঠাকুরের কাছে। এমনতর আরও কত গ্রুপ (group) আছে।

খ্রীস্টান ভক্তরা কি করছে তা' কি আমরা জানি? অনেকে ঠাকুরকে দর্শন করেছে। আবার এমন অনেক আছে যারা দর্শন করে নাই, কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। ঠাকুরকে ভালবাসে।

তেমনি মুসলমান ভক্তও আছে। অন্তরঙ্গ ভক্তরা যাবার আগে, অনেক মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের কাছে যেতো, শুনেছি। এইরূপ অনেক গ্রুপ ভক্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান। হিন্দুদেরই কত ব্রাঞ্চ আছে — বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজ, কত কি। এই সবেরই উৎপত্তি স্থল বেদ।

আজকাল সকলেই ঠাকুরের কথা নেয়, অবশ্য তাদের রুচি অনুসারে।

তাই যেতে হয় সকলের কাছে। এলে গেলে কুটুম্বিতা হয়। দু' একদিনে হয়তো দু' তিন জনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তখন বোঝা যায় অনেক earnest (উৎসাহী) লোক আছে, অনেক devout (ভক্ত) লোক আছে।

আজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে তিনবার ঠাকুরের নাম করলেন। একবার

বললেন, পরমহংসদেব কেশবকে দেখে বলেছিলেন, এই ছেলেটির ফাত্না ডুবেছে। আর একবার ঈশা মুশা চৈতন্যের নাম করে, এঁদের সঙ্গে ঠাকুরের নামও করলেন। আর একবার বললেন, পরমহংসদেব মায়ের নাম নিতেন।

আদি সমাজের প্রার্থনা দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন। তখন কেশববাবু ওখানে বেদিতে ধ্যান করছিলেন। বয়স সাতাশ। দেখেই বললেন, এই ছেলেটির ফাত্না ডুবেছে। মানে বঁড়শিতে মাছ এসেছে। মাঝে মাঝে ঠোকর দিচ্ছে খাবারে — তখন ফাত্নাটা জলের নিচে চলে যাচ্ছে। মাছটা তখনও আটকায় নাই। মানে, মন ভগবানে লগ্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও ধরে রাখতে পারছে না। কত উঁচু কথা! একি চারটিখানি কথা? তাই ঠাকুর বলেছিলেন, 'কেশব দৈবী মানুষ'।

বড় অমূল্য — আদি সমাজের প্রথম আচার্য কে?

শ্রীম — প্রথম, রাজা রামমোহন রায়। তারপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন। কেশববাবু ওখানকার preacher (প্রচারক আচার্য) ছিলেন। তারপর ওঁর সঙ্গে মিললো না। উনি ক্রাইস্টকে admire (প্রশংসা) করতেন। কিন্তু উনি (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন, মানুষকে অত বড় করা ভাল নয়। তাই ভেঙ্গে এলেন — নববিধান ব্রাহ্মসমাজ করলেন।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, লক্ষ্য বড় অমূল্য) — অন্যে কি করছে না করছে, তা দেখবার তোমার কি অধিকার? অন্যের কাজ দেখবার সময় কই? একটা শোক এলে সব উল্টে পাল্টে যায়। এমনতর অবস্থা। এতে আবার অন্যের কথায় থাকার সময় কোথায় পায় লোক!

অমূল্যের দুই বছরের কন্যা সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — একটু পাঠ হোক না পুরাণ। কোন বইটই আছে কি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না।

শ্রীম — আচ্ছা, আমার কাছে গীতা আছে।

গদাধর হ্যারিকেনটা নিকটে আনিল। শ্রীম নিজেই গীতা পাঠ করিতেছেন — বিশ্বরূপ। কিন্তু আলোটার সলিতা ছোট বলিয়া পৎ পৎ করিয়া নিভিয়া গেল। সব অন্ধকার।

একজন ভক্ত চারতলায় গেলেন অন্য আলো আনিতে। এই ফাঁকে শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন। (লক্ষ্য বড় অমূল্য) অন্যের কাজ দেখার আমার অবসর কোথায়? বলে, আমার নিজের জ্বালাতেই আমি অস্থির।

আলো আসিয়াছে। গীতা পাঠ চলিতেছে — বিশ্বরূপ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অর্জুনের বিশ্বাস হচ্ছে না শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণভাবে। এক একবার সংশয় এসে যাচ্ছে। কৃষ্ণ বলছেন, আমিই জগতের পিতামাতা, ধাতা, সব। আবার বিনাশকর্তা। একটু বিশ্বাস যখন হলো তখনই দেখতে চাইলেন বিশ্বরূপ। কিন্তু সইতে পারলেন না। একেবারে 'বেপথুঃ' হয়ে পড়লেন।

অবতারের সবটা বুঝতে পারে না ভক্তরা। শক্তি কোথায়? তাই বেশী চাইতে নেই। যতটা সয় ততটাই ভাল। বেশী চাইলে এই রকম হয়, অর্জুনের যা হলো। ভক্তের আবদার রক্ষা করলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে অপরের শিক্ষাও হয়ে গেল — বাড়াবাড়ি না করে।

কিন্তু আসল কথাটির লক্ষ্য হলো অর্জুন। কিন্তু বলছেন তিনি সকল ভক্তদের।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। (গীতা ১১:৫৫)

আমার শরণাগত হও। 'মৎপরমো' হও, অর্থাৎ আগে আমি, পরে জগৎ — এটা জান। ঈশ্বরকে পেতে হলে এ-টির দরকার। Entire outlook change (সমগ্র দৃষ্টিকোণটি বদল) করতে হবে। আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২১ নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা দশমী, ২ দণ্ড। ১৩ পল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কমল কুটীরে শ্রীম

১

লিলি কটেজ। আপার সারকুলার রোড। ইহা জগদ্বিখ্যাত আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিবাসস্থল। ইনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল তিনি এই স্থানে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আজও ব্রাহ্ম ভক্তগণ এই স্থানকে পবিত্র তীর্থ মনে করেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে বহুবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সশিষ্য তপস্যারত কেশবকে দেখিতে জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে গিয়াছিলেন। সেবক হৃদয় মুখার্জী লইয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, এঁর লেজ খসেছে। তদবধি উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কেশবও বহুবার দক্ষিণেশ্বর ও কলিকাতায় ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। একবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে ভাগীরথীবক্ষে জাহাজে বিহার করেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যাইবার পূর্বে ১৮৭৫ হইতে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে অতি আপনার মনে করিতেন। অন্তরঙ্গরা যাইবার পরও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে কেশবের শরীর ত্যাগ পর্যন্ত সেই প্রেম অটুট ও অব্যাহত ছিল।

এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পূর্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ দুইবার কেশবকে দেখেন। প্রথমবার আদি ব্রাহ্মসমাজে চিৎপুর রোডে যুবক কেশব তখন ধ্যানরত ছিলেন। কেশবকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এর ফাত্না ডুবেছে। প্রায় সমাধির অবস্থা। দ্বিতীয় বার মিলন হয় ঠাকুরদের নৈনানের বাগানে। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তখন সেই বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐখানে লইয়া গিয়াছিলেন।

ঐখানে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিশ্বনাথ গোঁড়া ব্রাহ্মণ। মাঝে মাঝে 'শিবশিব কালীকালী' উচ্চারণ করিতেন। স্বামী দয়ানন্দ আমোদ করিয়া বলিয়াছিলেন, আরে 'সন্দেশ সন্দেশ' কর। তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। দেবদেবী মূর্তি মানেন না। উপাধ্যায়ের হয়তো মনে দুঃখ হইয়াছিল মুখে কিছু না বলিলেও।

কেশব সেন ও দয়ানন্দকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছিল। বিশ্বনাথ তখন দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — মহারাজ, আপনার এই অবস্থা হয়েছে কি? সত্যনিষ্ঠ দয়ানন্দ উত্তর করিলেন, না। পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়। শাস্ত্রে যা পড়েছি আজ এঁর ভিতর তা প্রথম দেখলাম।

কেশব ও দয়ানন্দ উভয়েই ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত। তাঁহারা মিলিত হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য পরামর্শ করিতেন।

কেশবের দ্বিতলের উপাসনাগৃহ অতি পবিত্র স্থান। এই কক্ষে কেশব অর্গল বদ্ধ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দীর্ঘকাল ঈশ্বরের অর্চনা করিয়াছিলেন। একবার কেশববাবুর পীড়া হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ রোগমুক্তির জন্য জগদম্বার নিকট ডাব চিনি মানত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন — মা কেশবের কিছু হলে, কলকাতায় গেলে, আমি কার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইব? তাঁকে ভাল করে দাও।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ কমল কুটীরে (লিলি কটেজে) গেছেন। সেই দিন ওখানে পশ্চিমী ধরণে 'পার্টি' হইতেছিল। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়া ঐ পার্টিতে লইয়া গেলেন। কিছু জলযোগও করাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবারের মত যান কমল কুটীরে কেশবের শেষ অসুখের সময়। দ্বিতলের বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া কেশবকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেশব অন্তঃপুরে শয্যাগত ছিলেন। খুব দুর্বল শরীর। দেয়ালে ভর করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, এ যাত্রায় শরীর রক্ষা হইবে না। বলিয়াছিলেন, 'তোমার কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে। তাই সব তোলপাড় করে দিচ্ছে।' কেশবের মা, ঠাকুরকে আশীর্বাদ করিতে বলিলেন যাহাতে কেশবের রোগমুক্তি হয়। ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমার আশীর্বাদ

করতে নেই। আমার যে মা আছেন।'

কেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর অন্ত নাই। তাই এই স্থান শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের নিকটও অতি পবিত্র তীর্থ।

ইতিপূর্বেও শ্রীম বহুবার ভক্তদিগকে কমল কুটীর দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কয়েকবার কেশববাবু তাঁহার নববিধান মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তাই নববিধান মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের নিকট যেমন প্রিয় ও পবিত্র, তেমনি এই লিলি কটেজ।

আজ এই লিলি কটেজে কেশবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কথকতা। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীম কয়দিন হইতেই ভক্ত সংসদে এই সংবাদ পরিবেশন করিতেছেন। আজ সদলবলে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বক্সী মোটরে করিয়া আচার্য শ্রীমকে লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম কমল কুটীরের সম্মুখে রাস্তায় মোটরে বসিয়া আছেন। ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আসিলে শ্রীম সদলবলে কমল কুটীরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম-র মুখমণ্ডল প্রসন্ন গম্ভীর, চক্ষু অন্তর্মুখীন।

শ্রীম বুঝি বা মনশ্চক্ষুকে পশ্চাতে ফিরাইয়া তাঁহার নিজের জীবনের স্মৃতি-আলেখ্য পুনদর্শন করিতেছেন। বাল্যকাল হইতে স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই কেশব ছিলেন শ্রীম-র 'হিরো'। বলিতেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করতো। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে *(বর্তমান নবম শ্রেণী)* পড়ি। তিনি তখন এলবার্ট হলে একটা ঘরে বসে বিলেতি মেলের চিঠি লিখছিলেন। গৃহদ্বার বন্ধ। তখন বাইরের একটা পিলারে চড়ে উঁকি দিয়ে তাঁকে দেখি। তারপর কলেজে পড়ার সময় এবং কর্মজীবনের প্রারম্ভে কেশব ছিলেন আমার উপাস্য। সর্বদা তাঁর বক্তৃতায় ও সার্‌মনে উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতাম। একবার টাউন হলে তাঁর বক্তৃতা হবে। তিন ঘন্টা পূর্বে গিয়ে বসেছিলাম। কেশববাবুর ধর্ম-বক্তৃতা আমার মন হরণ করত। কেন তাঁকে অত ভাল লাগতো এর কারণ বুঝতে পেরেছিলাম ঠাকুরকে দর্শনের পর। তখন বুঝতে পারি, কেশববাবুর বক্তৃতার উৎস ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাব ও বাণী তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত।

শ্রীম এই পবিত্র তীর্থে সদর ফটক দিয়া ভক্তসঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

পশ্চিম দিকে চলিতেছেন। ডান হাতের মোড়ে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, এমনি নভেম্বর মাসেই ঠাকুর এসেছিলেন রুগ্ন কেশববাবুকে দেখতে। এবার উত্তর দিকে চলিতেছেন। গাড়ী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর পূর্বমুখী হইয়া পূর্ব দিকের গেট দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন। সিঁড়িটি কাঠের। সংবাদ পাইয়া আচার্য প্রমথ সেন আসিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলের সভাগৃহ বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

পূর্ব-পশ্চিম লম্বমান গৃহ। মেঝেতে ফরাশের বিছানা। শ্রীম উত্তরের দেয়ালে পিছন দিয়া দক্ষিণাস্য বসিয়াছেন। শ্রীম-র ডান হাতে ডাক্তার, বাম হাতে ছোট নলিনী, আর পিছনে জগবন্ধু, ছোট জিতেন ও বিনয়। ইহাদের পিছনে বলাই, শান্তি, রমনী ও রজনী। তাহার পিছনে ভাটপাড়ার ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী, সঙ্গী বুদ্ধিরাম, গদাধর, শুকলাল ও বড় জিতেন।

শ্রীম-র মন অন্তর্মুখ। তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে এই ঘরে আসিয়াছিলেন। তাই বুঝি কেশব ও ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল ঠাকুর এই ঘরে বসিয়া কেশবকে বলিয়াছিলেন, তোমার অনেক কাজ। দক্ষিণেশ্বরে তত যেতে পার না। তাই আমিই খবর নিতে এলাম। তোমার অসুখের কথা শুনে মায়ের কাছে ডাব চিনি মেনেছিলাম।

শ্রীমকে দেখাইয়া কেশবের নিকট অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইনি (শ্রীম) কেন দক্ষিণেশ্বরে যান না। জিজ্ঞাসা কর তো গা। এদিকে ইনি অত বলেন সংসারে মন নাই।

শ্রীম কিঞ্চিদধিক এক মাস ঠাকুরের কাছে গিয়াছেন। এই প্রথম দর্শন। বলিয়াছিলেন, আসতে দেরী হলে আমায় পত্র দিবে।

এই ঘরে বসিয়াই 'সামাধ্যায়ী'র সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এর চক্ষু দিয়ে এর ভিতরটা দেখা যাচ্ছে — শার্শির দরজার ভিতর দিয়ে যেমন ঘরের সব জিনিস দেখা যায়।

সন্ধ্যার পর ত্রৈলোক্যের গান শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গান গাহিয়াছিলেন —

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥

গান গাইয়া কেশববাবুকে বলিয়াছিলেন —

কথা কইতে ডরাই, না কইলেও ডরাই।
মনে সন্দ হয় তোমা ধনে হারাই হারাই॥
আমরা জানি যে মন-তোর
দিলাম তোরে সেই মন্-তর
এখন মন তোর।

মানে, সব ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক। তিনিই সত্য আর সব অনিত্য। ঈশ্বরদর্শন না করিলে কিছুই হইল না।

২

কেশবের শেষ পীড়ার সময় তাঁহাকে শেষ দেখার জন্য ঠাকুর আসিয়াছিলেন — সঙ্গে শ্রীম, রাখাল ও লাটু মহারাজ ছিলেন, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর। ঠাকুর এই বৈঠকখানায় একখানা কৌচের উপর বসিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। বলিতেছেন, এই যে মা এসেছো, বারাণসী কাপড় পরে কি দেখাও? বসো গো বসো। হাঙ্গাম করো না।

এখানে ঐ কৌচে বসিয়াই ভাবাবস্থায় আবার বলিয়াছিলেন, দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। যেমন সুপারি আর তার ছাল, আলাদা। ঈশ্বরদর্শন হলে এইটে বোধ হয়।

এই সকল দেবদৃশ্য শ্রীম মানসপটে প্রত্যক্ষ করিতেছেন মগ্ন হইয়া। আবার দেখিলেন, কেশব অতি কষ্টে অন্তঃপুর হইতে দেয়ালে ভর করিয়া আসিয়া ফরাশের উপর বসিলেন আর অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হইয়াছিল। শ্রীম তাহার অনুধ্যান করিতেছেন।

ঠাকুর কেশবকে বলেছিলেন — যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণ নানা জ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞান হলে দেখে, সব এক, ঈশ্বর চৈতন্য। তিনিই চৈতন্য, তিনিই জগৎ।

মানুষে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ। মানুষের ভিতর সত্ত্বগুণী মানুষে

অধিক প্রকাশ। তা থেকে অধিক প্রকাশ যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে তাতে।

ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির প্রকাশ। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। এখানে তাঁকে বেশী দেখা যায়।

শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। যেমন সাপ। হেলে দুলে যখন চলে, তখন তাকে শক্তি কই। যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, তখন কই ব্রহ্ম। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যখন করে, তখন শক্তি। স্বরূপে থাকলে ব্রহ্ম।

সাধকের অবস্থায় 'নেতি নেতি'। ঘোল ছেড়ে মাখন নেয়। সিদ্ধাবস্থায় দেখে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

জগতের মা তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করেন। আর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যা চায় তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না।

ঈশ্বর ঐশ্বর্যের বশ নন। তিনি ভক্তের বশ। তিনি চান, বিবেক বৈরাগ্য, ভক্তি বিশ্বাস, ভাব প্রেম, এই সব।

যার যেমন ভাব সে ঈশ্বরকে তেমন দেখে। তমোগুণী ভক্ত পাঁঠাবলি দিয়ে পুজো করে। রজোগুণী নানা বস্তু দিয়ে পূজো করে, অনেক ব্যঞ্জন, ফল, মিষ্টি কত কি! সত্ত্বগুণী ভক্ত পূজো করে ফুল বিল্বপত্র গঙ্গাজলে। ফুল নাই, বিল্বপত্র দেয়। পায়েসও কখনো দেয়। আর ত্রিগুণাতীত ভক্ত পূজা করে ঈশ্বরের নামে। নাম করাই পূজা।

জ্ঞানাগ্নি, কামক্রোধাদি রিপুদের নাশ করে। তারপর নাশ করে অহংকার। তখন তোলপাড় আরম্ভ হয় — উন্মাদাবস্থা।

হাসপাতালে নাম লেখালে আসবার যো নাই যতক্ষণ রোগ না সারে। তেমনি যতক্ষণ না কর্মভোগ শেষ হয় ততদিন যাবার যো নাই। ঈশ্বর যেতে দিবেন না।

তোমার অসুখ হলে আমি খুব ভাবিত হই। আগের বারের অসুখে শেষ রাত্রে কাঁদতুম। বলতুম — মা, কেশবের কিছু হলে কার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কবো। কলকাতায় এসে সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি দিছলুম। মায়ের কাছে মানত করেছিলাম যাতে তুমি ভাল হও।

মানুষ আশীর্বাদ করবে কি? ঈশ্বরই সব করেন। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'।

ঈশ্বর দু'বার হাসেন। একবার যখন দু'ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে জমি

বিভাগ করে। আর একবার যখন ডাক্তার বলে, তোমার ছেলেকে আমি ভাল ক'রে দেব। ঈশ্বর মারলে কেউ বাঁচাতে পারে না।

কেশব, তুমি বাড়ির ভিতর বেশী থেকো না। মেয়েছেলেদের ভিতর বেশী থাকলে আরও ডুববে। ভক্তদের সঙ্গে থাকলে ঈশ্বরীয় কথা হবে। তাতে ভাল থাকবে।

কেশব খুব লোক! তাকে সকলে মানে। টাকাওয়ালাও মানে, আবার সাধুরাও। আমরা দয়ানন্দকে দেখেছিলাম নৈনানের বাগানে কেশবের আসার জন্য ঘর বাহির করছে।

বাড়ির সব স্থানে আলো রাখতে হয়। আলো না দিলে দরিদ্র হয়।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে অতীতের স্মৃতিতে নিমগ্ন। চক্ষু ও মুখের ভাবে বোঝা যায় — মন ঊর্ধ্বে।

কমল কুটীরের বৈঠকখানায় বহু লোক বসিয়াছে। সকলে কথকতা শুনিতেছে। কথক বসিয়াছে শ্রীম-র সম্মুখে উত্তরাস্য।

শ্রীম প্রমথবাবুর সহিত কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। কেশব সেনের পরিবার শ্রীম-র শ্বশুর বংশের আত্মীয়। প্রমথবাবু কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র। আর কেশব শ্রীম-র সম্বন্ধী।

কথা আরম্ভ হইল। কথকরা যেমন সব কথা ফেনাইয়া বলে তেমনি কথা হইতেছে। বলিতেছে, পৃথিবী বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। নারদ নারায়ণের কাছে এই কথা নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি ভক্তদের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব, কলিকাতার কলুটোলার সেন বংশে'। ঐ তিনিই কেশব, ইত্যাদি। কথায় ভক্তরা তেমন আনন্দ লাভ করিতে পারিল না। অতবড় একটা মহাপুরুষের জীবন। কত দৈবী ভাব প্রকাশ হইয়াছে। যদি সেগুলি বলিত তবে সুন্দর ও সত্য হইত। তাহা না করিয়া কল্পনার ছবি আঁকিয়াছে। তাহাতেই নীরস।

আটটার একটু পর শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সঙ্গে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিলেন।

কাছেই নিচের উপাসনাগৃহ (sanctuary), শ্রীম ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার। একজন ভক্ত দেশলাই জ্বালাইয়া শ্রীমকে পথ দেখাইতেছে। শ্রীম বাহির হইয়া উঠানে আসিলেন। তখন বাড়ির একজন

লোক হ্যারিকেন লইয়া আসিলেন। উনি শ্রীমকে পুনরায় মন্দিরে ডাকিয়া লইলেন। শ্রীম ঘরের সকল দ্রব্যাদি দর্শন করিতেছেন। দেয়ালে টাঙ্গান ছবি কয়েকটি আছে। প্রচারকদের সব নাম লেখা আছে। শ্রীম-র আদেশে জগবন্ধু প্রভৃতিরা ঐ সব নাম মুখস্থ করিতেছেন।

শ্রীম এবার পুকুর পাড়ে আসিলেন। ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া ভক্তদের বলিতেছেন, এখানে ভক্তগণ কত তপস্যা করেছেন। জাগ্রত হয়ে গিছলো এসব স্থান।

শ্রীম বাহিরে আসিতেছেন। ফটকের কাছে জয়গোপাল সেনের নাতি আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীম গিয়া মোটরে উঠিলেন। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার, বড় জিতেন ও বড় অমূল্য। অপর সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে গেলেন। জগবন্ধু, বিনয়, বুদ্ধিরাম, গদাধর প্রভৃতি মর্টন স্কুলে ফিরিলেন।

ভক্তগণ আসিতে আসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের অকৃত্রিম প্রেম সম্পর্কের কথা আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিলেন, কেশববাবু আমাদের পরম আত্মীয়। তিনিই প্রথম ঠাকুরকে তাঁর কাগজে প্রচার করেন। লিখেছিলেন, পরমহংসদেবের মত লোক জগতে নেই। তাঁকে কাঁচের আলমারীতে রাখা উচিত। তাঁর জীবনে যে সব সত্য প্রকাশিত হয়েছে এই সব হিন্দুদের চিরন্তনী ঐশ্বর্য। হিন্দুধর্ম মহান।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২২শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল।
শনিবার, কৃষ্ণা দশমী, ১ দণ্ড। ৪১ পল। একাদশী ৫৮ দণ্ড। ১৪ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

যে কেবল মাছের চক্ষু দেখে সে লক্ষ্য ভেদ করে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন পূর্ব দেয়ালের গায়ে পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র ডান হাতে ও বাম হাতে দুই সারি বেঞ্চে সামনাসামনি। তাহাতে বসিয়া আছেন ভক্তগণ।

আজ ২৩শে নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ, ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল। রবিবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী।

আলিপুরের পোস্টমাস্টার অমূল্য কয়েকজন সঙ্গী লইয়া আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন ছোট নলিনী, কিরণ, সীতানাথ, গদাধর ও বুদ্ধিরাম। তাঁহারা সেন্ট পল ক্যাথিড্রেল (লঙ সাহেবের গীর্জা) হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীম-র আদেশে সেখানে উপাসনায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তারপর আসিলেন নগেন চক্রবর্তী। ইনি বেদান্ত সোসাইটির সেক্রেটারী। সকলের শেষে আসিলেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও উকীল সূর্য আইচ। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের শাখা ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমের মহন্ত। শ্রীম সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামী অভেদানন্দজীর স্বাস্থ্যের কথা। আর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত টেকনিক্যাল কর্মকেন্দ্রের কথা।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর থাকতে অন্য কোনও কথা ছিল না। ফ্লাড্-রিলিফ, ফেমিন্-রিলিফ এইসব কিছুই ছিল না। খালি — এক কথা, ভগবানলাভ হয় কিসে।

অবতার চলে গেলেন তখন — flying at a tangent (উদ্দেশ্যের বাইরে চলে)।

তিনি বলতেন — মা কি জানেন না যে, ভক্তদের এ সবের দরকার

আছে।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, ঈশ্বর জানেন বিলক্ষণ, তোমার যা যা দরকার। তুমি কেবল তাঁকে ডাক।

Your Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the Kingdom of God and His righteousness; and all these things shall be added unto you.

তিনি সব জানেন। দেখ না, চন্দ্র সূর্যকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। জল করেছেন আবার। আজ তাই ভাবছিলাম, উঃ উঃ — জল না করলে সব দুর্গন্ধ হতো। আবার বাতাস। এক ঘন্টা বন্ধ হলেই চক্ষু স্থির। তিনি সব জানেন কি দরকার তোমার। তুমি কি করে তাঁকে পাবে তার চেষ্টা কর।

Your Father knoweth that ye have need of these things. But rather seek ye the Kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

আর এ দরকার, ও দরকার করলে দরকারের অবধি নেই।

তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে — পলিটিক্স, সমাজসেবা, কত কি।

একজন ভক্ত — গীতায় তো কর্মযোগের প্রশংসা রয়েছে।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।

(গীতা ৫:২)

শ্রীম — হাঁ। অধিকারী-ভেদে বলেছেন এই কথা — কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয় পক্ষেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্জুন কর্মযোগের অধিকারী। তাই তাঁর কাছে এর প্রশংসা করেছেন।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম — এই চারটেই পথ। যার যেটা করতে ভাল লাগে সে তাই করবে ঈশ্বরলাভের জন্য।

উদ্ধবকে বললেন, তুমি সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেও। আর বদ্রীনারায়ণে গিয়ে তপস্যা কর।

মা যার যা পেটে সয় সে ব্যবস্থাই করেন, ঠাকুর বলতেন।

'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগীনাম্' — (গীতা ৩:৩) 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' আছে। (গীতা ৪:৩৮)।

আরও আছে,

(১) ময্যেব মন আধৎস্ব (আমাতেই মন স্থাপন কর, গীতা ১২:৮)।

(২) অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং (অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পেতে ইচ্ছা কর, গীতা ১২:৯)।

(৩) মৎকর্মপরমো ভব (আমার কর্ম পরায়ণ হও, গীতা ১২:১০)।

(৪) সর্বকর্মফল ত্যাগং ততঃ কুরু (সকল কর্মের ফল ত্যাগ করো, গীতা ১২:১১)।

চারটে alternative (পক্ষ) দেখালেন। যে কোনও একটাতে কাজ হয়ে যাবে। কথাটা হচ্ছে, অধিকারী ভেদ। যার পেটে যা সয়, তাই কর। কিন্তু ব্যাকুল হতে হবে।

জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মী — ঠাকুর কাউকে ছাড়েন নাই। তবে বলেছিলেন, এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সুগম পথ। অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, মন চঞ্চল। এই সময় তাঁর শরণাগত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললে কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। ঠাকুর তাই বলেছিলেন। আর নিজেও এই পথে গিছলেন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কাল আমরা কমল কুটীরে ছিলাম। ঠাকুর সর্বদা ওখানে যেতেন। কেশববাবুকে বড় ভালবাসতেন। বলেছিলেন, তোমার (কেশবের) কথা মনে হলেই আমার মাথাটা কেমন হয়ে যায়। মানে, ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। কাল তাঁর জন্মোৎসব ছিল। কথকতা হলো। ঠাকুর বলেছিলেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম। ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম। মানে, সকলকেই নিচ্ছেন।

কথকরা কেউ কেউ খুব ভাল। খুব উদ্দীপন করিয়ে দেয়। কেউ কেউ অতিরঞ্জিত করে বড্ড বেশী। তাতে মূল জিনিসটা চাপা পড়ে। সত্যিকার জীবনটা ঢাকা পড়ে। কেশববাবুর জীবন এমনি কত উজ্জ্বল! কত মহান! তা নইলে ঠাকুর অত ভালবাসতেন? ডাব চিনি দিয়ে সিদ্ধেশ্বরীকে পূজো দিয়েছিলেন তার অসুখের সময়। শেষ রাতে উঠে কাঁদতেন। আর মাকে বলেছিলেন, মা কেশবের কিছু হলে কার সঙ্গে তোমার কথা কইব।

নববিধানে 'মা মা'-টা নিয়েছে ঠাকুরের কাছ থেকে। ম্যাক্সমূলার এটা ধরেছিলেন। হঠাৎ 'মা মা' কোত্থেকে এলো? ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পেরে বলেছিলেন, ঐটি ঠাকুরের কাছ থেকে এসেছে।

কেশববাবুকে দেখতে গিছলেন শেষ পীড়ার সময় ঐখানে কমল কুটীরে। আর শরীর গেলে কেঁদেছিলেন। তিন দিন চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, মা কেন আমায় ভক্তি দিয়ে এদের সঙ্গে বাঁধলে! অধর সেনের শরীর গেলেও ঐরূপ করেছিলেন। তিন দিন বিছানায় পড়ে ছিলেন আর কেঁদে কেঁদে ঐ কথা বলেছিলেন — ভক্তি দিয়ে কেন বাঁধলে! নইলে যে অবতার-লীলা হয় না। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে লীলা করেন।

জগবন্ধু — কাল কমল কুটীরে দেখলাম, ওখানে গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী — এসব দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে।

শ্রীম — বটে, সব লাল হো জায়েগা।

২

শ্রীম (স্বামী কমলেশ্বরানন্দের প্রতি) — পাঁচ বৎসর তাঁর সঙ্গ করলাম কিন্তু একদিন দেখলাম না অন্য কথা কইতে। এখনি শুনতে পাচ্ছি কত।

সর্বদা বলতেন, আগে তাঁর দর্শন কিসে হয় তার চেষ্টা কর। তারপর যা ইচ্ছা তাই কর। একেবারে straight to the point (একেবারে সোজাসুজি লক্ষ্যে)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যে বীর বলছে, কেবল পাখীর চক্ষু দেখছি, সেই পারবে (হাস্য)। দ্রোণ বললেন একজনকে, তুমি কি দেখছো? সে উত্তর করলো, রাজন্যবর্গ, বৃক্ষাদি, আপনাকে। বললেন, না তুমি পারবে না। আর একজনকে বললেন, তুমি কি দেখছো? বললে, মাছ, রাজ্যন্যবর্গ, আপনাকে। বললেন, না, তোমার দ্বারাও হবে না। অর্জুনকে যেই বলা হলো, তুমি কি দেখছো? উনি বললেন, আমি খালি মাছের চক্ষু দেখছি। তখন দ্রোণ বললেন, হাঁ, এ পারবে।

লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা হচ্ছিল। নিচে পাত্রে জল, ওপরে শূন্যে মাছ। জলে প্রতিফলিত মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যের দক্ষিণ চক্ষু ভেদ করতে

হবে। অর্জুন শুধু মৎস্যের দক্ষিণ চক্ষু দেখেছিলেন। তাই কৃতকার্য হলেন লক্ষ্যভেদে।

তেমনি এক লক্ষ্য কিসে তাঁকে লাভ হয়, ঠাকুরের এই কথা।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীমও ভক্তদের diameter (ব্যাসরেখা) পথে নিয়ে যাচ্ছেন — ঠাকুরের নূতন ব্যবস্থা।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।' একটা পড়ো মন্দির ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ শাঁকের ধ্বনি শুনে সকলে দৌড়ে গেল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। একজন ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, ভিতরে ঠাকুর নেই! পদো খালি শাঁক ফুঁকছে। তখন ঐ কথা বললে — মন্দিরে তোর নাইকো মাধব, পদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।

তাই আগে মাধব প্রতিষ্ঠা কর হৃদয়ে। তারপর অন্য সব।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — এক একবার ঠাকুর বলতেন, আমার সঙ্গে কারো মিলে কি? আবার বলতেন, অচেনা গাছ আছে একরকম — শুনেছ কি? তাকে চিনতে পারে না কেউ — অবতারকে! তাই গীতায় আছে,

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরমভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম।।' (গীতা ৯:১১)

তিনি ধরা না দিলে ধরতে পারে না কেউ তাঁকে।

শ্রীম (নগেনের প্রতি) — একদিন ভক্তরা আলোচনা করছে কিসে ছেলেদের চরিত্র ভাল হয়। ঠাকুর শুনতে পেয়ে অমনি ধমক।

আর একদিন অশ্বিনী দত্তের বাপ ব্রজমোহনবাবু ঠাকুরের ঘরে বসে পাঁচমিশেলী সব কথা কইছেন। শুনে ঠাকুরের সহ্য হয় নাই ঐসব কথা। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিছুকাল পর সমাধি থেকে নেমে এসে বললেন, জোড় হাত করে — বাবা, ওসব কথা বলো না। এসব আমার সহ্য হয় না। এখানে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কও। ব্রজবাবু তখন ক্ষমা চেয়ে বললেন, প্রভো, এখন জানতে পারলেন তো আমাদের রোগ কি। এখন ঔষধ দিন।

ব্রজবাবুর নামে বরিশালে কলেজ হয়েছে। জজ ছিলেন। তখন

সবেমাত্র retire (অবসর গ্রহণ) করেছেন। ঠাকুর তাঁকে খুব ভালবাসতেন কিনা। তাই কাছে রেখে দিছলেন তিন দিন।

ওখানে অন্য কথা হবার যো নাই। খালি কিসে ঈশ্বরলাভ হয়, এই সব কথা। চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরের কথা। কখনও নাম-গুণগান, কখনও ভজনকীর্তন, কখনও শাস্ত্রপাঠ! নিচে থাকলে এই সব নিয়ে থাকতেন। নইলে সর্বদা সমাধিস্থ। অন্য কিছু হবার যো নাই। হলে ছট্‌ফট্ করতেন যেন ড্যাঙ্গায় মাছ।

শ্রীম (স্বামী কমলেশ্বরানন্দের প্রতি) — অবতার এসে বললে তবে লোকের চৈতন্য হয়। তাঁর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। তা না হলে শুনবে কে? এক কান দিয়ে ঢোকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়। যদি বা শোনে তবুও ধারণ করতে অর্থাৎ ধরে রাখতে পারে না। মানে, ঐ কথামত জীবন গঠন করতে পারে না।

আদেশ পেলে তখন সকলে শোনে। ক্রাইস্ট যখন বলতেন, তখন বড় বড় 'ডক্টর' অবাক হয়ে যেতো। 'ডক্টর' মানে, ধর্মাচার্যগণ। অবাক হয়ে যেতো, আর বলতো, কোথা থেকে এই শিশু এই সব কথা পেল! সে তো লেখা পড়া জানে না! কিন্তু সে যেন একজন মহাচার্যের মত কথা কয় — He taught them as one that had authority.

নগেন — তবে স্বামীজী কেন আমাদের কাজ করতে বলছেন?

শ্রীম — স্বামীজী কি কেবল কাজের কথাই বলছেন? জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগের কথা বলেছেন। সব কথাই বলেছেন। যার যা পেটে সয় সে তাই নেবে! যার কর্মযোগে রুচি সে তাই নিক্। ঠাকুরের এক কথা, কিসে ভগবানলাভ হয় তাই করা।

গুরূপদিষ্ট কর্ম করলে নিষ্কামভাবে, তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দর্শন হয়।

ব্যাপকভাবে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম — এ সবই কর্ম। সবই নিষ্কামভাবে করতে হয়। গীতায় আছে 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ' (গীতা ১৮:৪৮)। 'সহজং কর্ম' মানে প্রকৃতিগত কর্ম। যার প্রকৃতিতে যা আছে সে তদনুসারে কর্ম করবে।

আর একটা আছে প্রত্যাদিষ্ট কর্ম। সে-টি করে ঈশ্বরদর্শনের পর

লোকশিক্ষার জন্য। যেমন, স্বামীজীর কর্ম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে স্বামীজী বলেছিলেন, আমি শুকদেবের মত সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই। এটা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি। কিন্তু ঠাকুরের আদেশে করেছেন কর্ম অন্য সব লোকশিক্ষার জন্য।

৩

ব্যষ্টি আর সমষ্টি। 'ব্যষ্টি' মানে ব্যক্তিগত। আর 'সমষ্টি' মানে বহুর জন্য, সমাজের জন্য। যাঁরা জগৎগুরু আচার্য তাঁদের এই দু'টোই করতে হয়। কিন্তু আগে ব্যক্তিগত কর্মদ্বারা নিজের পথ দৃঢ় করে তখন সমষ্টির জন্য কর্ম করা। তা নইলে কোনটাই হবে না।

ঠাকুরের ভক্তরা সকলেই প্রথমে নিজ নিজ ভাবে তাঁর কৃপায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে সমাজের কল্যাণার্থ লোকশিক্ষা-ব্রত নিয়েছেন।

ঠাকুর মানা করেছিলেন স্বামীজীকে রাখালের সঙ্গে অদ্বৈত ভাবের কথা বলতে। স্বামীজীকে বলতেন অখণ্ডের ঘর। স্বামীজী কালী মহারাজের ভাব বদলিয়ে দিছলেন। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, এটা কি করলি?

কর্ম তো লোক করবেই। 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ' (গীতা ৩:৫)। কর্ম না করে মানুষ থাকতে পারে না। আবার বলছেন, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং' (গীতা ৩:৮)। এখানে কর্ম ব্যাপকভাবে বলছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বলেছেন ঐ — 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ' (গীতা ১৮:৪৮)।

গুরু উপদেশ দেন শিষ্যের প্রকৃতি দেখে। একজনকে বললেন, তুমি ধ্যান জপ কর। একজনকে বললেন, তুমি আমার সেবা কর। একজনকে বললেন, তুমি তীর্থ ভ্রমণ কর। একজনকে বললেন, তুমি ঘরে গিয়ে গৃহস্থধর্ম পালন কর। সকলেরই কল্যাণ হবে যদি নিষ্কাম বুদ্ধিতে করো। সকাম করলেই কর্ম-বন্ধনে পড়ে যাবে।

ঠাকুরের উপদেশ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোকের জন্য — সর্বত্যাগী অর্থাৎ যোগী-সন্ন্যাসী, আর যোগী-ভোগী অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এক শ্রেণী সিধে চলছে আদর্শের দিকে। অপর শ্রেণী চলছে একটু ঘুরে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের বলেছেন সর্বদা প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গ করতে। নইলে পথভ্রষ্ট হওয়ার

সম্ভাবনা।

নগেন — আমার প্রকৃতি চাইছে ভক্তিযোগ। গুরু বলছেন, কর্মযোগ করতে। কোন্‌টা করবো?

শ্রীম — গুরুর কথাই পালন করা উচিত। তারপর তাঁকে বলা যেতে পারে যুক্ত করে, নিজের ইচ্ছার কথা। আন্তরিক হলে, তিনি তার প্রকৃতির মত রাস্তায়ই তাকে চালাবেন। গুরু সর্বদা কল্যাণ চিন্তা করেন। আর শিষ্যের প্রকৃতির পথেই চালিত করেন। তবে কখনও, কিছুকালের জন্য, ভিন্ন পথেও চালাতে পারেন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। যে শরণাগত তার সব ঠিক হয়ে যায়।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের ঐ এক কথা, কিসে তাঁকে লাভ হয় সেই চেষ্টা। তাই সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে ঈশ্বরলাভ হয় সে পথে নিয়ে যান। তিনি চান ব্যাকুলতা। ব্যাকুল ভক্তের জন্যই তাঁর আগমন বিশেষ করে। এই জন্মেই চাই তাঁকে। বলতেন, ছেলের হিস্যা বাপ দিয়ে দেয় যদি তাকে ব্যাকুল দেখে — আহার বিহার বন্ধ করে দেয়। আর একটা পথ আছে —

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ৬:৪৫)। এটা ঠাকুর পছন্দ করতেন না।

ব্যাকুল হয়ে চাইলে তিনি দেন। তাঁর জন্য পাগলের মত হয়ে গেলে তিনি ধরা দেন। নির্জনে গোপনে কাঁদলে, শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে, তিনি দেখা দেন। এই সব ঠাকুরের কথা।

ক্রাইস্টও এই কথাই বলেছেন — Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. (St. Matthew 7:7)

শ্রীম কিছুকাল নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কাশীপুরে বলেছিলেন, 'আরো কিছুদিন থাকলে আরো গোটা কয়েক লোকের চৈতন্য হতো। তা মা রাখবেন না। নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর সব কথা সকলকে বলে দিচ্ছি, তাই নিয়ে যাচ্ছেন'।

বড় অমূল্য — তা হলে বোঝা যায়, আরও কিছু ছিল বলবার। বলে গেলে ভাল হতো।

শ্রীম (সহাস্যে) — সে কি আপনার ইচ্ছায় হবে? এই যে চন্দ্র, সূর্য দেখছি, এই জল বায়ু, বিশ্ব চরাচর — এ সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। তাঁর ইচ্ছায় চলছে। 'স ঐক্ষত, বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' (ছান্দোগ্য ৬:২:৩) — বেদের কথা। তিনিই সব হয়েছেন। তিনি কি কারো সঙ্গে পরামর্শ করে করেন?

একজন ভক্ত — তিনি ইচ্ছা করে অচৈতন্য করে রাখেন কেন?

শ্রীম — তাঁর দু'টো ডিপার্টমেন্ট আছে — বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। অবিদ্যামায়ায় এইসব হচ্ছে। সবের যদি চৈতন্য হয়, তবে এই সংসার চলে কি করে?

শ্রীম বিভোর হইয়া মহামায়াকে প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন গানে —

গান। মা প্রসীদ গুণময়ী প্রপন্নে।
বিরিঞ্চি-শরণ্যে, ত্রিলোকমান্যে,
অনন্য গতি মম ত্বং বিনে।
ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম আচ্ছাদনী,
মহামায়া রূপে ত্রিজগত মনোমোহিনী
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী দেহি পদাশ্রয় এ জঘন্যে।
ত্বং সর্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ত্বদন্যৎ, ত্বং পরাৎ পরতরং।
ত্বঞ্চ বিদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞানদা সুমতিদায়িনী মা, মতিহীনে।

শ্রীম — এইসব তাঁর গান। এতে বলা হয়েছে — তিনি ভালও করেছেন আবার মন্দও করেছেন।

খ্রীস্টধর্মেও এই ভাবটি আছে। ক্রাইস্ট প্রার্থনা করছেন — 'And lead us not into temptation, but deliver us from evil'. (আমাদিগকে মায়ায় ফেলো না। কুপথ থেকে রক্ষা কর।)

তা হলে বোঝা যাচ্ছে তিনি — temptations-ও (কুপথে যাবার প্রবৃত্তি) দেন। (St. Matthew 6:13 & St. Luke 11:4)

তাই তো ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না মা'!

গীতাও বলেছেন, 'দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া' (গীতা ৭:১৪)। তাই প্রার্থনা, না ভুলান!

খেলা যে চলে না, না ভুলালে। ঠাকুর বলতেন, খেলনা দিয়ে যেমন শিশুদের মা ভুলিয়ে রেখে সংসারের সব কাজ করেন, তেমনি জগতের মা-ও ভুলিয়ে রাখেন। নচেৎ জগৎ চলে না। যে এ খেলায় বিরক্ত হয়ে যায়, আর কাঁদে মা মা বলে, তাকে কোলে তুলে নেন। তখন তার খেলা শেষ হয়ে যায়।

যদি কেউ চায় অচৈতন্য না হতে, তবে প্রার্থনা করা — মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৪শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৫৭ দণ্ড। ৩ পল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঠাকুরের ভাবের অববাহিকা কেশব

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম-র চারতলার শয়নকক্ষ। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন। বাম দিকে বেঞ্চেতে বসা ভক্তগণ — বিনয়, ডাক্তার বক্সী, জগবন্ধু, রজনী প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন শুকলাল, বলাই প্রভৃতি। খড়গ্‌পুর হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন। আর আসিয়াছেন ভুবন মাইতি। ইনি কলেজে পড়েন, থাকেন নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারাশ্রমে। কিন্তু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। শ্রীম গতকল্য প্রচারাশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে কেশব সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তগণ উৎসব করিতেছেন। কাল 'ল্যান্টার্ন লেক্‌চার' ছিল। বিষয় ছিল, History of the Brahma Samaj (ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস)। বক্তা, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী।

প্রচারাশ্রমে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যগণ থাকেন, প্রমথ সেন প্রভৃতি। ইহা রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে স্থাপিত, মির্জাপুর স্ট্রীটের অদূরে। শ্রীম-র সঙ্গে অনেকগুলি ভক্ত গিয়াছিলেন, যাঁহারা নিত্য তাঁহার কাছে আসেন। রাজা রামমোহন রায়ের তীর্থভ্রমণ, এইটিই প্রথম আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু।

আজ ২৭শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা প্রতিপদ ৩৭ দণ্ড ৪৬ পল।

আজ শ্রীম একটু অসুস্থ — সর্দি হইয়াছে। গতকাল রাত্রিতে প্রচার আশ্রম হইতে ফিরিবার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর মর্টন স্কুলেও ল্যান্টার্ন লেকচার হইয়া গিয়াছে। বক্তা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। বিষয় ছিল প্রথম দিন — কলেরা ও যক্ষ্মা। শ্রীম কিছুক্ষণ ভক্তসঙ্গে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া দেখিয়াছিলেন।

তারপর নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে যান। সেখানে কেশববাবুর জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। শ্রীম সর্বদাই কেশবচরিত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত মধুকরের ন্যায় আহরণ করেন। সেই লোভেই সর্বদা যাতায়াত করেন। উনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত কেশবের ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হয়।

২৫শে নভেম্বরের বিষয় ছিল pox (বসন্ত)। শ্রীম সমগ্র আলোক-চিত্রটি দেখিয়াছেন দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া ভক্তসঙ্গে। আগামী ২৯শে নভেম্বরও মর্টন স্কুলে আলোক-চিত্র দেখান হইবে, বিষয় ম্যালেরিয়া।

শ্রীম অসুস্থ বলিয়া বিছানায় বসিয়া আছেন চারতলার ঘরে। ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভুবনের প্রতি) — আমরা কেন অত যাই নববিধান সমাজে? কেশববাবুর ভিতর ঠাকুরের শক্তি প্রবেশ করেছে। কত দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। ঠাকুরও তাঁকে দেখতে যেতেন। কত ভালবাসা তাঁর সঙ্গে। আমরা অন্তরঙ্গরা যাবার পূর্বে ঠাকুরের সমগ্র প্রেমের পাত্র ছিলেন উনি।

আহা, ঠাকুর বলতেন, ও (কেশব) দৈবী মানুষ। ওকে দেখলে আমার মাথার ভিতর, যেমন হাঁড়িতে টগবগ করে, তেমনি হয়।

ডাক্তার বক্সী — এর মানে কি?

শ্রীম — মানে, খুব উদ্দীপন হতো। Nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী) সেই ভাব ধারণ করতে পারতো না। এই আর কি। ঠাকুর এ অবস্থাকে বলতেন মহাবায়ু।

একজন ভক্ত — ব্রাহ্ম ভক্তরা স্বীকার করতে চান না, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে ঋণী তাঁর ধর্মজীবনের পূর্ণতার জন্য।

শ্রীম — সত্য স্বয়ং প্রকাশ, যেমন সূর্য স্বয়ংপ্রকাশ। কাজেই অপরের স্বীকার করার উপর নির্ভর করে না। না তো অস্বীকারে কিছু হানি হয়।

পিতার ধনে যদি কেউ ধনী হয় সে কি বলে বেড়ায় একথা? আমরা অপরের কথা শুনবো না, নিজে চোখে দেখেছি দু'জনকেই। আর তাঁদের দৈবী সম্পর্ক। দশটি বৎসর ধরে এই ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছেন। অবতারের এক ক্ষণের কৃপারই মূল্য নিরূপণ হতে পারে না। আর এই দশ বছরের ভালবাসা!

কেশববাবুর শরীর ত্যাগের পর তাঁর মা কেশববাবুর একটি ছেলেকে নিয়ে কাশীপুরে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিছলেন। ঠাকুর অসুস্থ। তথাপি ছেলেটিকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে লাগলেন। শরীর গেলে তিন দিন বিছানা থেকে উঠেন নাই। — কেঁদে কেঁদে বলছিলেন — মা, কেন এই স্নেহ দিয়ে বেঁধেছ? কেশববাবুর নিজের লেখা পড়ে দেখনা কি বলেছেন; উনি নিজেই লিখেছেন, জগতের মধ্যে অমন মানুষ আর নাই এখন। এঁকে কাঁচের আলমারির ভিতর রাখা উচিত। অথবা, তুলোর ভিতর যেমন আঙ্গুর রাখে তেমনি রাখা উচিত। এতেই বোঝা যায় ঠাকুরকে কি চক্ষে দেখতেন কেশববাবু।

ভুবন — একজন ব্রাহ্ম ভক্ত আছেন একটুতেই অস্থির হয়ে যান, বড় sentimental (ভাবপ্রবণ)।

শ্রীম — sentimental হবে বৈকি। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র। এই বলিয়া শ্রীম সম্পূর্ণ গানটি গাহিতেছেন।

*গান। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর।।
প্রেমিক এমনি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন,
ও সে হাস্য মুখে সদাই থাকে হৃদয় জুড়ে সুধাকর।।
প্রেমিক চায় না কো জাতি চায় না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ, হয়না ক্ষুণ্ণ রট্‌লে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকলে কেন অন্য ডর।।
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, কিছু বেদ বিধি ছাড়া,
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া;
আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর।।

* ঠাকুর নিম্নলিখিত রূপে গাহিতেন।
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
তার থাকে না গো আত্মপর।।
প্রেমিকের চালটি বেয়াড়া বেদ বিধি ছাড়া,
আঁধার ঘরে চাঁদ এলেও দেয় না গো সাড়া
চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর।।

শ্রীম — এই সব ব্রাহ্ম-সমাজের গান। ত্রৈলোক্য সান্ন্যালের রচনা। ঠাকুর গাইতেন এই সব গান। ঠাকুরের অবস্থা দেখে ত্রৈলোক্যবাবু গান রচনা করতেন। আর তাঁকে শোনাতেন।

গান। মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দুই এক জনা।
সে ভাবে হাসে প্রেমে নাচে, উজান পথে করে আনাগোনা।।

গান। গৌর রূপ সায়রে সাঁতার তুলে, তলিয়ে গেল আমার মন,
আর ফিরে না এলো। ইত্যাদি।

২

সর্দির খুব প্রকোপ। শ্রীম গরম জামা পরিয়া ও র‍্যাপার জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। পা লেপে ঢাকা। শুকলাল পরে প্রবেশ করিয়া খাটের পশ্চিম দিকে বসিয়া আছেন একটি টুলে পূর্বাস্য। এ-কথা সে-কথা হইতেছে। ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা পাঠিয়েছেন জানতে, কি খাবেন — দুধ-চিঁড়ে, কি দুধ-রুটি। বলিলেন, 'দুধ-রুটি'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'উজান পথে' মানে ঈশ্বরের পথে। সংসারের পথে নয়। সংসার তার কাছে অনেক পরিমাণে মিথ্যা বোধ হয়েছে। কাজেই ঈশ্বর নিত্য এতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। সমাধির অবস্থা। সমাধির পর এই হয়। গৃহে থাকলেও সকলের ভিতর দেখে ঈশ্বরকে। তাই অন্য দিকে মন নেই; ঈশ্বরে বিলগ্ন।

ঠিক ঠিক দাসীর মত নিজের ঘরে থাকা এই অবস্থায় হয়। এই সব গানে ঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন। এই অবস্থায় আন্তরিক ও শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ চায়। এক স্থানে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল। ঘাড়টি বেঁকে গিছলো। কেউ ঘরে নাই। পরে এই গানটি গেয়েছিলেন। বাবুরাম সর্বাবস্থায় ঠাকুরকে ছুঁতে পারতো। বলেছিলেন, এর হাড় তক শুদ্ধ। এই অবস্থায় দরদী চাই। সংসারের লোক বুঝতে পারে না তাঁর অবস্থা।

'তলিয়ে গেল আমার মন' মানে, সমাধিস্থ হয়ে গেল। গোপীদের অবস্থা। সগুণ সমাধি, সাকার সমাধি প্রথমে। তারপর মহাভাবে সব একাকার। ঠাকুরেরই অবস্থা। নিজের অবস্থা নিজে গেয়ে ভক্তদের শোনাতেন। ভক্তরা হাঁ করে চেয়ে থাকতো যদি বুঝতে পারে ভিতরে কি হচ্ছে তাঁর। তাই তিনি নিচে নেমে নিজের অবস্থা এই সব গানে বলতেন।

যতদিন রূপ রসকে ভালবাসে ততদিন এ অবস্থা হয় না। একটু trace (দাগ) থাকলে ভোগের, এ সব অবস্থা হয় না। যখন মনের মনত্ব বিলুপ্ত হয় — when the mind is stripped of its sensuous nature — তখন হয় এই অবস্থা। এটি তাঁর কৃপাসাপেক্ষ।

একটি ভক্ত (স্বগত) — কেশব সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীম-র কয়দিন ভাবান্তর চলছে। ঠাকুর ও কেশবের প্রেম সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে মন বুঝি চাইছে ঘরে ফিরে যেতে, নুনের পুতুল সমুদ্রে বিলীন হতে। চাবি যে ঠাকুরের হাতে! যদিও ঠাকুরের কৃপায় অন্তরঙ্গগণ ওপারের আস্বাদ পেয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া যে একেবারে ঘরে ফিরে যাবার উপায় নাই। শ্রীমকে ঠাকুর বলেছিলেন, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া — তোমার মায়ের এইটুকু কাজ করতে হবে। সেই 'এইটুকু' শেষ না হলে যাবার উপায় নেই।

আবার এখন শরীরের অসুস্থতাও এইরূপ ফিরে যাবার উদ্দীপনের অন্যতম কারণ। ঠাকুর শ্রীমকে বলেছিলেন, তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। এই শরীর যে তাঁর (ঠাকুরের নিজের)। বৃদ্ধ বয়সে দেহকষ্ট হলেও দেহ ছাড়ার উপায় নেই পার্ষদদের।

শুকলাল — ঠাকুরের পার্ষদরা তো সব মুক্ত পুরুষ ঠাকুরের কৃপায়। তাঁরা তো ইচ্ছা করলে দেহ ছেড়ে দিতে পারেন। তাহলেই তো রোগ ও বার্ধক্যের যন্ত্রণা শেষ হতে পারে।

শ্রীম — পার্ষদরা পারে না। তারা সদা মুক্ত। তাদের আগমন জগতের কল্যাণের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য। তিনি যখন ছেড়ে দিবেন কেবল তখনই দেহ ছেড়ে মুক্ত হয়। তাদের আগমন লোকশিক্ষার জন্য। সে কাজ শেষ না হলে যাবার যো নাই। স্বামীজী বলেছিলেন, এই দশটা বছর আমায় নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদরের মত নাচিয়েছেন। আমি তার কি করবো?

অবতার-লীলাটির ব্যাপার অন্যরূপ। ভক্তগণ, পার্ষদগণ সাধারণ জীবের মত নয়। তিনি ছুটি দিলে তখন মুক্তি।

পরের দিন। মর্টন স্কুল। শ্রীম-র শয়নকক্ষ। শরীর অসুস্থ তাই বিছানায় বসিয়া আছেন। বিছানার দক্ষিণের বেঞ্চেতে বসা বিনয় ও ছোট জিতেন। অন্তেবাসী তখন তাঁহার কুটীরে রান্না করিতেছিলেন, সকাল সাড়ে সাতটায়। সাড়ে আটটায় তিনি শ্রীম-র ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্বে শ্রীম যাহা ভক্তদের বলিয়াছিলেন তাহাই পুনরায় অন্তেবাসীকে বলিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ভাগবতে কি কথাই বলেছেন ভগবান সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে। বলেছেন, একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ব্রজের গোপীগণ আর যজ্ঞপত্নীগণ কেবলমাত্র আমার সঙ্গ দ্বারা, আমার প্রতি গাঢ় প্রেমে আসক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র কৃষ্ণকে ভালবেসে তাদের এই অবস্থা লাভ হয়েছে।

উদ্ধবকে বৈরাগ্য উপদেশ দিচ্ছেন। বললেন, সংসারের সকল কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে তপস্যা করতে বের হয়ে যাও। আর প্রকারান্তরে বলছেন, আমায় ভালবাস, তা হলে সহজেই eternal life (অমৃতত্ব) লাভ করতে পারবে।

গোপীদের নজির দিলেন। ওরা গ্রাম্য, মূর্খ। সংস্কারহীন, ত্যাগ-বৈরাগ্যহীন, তবু যোগীগণের অগম্য স্থান লাভ করেছে — কেবল আমাকে একনিষ্ঠভাবে ভালবেসে।

গোপীদের অবস্থা উদ্ধবকে বলছেন — আমি মথুরায় চলে গেলে আমার কথা ভাবতে ভাবতে তাদের দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল। আশেপাশের ঘরবাড়ি লোকজন তাদের চক্ষুতে পড়তো না।

উদ্ধব পণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী ভক্ত। জ্ঞানী বিচার করে যা পায়, যোগী ধ্যানে যাকে লাভ করে, গোপীরা আমায় ভালবেসে সেই দুর্লভ অবস্থা লাভ করেছিলেন। কেবল আমার চিন্তা দ্বারা যোগীদের মত দেহ ও জগৎ ভুল হয়েছিল। উদ্ধবকে তাই বলছি, আমার চিন্তা কর।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন উদ্ধবকে। তিনি শাস্ত্রাদি পড়েছেন। বললেন, নদী সাগরে গেলে সাগর হয়ে যায়। তেমনি গোপীগণ আমার চিন্তা ক'রে কৃষ্ণময় অর্থাৎ, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন।

বিশ্বাস হয় না সহজে। তাই বুদ্ধিতে আরূঢ় করবার জন্য বার বার নানা উপায়ে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, গোপীদের মত আমার চিন্তা কর।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরও ভক্তদের বলেছিলেন, 'তোদের বেশি কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে, এটা জানলেই হবে।' আবার স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আমার চিন্তা কর , তা হলেই হবে'। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ প্রেম সমাধি'।

একজন ভক্ত — গোপীরা কৃষ্ণকে জারবুদ্ধিতে ভালবাসেন। উপপতিকে যেমন ভালবাসে তেমনি। কি করে তা হলে তাদের ব্রহ্মানন্দ লাভ হলো?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, 'লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে।' আর কৃষ্ণ তো জানতেন আমি ঈশ্বর। গোপীরা নাই বা জানলেন। সমস্ত জগৎ ভুলে নিজের দেহ, ঘর বাড়ি, আত্মীয় কুটুম্ব, সব ভুলে কৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন।

ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, গোপীদের না নেও, কিন্তু তাদের টানটা নেও। কৃষ্ণের জন্য এত টান যে জগৎ ভুলে গেলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ঠাকুরের ভক্তরাও কেউ কেউ তাঁকে ভাবতে ভাবতে রামকৃষ্ণময় হয়ে গিছলো।

মেরি ম্যাকডেনালও সর্বদা ক্রাইস্টকে ভেবে ভেবে ক্রাইস্ট হয়ে গিছলেন।

এটি সহজ পথ। অবতার আসেনই সহজ পথে ভক্তদের নিয়ে যেতে। কতগুলিকে আচার্য বানিয়ে যান। তারা আবার অপরদের আচার্য বানাবে।

ভক্তদের পক্ষে এ পথ খুব সহজ ও স্বাভাবিক। অবতারকে ভালবাসলে ভগবানকেই ভালবাসা হল। তা হলেই কাজ হয়ে গেল।

৩

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন, পুনরায় কথা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই দেহকে বলা হয়েছে 'তরণী'। আর গুরু 'কর্ণধার'। গুরু মানে অবতার, ঈশ্বর। তরণী পাওয়া গেল আর কর্ণধার পাওয়া গেল। যে তরণী পেয়েও পায় না তাকে বলে আত্মঘাতী। অর্থাৎ সে নিজেকে নিজে নাশ করে।

চেষ্টা চাই। পুরুষকার চাই। কর্ণ ধরে গুরু বসে আছেন। অর্থাৎ হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে আছেন। আবার অবতার ঠাকুর রয়েছেন। একটু চেষ্টা করা চাই। দুই এক পা চল না। তিনি এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। এ সব তাঁর প্রতিজ্ঞা। বড় chance (সুযোগ) এখন।

শ্রীম পুনরায় নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একবার মা-ঠাকরুন বেলুড়ে আছেন — শ্মশান ঘাটের কাছে একটা ভাড়াটে বাড়িতে। আমরা যাচ্ছি তাঁর কাছে। গঙ্গা পার হব। যে মাঝি সর্বদা পার করে সে ছিল না। তার নাম ছিল ডোরা। অন্য একজন মাঝি বললো — উঠুন, পার করে দি। ডোরা নাই তাতে কি? উঠে পড়লাম, সেও পার করে দিলো। সেই রাত্রিতে আর এলাম না।

কি টান! কে যেন টেনে নিয়ে যেতো।

একজন ভক্ত (স্বগত) — দেহ তরণী, গুরু কর্ণধার। ব্যাকুল হলে গুরু পার করে দেন। অর্থাৎ সংসারসমুদ্র থেকে উঠিয়ে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। এরই দৃষ্টান্তস্বরূপই কি নিজের জীবনের এই ঘটনাটি বললেন?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেউ মুখস্থ করে তো বেশ হয় — (ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়)। সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য। (বিনয়ের প্রতি) দশ মিনিটে পার? না হয়, এক ঘন্টা লাগবে। গদাধর থাকলে মুখস্থ করে ফেলতো।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — পড়ুন তো এই অধ্যায়টা — সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

অন্তেবাসী পড়িতেছেন আর শ্রীম মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম — এটা আবার পড়ুন।

অন্তেবাসী — ন বোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।

যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম॥

(শ্রীমদ্ভাগবৎ - ১২:১-২)

শ্রীম — ভগবান বলছেন, সৎসঙ্গ আমাকে যেমন বশীভূত করে তেমন আর কিছুতেই হই না। আবার সৎসঙ্গের জন্য আন্তরিক স্পৃহা জাগ্রত হলে তা অন্য সকল প্রকার স্পৃহাকে বিনাশ করে দেয়। আন্তরিক সৎসঙ্গ কে চায়? যার মনে অশান্তি। শান্তির আধার ঈশ্বর। ঈশ্বরের চিন্তায় শান্তি। যেখানে শান্তি সেখানেই যথার্থ সুখ।

ঠাকুর বলেছেন যার কাছে বসলে, যার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে, কেবল ঈশ্বরের কথা মনে হয় — মনে হয়, ঈশ্বর সত্য সৎসঙ্গ অনিত্য, তিনি সৎ। তাঁর সঙ্গ করা চাই।

অন্য কোনও উপায়, অন্য কোন বস্তু, চিরস্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। তাই সৎসঙ্গ চাইলে, সৎসঙ্গ করলে, ইহা সব বাসনা নাশ করে দেয়।

ঠাকুর বলেছিলেন, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তাকে এখানে আসতে হবে। আর বলেছিলেন, যে আন্তরিক এখানে আসবে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো, মা।

ব্রত নিয়মাদিতেও হয় কতক শান্তি। তা সাময়িক। কিন্তু সৎসঙ্গে শান্তি permanent (স্থায়ী)। কারণ সৎসঙ্গ সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইয়ে দেয়।

উদ্ধব জ্ঞানী, ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁকে গোপীদের কথা বললেন। ইতিপূর্বেও গোপীদের কাছে পাঠিয়ে দিছলেন। বললেন, গোপীরা আমাকে ভালবেসে জগৎ ভুলে গিছলো। যোগীরা বহুকাল যোগ করে, ব্রত নিয়মাদি পালন করে, যে পরমব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হয়, গ্রাম্য, অসংস্কৃত, অশিক্ষিত স্ত্রীগণও সেই পদ প্রাপ্ত হয়েছিল কেবলমাত্র আমার সঙ্গে বাস ক'রে, আমায় সমগ্র মনটা দিয়ে ভালবেসে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) —

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥

শ্রীম — ঠাকুরের কথা — নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্র হয়ে গেল। তেমনি গোপীরা কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণময় হয়ে গেল। তারা জগৎ ভুলে গেল। মানুষের শরীর যে অত প্রিয় তা-ও ভুলে গেল।

আর ভুলে গেল আত্মীয় কুটুম্ব, ইহকাল পরকাল, সব। সমুদ্রে যেন নদী মিলে গেল। মানে, সমাধির সময়ে মুনিরা যেমন পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায় তেমনি অবস্থা গোপীদের হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গ দ্বারা। ঠাকুর বলেছিলেন, তেলাপোকা (আরশোলা) কুমরে পোকা হয়ে যায় কুমরে পোকাকে ভাবতে ভাবতে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ শেষ হইল।য়

৪

শ্রীম — অর্জুনকে বলেছিলেন, অন্য সব ছেড়ে আমার শরণ লও, 'মামেকং শরণং ব্রজ'। আমার কথায় চলো। উদ্ধবের কাছেও সেই কথাই বললেন, 'মামেকমেব শরণমানং সর্বদেহিনাম্ যাহি...'

কি বিচিত্র খেলা তাঁর! উদ্ধব অতকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রইলেন। তাঁকে এখনও 'যোগেশ্বরেশ্বর' বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই বলছেন, তোমার এই অভয়বাণী শুনেও আমার মন সংশয়যুক্ত। এর কারণ, এই দেহবুদ্ধি — ঠাকুর বলতেন, কর্তাগিরি। মায়ার এই খেলা। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতেন সর্বদা মানুষভাবে — 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

অর্জুনকে বললেন, এখন সংসারে থাক আমার উপর ভার দিয়ে। কর্ম কর। কর্মসন্ন্যাস তোমার পক্ষে এখন উপযোগী নয়। আর উদ্ধবকে বললেন, সর্ব কর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নেও আর আমার চিন্তা কর। তাই যার যা পেটে সয়। কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস — দুই-ই সত্য অবস্থা ভেদে, অধিকারী ভেদে।

এই অহংকারটা তিনিই রেখে দেন। তবেই তো সংশয়। তা দিয়ে কিছু কাজ করান। অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করালেন, আর উদ্ধবকে দিয়ে তপস্যা করালেন।

শরীর থাকলেই মন আছে। মন থাকলে সংশয় আছে। সংশয় যায় সমাধিতে — ঈশ্বরদর্শন হলে। কিন্তু নিচে এলেই মায়ার এলাকা। সংশয় আসবে। সিদ্ধ পুরুষের সংশয় হালকা হয়ে যায় সংসারে মন থাকলেও। আত্মদর্শন যার হয় নাই তার খুবই মুস্কিল। তখন গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে থাকতে হয়।

কি প্রহেলিকা! সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। বললেন, আমি পরমব্রহ্ম।

তথাপি পুরো বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই বললেন, বদরীনারায়ণ যাও। আমার চিন্তা কর। তা' হলে সংশয় দমিত হবে। কর্মে থাকলে বাড়বেই।

ঠাকুরের ভক্তদেরও এই অবস্থা। সকলকেই, অন্তরঙ্গদের — তাঁর স্বরূপ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম দেখিয়েছেন। তথাপি সংশয়। তবে এটাতে তাঁদের কিছু করতে পারে না। আর, কিছু করলেও 'আমি'-টা যতদিন থাকে, ততদিন। শরীর ত্যাগে সম্পূর্ণ মুক্তি।

ছোট জিতেন (বিনীতভাবে) — কয়েকদিন ধরে মনটা স্থির করতে পারা যাচ্ছে না — কত দিকে দৌড়াচ্ছে।

শ্রীম (সহানুভূতির সহিত) — ভয় কি, গুরু (ঠাকুর) আছেন। এমন মানব জন্ম, আর এই ভেলা। গুরু কর্ণধার। ভেলাও পাওয়া গেছে আর কর্ণধারও পাওয়া গেছে। ভয় কি? পাকা কর্ণধার — পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর বলেছিলেন, মনে মাঝে মাঝে মেঘ উঠবেই — যেমন আকাশে ওঠে। ওঠে আবার যায় — এ তার স্বভাব। দেহ যে রয়েছে। তার ধর্মই এই। ভয়ের কোন কারণ নেই।

মেঘ উঠলেই নদীতে মাল্লারা সাবধান হয়। আবার মেঘ কেটে গেলে তখন বসে তামাক খায়। কখনও নৌকো ডুবেও যায়। তখন life belt (ভেলাবিশেষ) ধরে। ঠাকুর সেই life belt। নদীও তিনি। ভেলাও তিনি। কর্ণধারও তিনি। মেঘও তিনি। ঝড়ও তিনি।

যদি বল, জলে কুমীরের ভয় আছে। তার ঔষধও বলে দিয়েছেন — 'বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছুঁবে না তার গন্ধ পেলে'।

এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ থাকায় আজ সারা দিনই নিজের ঘরে রহিয়াছেন। ভক্তগণ আসিয়া শ্রীম-র ঘরের পাশের পার্টিসানের ঘরে বেঞ্চেতে বসিয়াছেন — ডাক্তার, ছোট জিতেন, বিনয়, বলাই, ডাক্তারের ভাগিনেয়, জগবন্ধু প্রভৃতি। বড় জিতেন আসিয়া বসিলেন সিঁড়ির ঘরে দরজার পাশে চেয়ারে।

শ্রীম-র অসুখ। তথাপি তিনি দ্বিতলের শৌচাগারে যাইবেন। কাহারও কথা শুনিবেন না। মঠ হইতে মহাপুরুষ মহারাজ অন্তেবাসীর দ্বারা একবার বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন — শ্রীম যেন শৌচাদি উপরেই সম্পন্ন করেন। তিনি এ ব্যবস্থা মানিলেন না। সবিনয়ে বলিলেন, ওঁরা সব সাধু, সর্বদা আমাদের কল্যাণ চিন্তা করেন। এইটুকু তো — চারতলা থেকে দোতলায়।

শ্রীম দ্বিতলে যাইতেছেন। ভক্তদের মধ্যে পাছে অন্য কথা হয়, তাই অন্তেবাসীকে ভাগবত পাঠ করিতে বলিয়া গেলেন। অন্তেবাসী পড়িলেন ব্রহ্মাকৃত দেবীর স্তব — স্বর্ণ-পুরী দর্শন। এক ঘন্টা পড়া হইল।

শ্রীম এক ঘন্টা হইল দ্বিতলে খাইতে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাহাতে অতিষ্ট হইয়া পড়িলেন — কেন আসিতেছেন না ভাবিয়া।

শ্রীম শৌচান্তে উপরে উঠিবেন, তখনি আসিলেন স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী নিখিলানন্দ। তাঁহাদের লইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া। সম্প্রতি নিখিলানন্দ পশ্চিম-ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে ঠাকুরের জীবন ও বাণী অনেক বড় বড় আশ্রমেও আলোচিত হয় অতি শ্রদ্ধা সহকারে। গুজরাটের লোকেরা ঠাকুরের ভক্ত। কথামৃত গুজরাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ঠাকুরের ইংরাজী জীবনচরিতে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনদর্পনে আমরা ভগবানকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই। ঈশ্বরত্বের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধু অতি উৎসাহের সহিত বলিতেছেন, শ্রীম বালকের ন্যায় কৌতূহলে শুনিতেছেন। শেষে অতি আনন্দে বলিলেন, সব লাল হো যায়েগা। মানে, ভারতের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাতে রঞ্জিত হইয়া যাইবে। বলিলেন, শুধু কি ভারত? অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িবে। ঠাকুর নিজের ছবি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, পরে এই ছবি ঘরে ঘরে পূজিত হইবে। কি আশ্চর্য, দিনে দিনে তাই হইতে চলিয়াছে। কে বলিতে পারে এ কথা, ঈশ্বর ছাড়া?

রাত্রি নয়টা। ভক্তগণ খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছেন দ্বিতলের পশ্চিমের হল ঘরে। তারপর সকলে বসিয়া আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন — ছোট নলিনী, রজনী, বলাই, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, লক্ষ্মণ প্রভৃতি। শ্রীম-র নির্দেশে ভক্তগণ মাঝে মাঝে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু প্রেমপূর্ণ আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীম বলেন, এইসব আনন্দোৎসবের প্রবর্তক স্বয়ং ঠাকুর। ভক্তদের দিয়া তিনি মাঝে মাঝে এইরূপ উৎসব করাইতেন। কেন করাইতেন তাহা কে বলিবে? স্বয়ং তিনিই জানেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ২৮শে নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ।
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল। শুক্রবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, ৩১ দণ্ড।৪৮ পল।

ষোড়শ অধ্যায়

কল্পতরু তীর্থে

১

কাশীপুর উদ্যান। এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দশমাস বাস করিয়াছিলেন রোগশয্যায়। এখানেই যুগবিপ্লবকারী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘ সংগঠিত হয় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে। এখানেই তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে বিলীন হন মহাসমাধিতে।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ কথামৃতকার শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিম্নতলে। সঙ্গে ডাক্তার কার্তিক বক্সী, বিনয় ও জগবন্ধু। গৃহটি দ্বিতল। উপরের হলঘরের পশ্চিম দেয়ালের গায়ে মেঝেতে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের রোগশয্যা দক্ষিণশিয়রী।

পাঁচ মিনিট হয় শ্রীম ফটকে মোটর হইতে অবতরণ করিয়াছেন। রাস্তা দিয়া না গিয়া সম্মুখের মাঠ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাসনা, আজ আবার এই পবিত্র উদ্যানভূমি পরিক্রমা করিবেন। আর দ্বিতলের পুণ্য পাদপীঠ দর্শন ও প্রণাম করিবেন। শ্রীম সর্বদা বলেন, ভবিষ্যতে জগতের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের শান্তি সুখের মিলন-মন্দির হইবে এই পবিত্র পাদপীঠ। অযোধ্যা ও দ্বারকা, জেরুজালেম ও কুশিনারা যেমন ভক্তগণের পুণ্যতীর্থ, তেমন এই কাশীপুর উদ্যান। এখনও ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ভক্তগণ এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে আসিতেছেন।

যুগবিপ্লবের এই পুণ্যতীর্থ দর্শনমানসে শ্রীম মর্টন স্কুল ছাড়িয়াছেন অপরাহ্ন তিনটার সময় ডাক্তারের মোটরে ভক্তসঙ্গে। হৃদয় প্রিয়দর্শনের আশায় পরিপূর্ণ।

আজকাল এই উদ্যানে একজন আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ভদ্রলোক বাস

করেন। তিনি নিচে নামিয়া ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে একান্তে কথা কহিতেছেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ডাক্তার শ্রীমকে বাংলায় বলিলেন, এঁদের পাদ্রী আপত্তি করছেন ছবি রাখতে। কয়দিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা বৃহৎ ছবি উপহার দেন। ঐখানা উপরের হল ঘরের পশ্চিম দিকের দক্ষিণ দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল ঠিক ঠাকুরের শিয়রের উপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কাছে বন্ধ দরজার উপর।

ব্যাপার সুবিধার নয় ভাবিয়া শ্রীম আরও একটু অগ্রসর হইলেন। আর সাহেবের হাতে এক কপি — Gospel of Sri Ramakrishna Part I (কথামৃত, প্রথম ভাগ) উপহার দিলেন। বলিলেন, May we have a look around (আমরা কি উদ্যানটি বেড়িয়ে দেখতে পারি)? সাহেব উত্তর করিলেন, Oh yes (নিশ্চয়)।

শ্রীম ঠাকুরের নিবাসমন্দির পরিক্রমা করিতেছেন। মন্দির ডান হাতে। অগ্রে শ্রীম, পশ্চাতে সাহেব ও ভক্তগণ, উত্তর দিকে যাইতেছেন। নিম্নতলের হল ঘরটি দেখাইয়া বলিলেন, Here the devotees would gather together (ভক্তগণ এখানে সম্মিলিত হইতেন)। উত্তর দিকের রন্ধনশালা দেখাইয়া বলিলেন, Here our Holy Mother would prepare food and diet for the Master (এখানে আমাদের মা-ঠাকরুন ঠাকুরের জন্য খাদ্য ও পথ্য প্রস্তুত করিতেন)।

শ্রীম পূর্বদিকে চলিতেছেন। ডান হাতে মন্দির-গৃহ। নিম্নতলের উত্তর-পূর্ব কোণের প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন, In this chamber the Holy Mother lived (এইটি ছিল মায়ের শয়ন মন্দির)।

শ্রীম পূর্বদিকে চলিতেছেন — সম্মুখে কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ। উত্তর-পূর্ব দিকের একটি গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, এ-টি ছিল অশ্বশালা। Here the disciples practised austerities (এই ঘরে ভক্তগণ তপস্যা করিতেন)। পূর্বদিকের ঘরটি দেখাইয়া বলিলেন, Here one day the would-be Swamis, forgetting the external world, danced in joy divine. And on their lips was a song on Shiva, the symbol of complete renunciation, the ideal of the sannyasins. They were then filled

with the fire of renunciation of the worldly enjoyments.

The song described Shiva dancing in the joy of His own self living in the cremation grounds, signifying full and perfect renunciation although, He was the Lord of the Universe. It was just then composed by the would-be Swami Vivekananda, their leader. They were then only with 'coupinam' (loin-cloth) on.*

শ্রীম গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন —

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।**

শ্রীম এইবার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের এই ক্ষুদ্র ঘরে আসিয়াছেন। আবার খানিকটা দক্ষিণে গেলেন। তারপর পূর্ব পুকুরের দক্ষিণের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, Here we used to sit in hot days (এখানে গরমের দিনে আমরা এসে বসতাম)।

শ্রীম এই ঘাট হইতে উদ্যানের বড় রাস্তার দিকে আসিতেছেন। আবার পূর্বমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন আর পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে একটা ঝোপ ছিল। এই বার বড় রাস্তায় আসিয়াছেন। এইখানে

---

*এই ঘরে একদিন, যাঁহারা সর্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবেন তাঁহারা জগৎ ভুলিয়া গিয়া দিব্যানন্দে নিত্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠে ছিল, সর্বত্যাগের প্রতীক সন্ন্যাসীদের আদর্শ শিবের স্তুতি। তাঁহাদের হৃদয় মন ছিল তখন বৈরাগ্যের প্রদীপ্তানলে পূর্ণ।

গানটিতে বলা হইয়াছে বিশ্বের প্রভু শিব ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতেছেন। তিনি বাস করেন শ্মশানে। ইহার অর্থ এই, শিব সর্বত্যাগী, সম্পূর্ণত্যাগী। এই গানটি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নেতা, ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহাদের পরিধানে মাত্র কৌপীন।

** তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা বম্ বম্ বাজে গাল,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

উদ্যানের অধিবাসী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে রাস্তা ধরিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন। রাস্তার মোড়ে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি বৃক্ষ আছে। এইটি একটি প্রাচীন স্মৃতির বাহক। ইহার গায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের বায়ুস্পর্শ রহিয়াছে। শ্রীম বুঝি তাই সেটিকে সশ্রদ্ধ স্পর্শ করিলেন আর প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। বৃক্ষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিল তাই শ্রীম-র প্রিয় মিত্র।

শ্রীম বলেন, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। বৃক্ষাদি দেবতা ও ঋষিগণের ছদ্মমূর্তি। অবতারলীলা সম্ভোগের জন্য তাঁহারা এখানে দাঁড়াইয়া আছেন নিজেদের স্বরূপ গোপন করিয়া।

শ্রীম রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল। মন অন্তর্মুখীন, চক্ষু ছলছল। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, এই turning-এ (মোড়ে) কত কাণ্ড হয়ে গেছে। একদিন বুঝি ঠাকুরের শরীর একটু ভাল ছিল। উপর থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছিলেন। তখন বিকেল বেলা। সেই দিন ছিল ১লা জানুয়ারী। ছুটির দিন, তাই কলকাতা থেকে অনেকে এসেছেন — গিরিশাদি ভক্তগণ। সকলে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইলে একে একে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া। ঠাকুর বলিলেন, 'তোমরা চৈতন্য হও' (তোমাদের চৈতন্য হউক)। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিতেছে অমনি ভক্তদের হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আর তাহাতে ইষ্টদর্শন করিয়া আনন্দে অভিভূত হইল। কেহ কেহ অন্য লোকেদেরও ডাকিয়া আনিল। তাহাদেরও এই অবস্থা হইল। শ্রীম-র নয়ন স্থির, মন অন্তরে নিবদ্ধ।

ঠাকুর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন শ্রীম আজও অভিভূতের মত সেই পুণ্যভূমি উভয় হস্তে স্পর্শ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলেন সেই পবিত্র রজ। ভক্তগণও আজ একে একে ভগবচ্চরণস্পৃষ্ট পরম পবিত্র সেই ভূমিখণ্ডে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতে লাগিলেন আর ঐ দৈবীচরণরজ শিরে ধারণ করিলেন।

শ্রীম কিছুকাল নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ফটকের দিকে চলিতেছেন। মোটরের পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্লান হাস্যে

বলিলেন, তাই তো ব্যন্নটা নষ্ট করে দিলে দেখছি। ঐসব বলাতেই ওরা (পাদ্রীরা) ভয় পেয়েছে পাছে বিগড়ে যায়। তাই তো এতো cold reception (প্রাণহীন অভ্যর্থনা)। তা না হলে, আমরা যখন thanks (ধন্যবাদ) দিচ্ছিলাম উদ্যান পরিক্রমার পর, অন্যরকম ভাব না হলে বলতো, উপরে চলুন সে দিনের মত, আর উপরে নিয়ে যেতো।

২

সাহেব ডাক্তার বক্সীর পেশান্ট, চিকিৎসাধীন। কিছুদিন পূর্বে ডাক্তার সাহেবকে বলিয়াছিলেন, উপরের হলঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দেখাইয়া — এই স্থানে অন্তিম সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই ক্রাইস্ট ছিলাম। সাহেব সরল-বিশ্বাসী, ভাল লোক। একদিন ডাক্তার ঠাকুরের একখানা বড় ছবি আনিয়া দিলেন। সাহেব সযতনে ঐ ছবিখানা উপরের হলঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দক্ষিণের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দিলেন।

সাহেব খ্রীস্টভক্ত। তাহাদের পুরোহিত আসিয়া এই ছবি ওখানে টাঙ্গান দেখিয়া আপত্তি করিয়াছে। আর সাহেবের মুখে যখন শুনিল ক্রাইস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ এক, রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই ঐ ছবি দূর করিতে আদেশ দিল। গোঁড়া খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করে — Christ is the only begotten son of the Father. ক্রাইস্টই জগতে একমাত্র অবতার। আর কেহ অবতার হইতে পারে না, কখন হইবেও না।

এই জন্য আজের এই cold reception, প্রাণহীন সম্বর্ধনা। সাহেবের ভয়, পাছে সামাজিক শাসনের অপ্রীতিকর কবলে তাহাকে পড়িতে হয়। তাই ডাক্তারকে অনুরোধ করিয়াছে ছবিখানি ফিরাইয়া লইতে।

একসঙ্গে একদিনে বহু ভক্তের আত্মদর্শনের মহাতীর্থে শ্রীম দুঃখিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডাক্তারকে বলিতেছেন, এসব স্থানে কি preacher (প্রচারক) হয়ে আসতে আছে, learner (শিক্ষার্থী) হয়ে আসতে হয়।

আর বললেই বিশ্বাস হবে কেন? কথায় শ্রদ্ধা কখন হয়? শ্রদ্ধা হয় যখন ভালবাসা পায়। ভালবাসা না পেলে কথায় শ্রদ্ধা হবে কেন?

তিনি (ঠাকুর) কতরকম করে ভালবেসে তবে নামাতেন আসরে। বললেই কি কথা নেবে?

মনে হচ্ছে — যে ভাব দেখছি — এই হয়তো last (শেষ) দেখা। তাই পা নড়ছে না।

শ্রীম পুনরায় ফিরিয়া গেলেন কল্পতরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শপবিত্র ঐ মহাতীর্থস্থলীতে। স্বাভাবিক প্রসন্ন প্রশান্ত গম্ভীর শ্রীম-র মুখমণ্ডলে বিষাদের বেদনার ছায়া পড়িয়াছে! ভক্তরা ভাবিতেছেন, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদও আজ বিরহ-বিধুর। শরীর থাকিলে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই কাহারও।

সপ্ততিবর্ষীয় শ্রীম ঐ কল্পতরুস্থলীতে লুটাইয়া পড়িলেন। বারংবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। ভক্তগণও তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন। দুঃখাভিভূত হইয়া দশ মিনিট নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলেন — প্রিয়জনকে ছাড়িয়া যেমন মন যাইতে চায় না শ্রীম-র অবস্থাও তদ্রূপ। জন্মের মত প্রিয়জন-বিয়োগ ব্যথায় শ্রীম আজ ক্লিষ্ট।

ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে শ্রীম মোটরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন — দৃষ্টি উদ্যানের দিকে। বুঝি বা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবচক্ষুতে জীবন্ত দর্শন করিতেছেন।

ফটকে আসিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীম বলিতেছেন, The last and lingering look! জনমের তরে এই অন্তিম অচঞ্চল দর্শন। আর হয় কিনা কে জানে!

শ্রীম আসিয়া মোটরে উঠিলেন। ব্যথিত কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, ব্যন্ননটা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।

অন্তেবাসী বলিলেন — এতো সাধুসঙ্গ করেও লোকের হয় না। আর একবার মুখের কথাতেই নিয়ে নেবে?

শ্রীম বলিলেন — হাঁ, অবতার এসেও পারে না। আর এ তো....।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা,
৩০শে নভেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার। শুক্লা চতুর্থী, ২০ দণ্ড। ১৬ পল।

সপ্তদশ অধ্যায়

মাধবী পীঠ — শ্রীরামকৃষ্ণ ও তোতাপুরী

১

মোটর চলিল দক্ষিণেশ্বর। এখন অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটা। শ্রীম বসিয়াছেন পশ্চাতে, ডান হাতে; বাম হাতে ডাক্তার। বিনয় ও জগবন্ধু বসিয়াছেন সম্মুখে চালকের পার্শ্বে।

মোটর চলিতেছে বরাহনগরের দিকে। বাম হস্তে কাশীপুর শ্মশান, গঙ্গাতটে। এই মহাতীর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। শ্রীম যুক্ত করে এই স্থান লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন। গাড়ী আরও অগ্রে চলিল উত্তর দিকে। বামদিকে এক স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই বুঝি ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ি। পুষ্করিণীর ঘাট দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, এই memorable (চিরস্মরণীয়) ঘাট। কতদিন গলদঘর্ম, রৌদ্রে আসতে আসতে — এখানে বিশ্রাম করেছি।

ভাগবত আচার্য শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ।

গাড়ি বরাহনগর বাজারে প্রবেশ করিল। উহা ছাড়াইয়া আলমবাজার আসিতেছে। শ্রীম বলিলেন, যাঁদের আশ্রয়ে থেকে প্রথমে ঠাকুরের দর্শন লাভ হয়েছিল তাঁদের বাড়ি দেখাব। গাড়ী চলিতেছে। শ্রীম বলিলেন, ঐ দেখুন, ঈশান কবিরাজের বাড়ি। ইনি ছিলেন আমাদের বড় ভগ্নিপতি। ঠাকুরকে চিকিৎসা করতেন। তাঁর প্রিয়।

গাড়ী এতক্ষণে আলমবাজারের মঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীম বলিলেন, এই দেখুন, আলমবাজার মঠ। আমেরিকা থেকে এসে এই মঠে স্বামীজী ছিলেন।

ডাক্তার সন্দেশ আনিতে গেলেন।

গাড়ী আবার চলিল। এতক্ষণে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বড় ফটকে দাঁড়াইল।

শ্রীম বলিলেন, এখান থেকে হেঁটে গেলে হয়। ভক্তরা বলিলেন, ওখানেও যায়। শ্রীম বলিলেন, তা হলে আর এসব স্থান দেখা হবে না। শ্রীম চটিজুতা পরিয়া গাড়ী হইতে নিচে অবতরণ করিলেন।

শ্রীম ধীরে পশ্চিম দিকে চলিতেছেন। তাঁহার গায়ে ঢিলা হাতা ধূসর বর্ণের ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। দুই স্কন্ধের উপর দিয়া ভাঁজ করা একখানা ভাগলপুরী চাদর ঝুলিতেছে। পরনে সাদা পাড় ধুতি। পায়ে কাল চটি জুতা। শ্রীম অভিভূতের মত চলিতেছেন। মন ভিতরে প্রবিষ্ট। গাজীতলার বটবৃক্ষটিকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে।

কুঠী বাম হাতে রাখিয়া উত্তরের দিকে চলিতেছেন। কুঠীর পাশে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া মা কালীর মন্দিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন যুক্ত করে। তারপর হাঁসপুকুরের পূর্ব পাড় দিয়া পূর্বমুখী চলিলেন আম বাগানের ভিতর দিয়া পায়খানার পুকুরে। শ্রীম-র গমন পথের বাম দিকে বাগানের ভিতরে রন্ধন করিতেছে তিন বন্ধু। ইহারা আজ পিক্‌নিক্ করিতেছে। শ্রীম বলিলেন, এরা বেশ করছে। অনেকক্ষণ এখানে থাকা হবে এই চড়ুইভাতির উপলক্ষে। আর তাতে এখানকার বাগান, পুকুর, ঘাট, রাস্তা সব দেখে দেখে মনে এর দাগ লেগে যাবে। পরে এর কথা মনে হলেই, ঠাকুর আর মা কালীর কথা মনে পড়বে। ঠাকুর ভক্তদের দিয়ে মাঝে মাঝে এসব করাতেন। সঙ্গে খাওয়াটি থাকলে মনে দাগ লাগে বেশী। মনটাকে ভগবানের দিকে নেবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করতেন ঠাকুর। ভক্তরা এলেই কিছু খেতে দিতেন। এতে দু'টি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। একটি, এই খাওয়ার কথা মনে থাকবে। খালি উপদেশ মনে থাকে না। আর দ্বিতীয়, অজ্ঞাতভাবে ঠাকুরের উপর ভালবাসা হবে। মন বলবে, উনি আমায় ভালবাসেন। নইলে খেতে দিবেন কেন! এই স্মৃতিটি তাকে রক্ষা করবে, সাহস দিবে মনে, সংসারসমুদ্রে যখন হাবুডুবু খাবে।

ঠাকুরের প্রত্যেকটি কাজ লোকশিক্ষার জন্য, এটা তাঁর নিজ মুখের কথা। ছোটবড় নাই, তাঁর সব কাজই পবিত্র ও লোককল্যাণকর।

তিনি বলতেন, এখানকার চিন্তা করলেই ঈশ্বরের চিন্তা করা হলো। আমার ধ্যান করলেই ঈশ্বরের ধ্যান করা হলো। বলতেন, মা, আমি তো

দেখি তুমিই সব। দেহ, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, সব তুমি।

একবার একজন ভক্তকে দিয়ে বলে পাঠালেন আর এক ভক্তের কাছে কলকাতায় হরিতকিবাগানে। 'যাও ওকে বলে এসো আমার ধ্যান করলেই হবে।' যাকে বললেন তিনি যুক্তিবাদী। তাই তার সামনেই বলছেন, আচ্ছা মা, আমি কি অন্যায় করলাম একথা বলে? আমি তো দেখছি, এখানকার সব ছেয়ে আছ তুমি — দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার চব্বিশ-তত্ত্ব, সব। তাঁর মত আর কে হয়, বল? অদ্বিতীয় পুরুষ।

এখন শ্রীম হাঁসপুকুরের পূর্ব পাড় ধরিয়া উত্তরের দিকে চলিতেছেন বেলতলায়। এইটি ঠাকুরের তন্ত্রসাধন পীঠ। ব্রাহ্মণী এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে দিয়া চৌষট্টি তন্ত্রের সাধন করাইয়াছিলেন এইখানে।

শ্রীম দক্ষিণ দিক হইতে বৃক্ষকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন বেদীর উপর দিয়া। তারপর বৃক্ষকে ডান হাতে রাখিয়া পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। বেদীর পূর্বধারে মধ্যস্থলে ভূমিতে পড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এইস্থলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীম বেদীর উপর বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তখন এখানে জঙ্গল ছিল। বাহির হইতে কিছু দেখা যাইত না। ধ্যানান্তে সবিস্ময়ে শ্রীম দেখিলেন ঠাকুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। হৃদয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছিলেন চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে বাহিরে দণ্ডায়মান দর্শন করা মানবজীবনের অতি বড় অমূল্য সম্পদ। অতি ভাগ্যবানেরই অদৃষ্টে এই দৈব সুযোগ ঘটে। শাস্ত্রে আছে, ভক্তপ্রবর ধ্রুবের সম্মুখে ঠিক এই ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন নারায়ণ। শ্রীম-র মুখমণ্ডলে আনন্দ জমাট বাঁধিয়াছে। তিনি তিনবার বেদী পরিক্রমা করিলেন। তারপর বেদীর উপর উত্তর-পূর্ব কোণে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীম-র পশ্চাতে বিল্ব বৃক্ষ। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন — ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু।

এইবার উঠিয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীম-র ডান হাতে ঝাউতলা, তারপর গঙ্গা। ঝাউতলায় যাইবার রাস্তার মোড়ে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। এইস্থান হইতে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন কিছু দীর্ঘ সময় — উত্তর পশ্চিমাস্য।

এবার পঞ্চবটী। পুরাতন বটবৃক্ষ-বেদিকার উত্তর-পশ্চিম দিকের সিঁড়ির নিচে জুতা ছাড়িয়া দিলেন। তারপর উত্তরের সিঁড়ি হইতে চারি হস্ত পূর্বদিকে অর্থাৎ বেদিকার দুইটি কোর্ট ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় কোর্টের উপরের বেদীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছেন। ইহারই দক্ষিণে বেদিকার উপর বটবৃক্ষমূলে উত্তরাস্য হইয়া ঠাকুর ধ্যান করিতেন। কত দেবদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন ঐখানে। কত দর্শন স্পর্শন আলাপনের দিব্য বিলাস করিয়াছেন ঐ স্থলে। এই স্থল জাগ্রত জীবন্ত আজও। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমকে এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন প্রায় একমাস ব্যাপিয়া। বলিয়াছিলেন, এখানে কত দর্শনাদি হয়েছে। ওখানে থাকা তো ভাল! বড় উদ্দীপনার স্থান। শ্রীম-র আসন হইয়াছিল ঠাকুরের ধ্যান কুটীরে, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিলাভের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত জাগ্রত জীবন্ত-স্থলীতে। শ্রীম কবি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নহবতের দ্বিতলে আসন স্থাপন করিবেন। উপর হইতে গঙ্গা দর্শন হইবে ভাল, তাই। কিন্তু ঠাকুর অনুমোদন করিলেন না। বলিলেন, পঞ্চবটীতে তো ভাল। সেখানে কত তপস্যা হয়েছে। কত দর্শন হয়েছে। শ্রীম তাই ভক্তদের বলিয়া থাকেন এখানে তপস্যা করিতে। বলেন, এখানে অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বলেন, পঞ্চবটী, বিল্বতল, ঠাকুরের ঘর, মা কালীর মন্দির, নাটমন্দির — এসব স্থলে বসে ধ্যান করতে হয়। এসব স্থান যেন শুকনো দেশলাই।

এখন শ্রীম পুরাতন বটবৃক্ষ-বেদিকাকে ডান হাতে রাখিয়া পরিক্রমা করিতেছেন নির্বাক, নগ্নপদে। ভক্তগণ পশ্চাতে। বেদিকার পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পুনরায় বেদীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম-র পশ্চাতে গঙ্গা।

শ্রীম বেদিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে সিঁড়ির নিচে কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে ঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত পঞ্চবটীর বেদীর উপর বসিয়া ভক্তগণ কি পাঠ করিতেছেন। শ্রীম সঙ্গী ভক্তদের বলিলেন, আপনারা শুনুন না গিয়ে। আমার শুনতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীম এইবার জুতা পরিয়া দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে ঠাকুর পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করেন — বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্ব আর আমলকী।

এখন কেবল অশ্বত্থ বৃক্ষটি বিদ্যমান। তদবধি এই স্থানকে পঞ্চবটী বলা হয়। ইতিপূর্বে ইহা বটতলা নামে পরিচিত ছিল।

২

নানা কারণে এই বটতলা ও পঞ্চবটী বিখ্যাত। ভবিষ্যৎ জগৎ শান্তি লাভের জন্য এই স্থানে সমাগত হইবে। বটতলা যে কেবল ঠাকুরের সাধনের জন্যই বিখ্যাত তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে অনেক সময় আসিয়া বটতলা বেদীতে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেন। আবার বটবেদিকার সংলগ্নবর্তী ক্রোটন ও পাতাবাহার শোভিত ভূমিখণ্ডে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বনভোজন উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তগণ এই উৎসব রচনা করিতেন। ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের জন্য ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া ভোজন করিতেন। শ্রীভগবানের এই বনভোজন-লীলার স্মৃতিকল্পে শ্রীম ভক্তগণের দ্বারা কয়েকবার ঐ পুণ্য বনভোজনের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্ধন করিয়াছেন।

একবার ভক্তগণ কালীবাড়িতে বনভোজন করিবেন। রন্ধনের সকল আয়োজন হইয়াছে। ভক্তগণের ইচ্ছা, বটতলায় ঠাকুরের বনভোজনের পবিত্র ভূমিতে রন্ধন করে। কিন্তু মন্দিরের খাজাঞ্চি সেখানে করিতে দিবেন না। শ্রীমকে বলিলে উনি বলিলেন, কেন ওখানে দিবে না? ভক্তগণ শ্রীম-র প্রবল ইচ্ছা জানিয়া কলিকাতায় গিয়া মন্দিরের রিসিভার কিরণ দত্তকে জানাইলে তিনি খাজাঞ্চিকে তিরস্কার করিয়া লিখিলেন, পূজ্যপাদ শ্রীম-র যেখানে ইচ্ছা সেখানে করিতে দাও। আর তুমি ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য কর। শ্রীম শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, কেন ওখানে করা? ভগবান স্বয়ং যেখানে ভক্তসঙ্গে বনভোজনের আনন্দোৎসব করেছেন সেই স্থান জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরের সর্বত্রই পবিত্র। তথাপি তিনি যখন যেখানে যাহা করিয়াছেন তদনুরূপ কার্যের জন্য সেই স্থান জীবন্ত। ওখানে বনভোজন করিলে পূর্বের সেই আনন্দ পুনরায় জাগ্রত হইয়া এখনকার ভক্তদের সেই

লীলানন্দ জাগ্রত হইবে। পূর্বানুষ্ঠিত লীলার অনুকরণে পূর্বানুরূপ আনন্দ বিকশিত হয়। আবার পাশেই বটমূলে ঠাকুর শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। কত ভাবে পরমব্রহ্মের বিলাসমূর্তিদের সঙ্গে কতবার আনন্দ করিয়াছেন। ঐ শুদ্ধ পবিত্র নির্মল আনন্দোৎসবের পাশে এই মিশ্রিত বনভোজনানন্দ হইলে, এই আনন্দোৎসবেও উহার প্রভাব পড়িবে। তাই উহা ঐস্থানে করা। শুধু ভোজন তো বিষয়ানন্দ। তাই বেদ বলিয়াছেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। সকল কার্য, চিন্তা ও স্থান ভগবানের নামে মণ্ডিত করিতে বেদ বলিয়াছেন। ইহাকেই বলে sublimation অর্থাৎ sublime, মানে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করা ভাবনা দ্বারা। কিন্তু যে কার্য, চিন্তা ও স্থান ভগবান অবতাররূপে স্বয়ং sublimate মানে, ব্রহ্মানন্দে মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন সেই কার্য ও চিন্তা সেই স্থানে করিলে সহজেই মন ব্রহ্মানন্দের সহিত সংযুক্ত হয়, ব্রহ্মানন্দে মণ্ডিত হয়।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরের শ্রীহস্তরোপিত অশ্বত্থমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আর পবিত্র বৃক্ষকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। এই পবিত্র অশ্বত্থের পূর্বদিকে ঠাকুরের ধ্যানগৃহ। পূর্বে ঠাকুরের সময় এই গৃহ ছিল মৃন্ময়, এখন ইহা ইষ্টকনির্মিত। পূর্ব ও দক্ষিণে দুইটি জানালা আর পশ্চিমে দরজা। এই গৃহে আচার্য পরমহংস তোতাপুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে ঠাকুর বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। আর তিন দিন আনন্দসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। এই কুটীরের দ্বার ও সোপান হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত নিজের মস্তকে স্থাপন করিলেন। কুটীরের বারান্দার উত্তর দিক দিয়া নিম্নে নামিয়া কুটীর পরিক্রমা করিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণে দুইটি জানালা। শ্রীম সেই জানালা দিয়া গৃহের অভ্যন্তর দর্শন করিয়া আসিলেন মাধবীমূলে। ইহা অশ্বত্থ ও বটবেদিকার মধ্যস্থলে। এই লতিকাটি বৃন্দাবন হইতে আনাইয়া ঠাকুর স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। আজ ইহা লতিকা নহে, বৃক্ষসম। লতিকামূলটি বেশ মোটা হইয়াছে, আর গোলাকার। কাণ্ডটির পরিধি হইবে আঠার ইঞ্চি। মূল হইতে চারি হাত ঊর্ধ্বে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উপর দিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঠিয়া দুইটি হাতের ন্যায় দুইটি শাখাদ্বারা বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধে প্রেমালিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছে।

শ্রীম এই পুণ্য লতিকার মূলদেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর লতিকাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, এই মাধবী আমাদের পরম প্রিয়। জননীর ন্যায় ঠাকুর ইহার সেবা করিয়া বড় করিয়াছেন। তাঁহার দিব্য পবিত্র হস্তের স্পর্শ রহিয়াছে এ-টির অঙ্গে। শৈশবে জননীর ন্যায় কত স্নেহ, কত দর্শন, কত স্পর্শন, কত চিন্তা, কত উদ্বেগ লাভে ধন্য এই বৃক্ষ! যমলার্জুনের ন্যায় এই লতিকা বৃক্ষটিও বুঝি ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ! ইহার উদ্ভিদজন্ম ধন্য! বেদে আছে, মানুষ কর্মফলে উদ্ভিদজন্ম পরিগ্রহ করে — 'স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।'(কঠো ২:২:৭) ভাগবতের যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় ছদ্মবেশী নারায়ণের দ্বারী — জয় ও বিজয়। শোনা যায়, বাংলার বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বেদের এই সূত্রটি ধরিয়া অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রসহায়ে মানুষের ন্যায় বৃক্ষেরও সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদাদি অনুভব শক্তি প্রমাণ করিয়া বৃক্ষের জীবত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রাচীন ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষিগণের জ্ঞান গরিমার গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিশালতা প্রমাণিত হইয়াছে। আর প্রমাণিত হইয়াছে বেদের অভ্রান্ততা। ঋষিগণ যেমন ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তেমনি পারদর্শী ছিলেন মনোবিজ্ঞান ও পরমাণুবিজ্ঞানে। প্রতীচির একনিষ্ঠ পরমাণুবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া একদিন হয়তো ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ব সীমানায় পৌঁছিবে। তখনই তাহাদের জ্ঞান গবেষণার পূর্ণতা লাভ হইবে। তাহার ফলে জগতে শান্তি সুখের বন্যা অবতরণ করিবে, সত্যযুগ পুনরাবর্তন করিবে।

শ্রীম বলিতেছেন, এই মাধবীপীঠ অন্য কারণেও মহাতীর্থ। পরমহংস বিবসন তোতাপুরী মহারাজের আসন ছিল এই স্থানে দীর্ঘ একাদশ মাস ধরিয়া। তিনি উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করিতেন ধুনি রচনা করিয়া। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে নিত্য অনেকবার অনেকক্ষণ ধরিয়া আচার্যের কাছে বসিতেন, আর বেদান্ত শ্রবণ করিতেন। দেবাদেশে তোতাপুরীর আগমন দক্ষিণেশ্বরে। এই স্থানে বসিয়া ঠাকুর একদিন হাততালি দিয়া গাহিতেছিলেন, 'মজলো আমার মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে'। আচার্য তোতাপুরী উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেয়া, রোটী ঠুকতে হো?' এই ব্রহ্মদ্রষ্টা আচার্যই কিছুকাল পর অন্য একদিন ঠাকুরের মুখে জগদম্বার

গুণগাথামূলক* গান শুনিয়া নীরবে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'র একনিষ্ঠ পূজারী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নির্বিকল্প সমাধিবান কঠোর সন্ন্যাসী তোতাপুরী কেন এই প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিলেন? ইহার উত্তর ঠাকুর স্বয়ং দিয়াছেন। মহিমাচরণ চক্রবর্তীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'ন্যাংটা তোতাপুরী জানতো এর ভিতর কে আছে।'

মহিমাচরণ অবতার মানেন না। তিনি অদ্বৈতবাদী। বলেন, শুভ কর্মফলে সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে পারে। ঠাকুর তাই তোতাপুরীর নজির দেখাইলেন।

আচার্য পুরীজী, শ্রীরামকৃষ্ণকে পরে অবতার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তিন দিনের বেশি একস্থানে থাকিতেন না। বিবসন হইয়া চলিতেন। সম্বল মাত্র একটি জলপাত্র, লোটা আর চিমটা। এই দার্শনিক সন্ন্যাসী বহু চেষ্টা করিয়াও দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিলেন না। ঠাকুর বলিতেন, এস্থান ছেড়ে যেতে পারবে না, যাবৎ না বেদান্ত শোনান শেষ হয়। মা আমায় একথা জানিয়ে দিয়েছেন। আর একবার এই দীর্ঘাকৃতি লৌহবপু ব্রহ্মদ্রষ্টা আচার্য বাংলার জলীয় জলবায়ুতে

---

* গান।১

জীব সাজ সমরে,
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।
আর এক যুক্তিরণে, চাই না রথ রথী,
শত্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গতি
রণভূমি যদি করে দাশরথী ভাগীরথীর তীরে।
গান।২
দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী—বিগুণ করেছে স্বগুণে!
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে।
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে; কটাক্ষেতে করে পার॥

আমাশা রোগে আক্রান্ত হন। আবার চেষ্টা করিলেন দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে। কৃতকার্য হইলেন না। দৈবী মায়ার খেলার কার্য অল্পবিস্তর অনুভব করিতে পারিলেন। রোগযন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তখন চেষ্টা করিলেন, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করিতে। বেদে আছে, — জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার শরীর ত্যাগ আত্মহত্যা নয় — জলপ্রবাহ, অগ্নিপ্রবেশ, অনশন, মহাপ্রস্থানে শরীর ত্যাগ আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য নয় — 'বীরাধ্বনে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা'। আজও উত্তরাখণ্ডে জ্ঞানী মহাত্মাগণ রোগে অচল জরাগ্রস্ত হইয়া গঙ্গায় নিজেদের শরীর প্রবাহ করিয়া দিয়া থাকেন। তোতাপুরীও এই সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন! শ্রীম বলেন, সেই দিনে ভাটার সময় কালীবাড়ির সম্মুখে একটা চড়া পড়িত। তোতাপুরী ওখানে গেলে কে যেন জোর করিয়া তাঁহার ঐ সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দিল। অন্য মতে আজ সারা গঙ্গায় হাঁটুজল হইয়া গেল। যাহাই হোক, তিনি দৈবীমায়ার কার্য বুঝিতে পারিলেন। গুরুর রোগযন্ত্রণায় লৌকিকভাবে সহানুভূতি দেখাইলেও ঈশ্বরভাবে তোতাপুরীকে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য' এই জ্ঞানটি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তোতাপুরী দার্শনিক, অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বস্বরূপতা — 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুন্ডক ৩:২:৯) লাভ হইলেও, যাবৎ শরীর তাবৎ মায়াধীন, এই জ্ঞান ছিল না। তিনি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বিচারের দ্বারা, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' নিদিধ্যাসনের সহায়ে ব্রহ্মদর্শন করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হন — জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় তখন। বরাবর ঐ বিচার ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তোতাপুরীকে শ্রীরামকৃষ্ণ কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপ্‌কা হুয়া কেয়া? উত্তরে আচার্য তোতা বলিলেন, পেচেজ। কেৎনা দফে টাট্টী আয়ী, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য তোতা বলিলেন, পচাশ দফে। তখন শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরু তোতাপুরীকে সুদৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে আচার্যভাবে বলিলেন, পেচেজ জব হুয়া তব তো জগদম্বাকো মাননাই পড়েগা। তোতাপুরীর নূতন জ্ঞানলাভ হইল। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য'। আচার্য শিষ্য হইলেন। বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন পরন্তু ঈশ্বরাবতার। এই জ্ঞানেই তোতা ঠাকুরের গান শুনিয়া কাঁদিলেন অর্থ না বুঝিয়াও। যে তোতাপুরী প্রথম দিনে মা

কালীকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, ওয়ে তো প্রকৃতি। প্রকৃতি মিথ্যা। হাততালি দিয়া জগদম্বার মহিমাকীর্তনের সময় যিনি বলিয়াছিলেন, 'কেঁও, রোটী ঠুক্‌তা হো' সেই তোতাপুরী আজ মহামায়ার পূজা করিলেন। ব্রহ্মশক্তি সত্য, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ — ইহা বুঝিলেন। আর বুঝিলেন, আমার শিষ্যরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। তাই মহিমাচরণকে বলিলেন, 'ন্যাংটা জানতো এর ভিতর কে আছে'! এইজন্য এই মাধবীপীঠ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে চিরস্মরণীয়। আর ভক্তের দৃষ্টিতে চিরপবিত্র মহাতীর্থ।

৩

হাঁসপুকুরের চাতাল। শ্রীম পরিশ্রান্ত হইয়া পশ্চিমদিকের বাঁধান বেঞ্চের উপর বসিয়াছেন, উত্তর দিক হইতে সওয়া দুই হাত দক্ষিণে পূর্বাস্য। বসিবার পূর্বে তিনি চাতালের উত্তর প্রান্তের মধ্যস্থল দুই হাতে স্পর্শ করিয়া সেই হাত মস্তকে ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থানে ঠাকুর আসিয়া রোজ দাঁড়াইতেন। নিচে পুকুরের ঘাটে নামিয়া ভক্তরা কেহ গাড়ু ভরিয়া জল আনিয়া ঠাকুরকে দিতেন। ঠাকুর এই জলে শৌচকার্য সম্পন্ন করিতেন, গঙ্গাজলে শৌচাদি করিতেন না। ঠাকুর বলিতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। বলিলেন, একদিন ঠাকুর চাতালের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র গাড়ু ভরিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর বলিলেন, দেখ্ নূতন প্রেমের সময় একটু ঘন ঘন আসতে হয় — যেমন উপপতি ঘন ঘন উপপত্নীর নিকট আসে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া পুনরায় পঞ্চবটীতে আসিলেন। অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের মধ্যস্থল দিয়া পশ্চিমে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। তারপর দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন। সম্মুখে বকুল বৃক্ষ। ইহা প্রাচীন, ঠাকুরের সময়ের। তাহার পশ্চিমে বকুলতলার ঘাট। ঘাটের উপরের সিঁড়ির মধ্যস্থলে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, এই ঘাটে ঠাকুরের মা চন্দ্রামণি দেবীর অন্তর্জলি হইয়াছিল শরীর ত্যাগের পূর্বে। খাটিয়ায় মা শয়ান। খাটিয়ার দুই পা গঙ্গাজলে আর দুই পা ঘাটের উপর জমিতে। ঠাকুর মায়ের পা ধরিয়া বলিয়াছিলেন, মা তুমি কে গো — এই শরীরটা পেটে ধারণ করেছো! মানে, সাধারণ মা নও।

যেমন, কৌশল্যা, দেবকী, যেমন মায়াদেবী, মেরী, যেমন শচীদেবী— তেমনি তুমি।

এই ঘাটে আমাদের মা ঠাকরুন রোজ ভোরে তিনটার সময় গঙ্গা স্নান করিতেন। তারপর ন'বতে প্রবেশ করিয়া জপধ্যান করিতেন। আর ঠাকুরের আহার প্রস্তুত করিতেন। এই ঘাটের দক্ষিণের পোস্তায় বসিয়া নরেন্দ্র একটি আগমনী গান ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন, গানটি নূতন শিখিয়াছিলেন। ঠাকুর উত্তরের ইঁটের তৈরী বেঞ্চেতে একদিন বসিয়াছিলেন ভাবসমাধিস্থ। শ্রীম ও ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এই বেঞ্চের উত্তর দিকে শ্রীম উত্তর পূর্বমুখীন হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এখন জোয়ার — পতিতপাবনী মা জলে পরিপূর্ণা। শ্রীম কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিস্ময়ানন্দে কি দেখিতেছেন যেন! অল্প পরে বলিলেন, গঙ্গার কি শোভা দেখ! মা, তবে কেন ঋষিকেষে দেড়শ' সাধুর প্রাণ নিলে? প্রায় দুই মাস পূর্বে গঙ্গার জলপ্লাবনে দেড়শত তপস্বী সাধুকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কেহ বলে আড়াই শত সাধু।

এখন ন'বতের সিঁড়ির নিচে দক্ষিণ দিকে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। দুই হাতে সিঁড়ি স্পর্শ করিয়া সেই পবিত্র রজ মস্তকে স্থাপন করিলেন। বলিলেন, এই সিঁড়ি বাহিয়া ঠাকুর, মা ও ভক্তগণ ন'বতে প্রবেশ করিতেন। তারপর সিঁড়ির উপর মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। এবার ন'বতের ক্ষুদ্র বারান্দায় উঠিলেন। ন'বতের নিচের তলে মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। তালা খোলা, দরজার গায়ে শ্রীম ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল। আর বুদ্ধিরাম বিস্ময়ানন্দে বাহির হইয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। সকলে আনন্দে হাস্য করিতেছে। শ্রীম-ও বিস্ময়ানন্দে বলিলেন, বা, কেমন একটি সাধু বেরুল! অন্তেবাসী বলিলেন, 'Knock, and it shall be opened unto you' (St. Matt. 7:7) — (ব্যাকুল হয়ে ডাক, তিনি দর্শন দিবেন)। সকলের উচ্চ হাস্য। বুদ্ধিরাম, গদাধর কিছুকাল এখানে থাকিয়া তপস্যা করিতেছে।

এই ন'বতপীঠ নবীন শক্তিপীঠ। মায়ের তপোভূমি। শ্রীশ্রীমা সুদীর্ঘকাল এখানে বাস করেন। বারান্দায় চারিদিকে দরমার বেড়া ছিল। প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে হাত ছয়েক হইবে। এখানে মা থাকিতেন যেন খাঁচায় পাখী।

একা মা নহেন, তাঁহার সেবিকা গোলাপ-মা, যোগীন -মা, লক্ষ্মীদিদিও মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। কখনও গৌরীমাও থাকিতেন। আবার এই ঘরেই ঠাকুরের সেবার দ্রব্যাদি থাকিত। এই ঘরের দ্বিতলের সিঁড়ির উপর বসিয়া মা জপ করিতেন, বর্তমান জগতের লোক বিস্ময়ান্বিত হয় এই গৃহ দেখিয়া। ভাবে, এত ক্ষুদ্র গৃহে কি করিয়া মানুষ থাকিতে পারে! আবার মায়ের সঙ্গী অতগুলি ভক্ত মহিলাদের সহিত। কেন মা থাকিতেন এখানে? ঠাকুরের সেবার জন্যই তো? নিজের সকল সুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন মা ঠাকুরের সেবার জন্য। লজ্জাশীলা মা, সকালে তিনটায় শৌচাদি সারিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া এই কুটীরে প্রবেশ করিতেন। আবার রাত্রি তিনটায় পরের দিন বাহির হইয়া শৌচাদি সারিতেন। চব্বিশ ঘন্টায় একবার মলমূত্রাদি ত্যাগ! স্বাস্থ্যবিদগণ কি বলিবেন? কিন্তু, উদ্দেশ্য যদি ভগবানের সেবা হয়, তবে সবই সম্ভব হয়। তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সেবায় মা অতুলনীয়া!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৩০শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, শুক্লা চতুর্থী, ২০ দণ্ড। ১১ পল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মিলন মন্দিরে

১

এই মিলন মন্দিরে — শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। শ্রীম দক্ষিণের গোল বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া আছেন। কি ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পর সিঁড়িতে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম প্রশান্ত গম্ভীর। আনন্দময় সুখস্মৃতির ঝড় বুঝি শ্রীম-র মনোমন্দিরে বহিতেছে। কত দেববাণী, কত দেবদৃশ্য এই মন্দিরে সংসাধিত হইয়াছে।

এই গৃহেই দ্বিতীয় দর্শনে শিক্ষা দেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ — এক, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। ঈশ্বরকে না জানার নাম অজ্ঞান। বাড়ির সকলের সেবা করবে। অন্তরে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। তুমিও তাদের কেউ নও। ঈশ্বরই তোমার ও তাদের আপনার। মন দুধ, সংসার জল। দুধ জলে মিশে আছে। নির্জনে দুধ থেকে দই বানিয়ে তা থেকে মাখন তুললে তখন সংসার-জলে কিছু করতে পারে না। মাখন সদা জলের উপর ভাসবে। মানে, কিছুকাল তপস্যা ও সাধুসঙ্গ ক'রে ভক্তি লাভ ক'রে সংসারে থাকা। তখন অনিত্য সংসার কিছু অনিষ্ঠ করতে পারবে না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এখানে আসা যাওয়া করলেই হবে। তোমাকে চৈতন্যসংকীর্তনে দেখেছিলাম। তুমি আপনার লোক, যেমন পিতা আর পুত্র, এক সত্তা। সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মা আমায় বলেছেন তোমায় সংসারেই রাখবেন তাঁর কাজের জন্য। তুমি লোকদের ভাগবত শোনাবে। তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এইটুকু কাজ করতে হবে। শ্রীম সেই কথা পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'এইটুকু' কাজের কথা বলেছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর অতন্দ্রিত হয়ে কাজ করা যাচ্ছে, কিন্তু ছুটি মিলছে না আজও।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মা একে যখন ঘরে রাখবে তখন মাঝে মাঝে দেখা দিও। পাঁচ বৎসরের শত সহস্র কথামৃত শ্রীম-র মনে জাগরূক। তাই বুঝি শ্রীম প্রশান্ত গম্ভীর। এই মৌন ভঙ্গ করিলেন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরামদাদা। তিনি শ্রীমকে দেখিয়াই অগ্রসর হইয়া সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন — আসুন দাদা, আসুন। শ্রীম লুটাইয়া পড়িলেন দুই খাটের মধ্যস্থলে মেঝেতে।

অল্পদিনের মধ্যেই ঠাকুর শ্রীমকে উন্মনা সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একাধিকবার ঠাকুর বলিতেছেন, তুমি ও-টা (উন্মনা সমাধি) বুঝতে পেরেছ তো? যারা বিষয়কাজে রত থাকে তাদেরই এই সমাধি সুলভ। কাজের মধ্যে হঠাৎ মন ভগবানে বিলীন। পুরাণশাস্ত্রে দেখা যায় অন্য কর্মরত ব্রহ্মাদি দেবগণের জীবনেও এই সমাধির কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা স্বতন্ত্র হংসরূপ ধারণ করিয়া সনকাদিকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মরত স্বাভাবিক শরীরে এই উপদেশ দিতে পারেন নাই। যেমন সুষুপ্তিতে জীব নিত্য স্বরূপে মিলিত হয়, আর কর্মক্লান্তি অপনোদন করিয়া প্রকৃতিস্থ হয়, তেমনি অধিকারী পুরুষগণ কর্মরতাবস্থায় জাগ্রত অবস্থাতে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। আর তাহাতে কর্মের আবিলতা দূর করিয়া সত্যপথে অগ্রসর হয়। তাই মহাপুরুষগণের সকল কর্ম সত্যানুকূল। জীবের কর্ম আবিলতাসুলভ।

এবার উঠিয়া দেয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরের সময়কার দেবদেবী ও ভক্তগণের ছবি দেখিতেছেন চারিদিকে ঘুরিয়া। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন ছোট খাটের উত্তর-পূর্ব কোণে। একটি ছবি চিনিতে পারিলেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কার ছবি? শিবুদা ও ভক্তগণ সমস্বরে বলিলেন, মথুরবাবুর। ঘরে অনেক ছবি — জলমগ্ন পিটারের ছবিখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, এখানে (ঠাকুরের বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে) ঠাকুরের সময়ে বাক্‌দেবীর একখানা ছবি ছিল। কেউ এলে কথা কইবার পূর্বে এইদিকে তাকিয়ে ঠাকুর বলতেন, মা আমি মুখ্যু, তুমি কণ্ঠে বসে কথা কও।

ঠাকুরের ঘরের উত্তরের দরজা খোলা। এই দরজা দিয়া ন'বত দেখা যাইতেছে। ন'বতের দ্বিতলে একজন হিন্দুস্থানী সাধু বসিয়া আছেন, বেশ

স্থূলকায়। সাধুর মুণ্ডিত মস্তক আর পরণে শুভ্র আলখাল্লা। শ্রীম সাধুকে দেখিতে উত্তরের বারান্দায় গেলেন। দাঁড়াইয়া সাধু দর্শন করিতেছেন। এই অবসরে বাহিরের অনেকগুলি ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। ইঁহারা শ্রীমকে জানেন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আর কথামৃতের অমর লেখক বলিয়া।

শিবরামদাদা ডাক্তার বক্সীর আনীত মিষ্টি ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। প্রসাদ পরে লওয়া যাইবে। শ্রীম দর্শনাদি শেষ করিতে কালীবাড়ির অঙ্গনে নামিয়া গেলেন — দ্বিতীয় খিলানের নিচ দিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দরজা দিয়া বাহির হইয়া। ডান হাতে ছয়টি শিবমন্দির। উঠিবার তৃতীয় সিঁড়িতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, উত্তর দিক হইতে আড়াই হাত দক্ষিণে। শ্রীম বলিলেন, এখানে ঠাকুর এসে প্রায়ই বসতেন। এখানেই ঠাকুরের উপবিষ্ট সমাধিস্থ ফটোটি নেওয়া হয়। এ-টিই সর্বত্র পূজিত হয়। ঠাকুর স্বয়ং এই ফটো পূজা করে বলেছিলেন, পরে ঘরে ঘরে এর পূজা হবে। অতি উচ্চ ভাবের ছবি এ-টি। মন অনন্তে মিশে গেছে সচ্চিদানন্দ-সাগরে। এ অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।

শ্রীম পূর্ব দিকে ফিরিয়া অঙ্গন পার হইয়া রাধাকান্ত মন্দিরের সিঁড়ির নিচে অঙ্গনে উত্তরাস্য হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বলিলেন, কেশব সেন সঙ্গে থাকলে ঠাকুর এরূপ প্রণাম করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের লোক মূর্তি মানে না। তাই এদের শিক্ষার জন্য এরূপ করতেন। শ্রীমও ভক্তদের শিক্ষার জন্য এরূপ প্রণাম করেন।

এখন মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়াছেন। রাধাকান্তকে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যুক্ত করে চরণামৃত লইয়া সেবন করিলেন। দক্ষিণ দিকে গঙ্গাজলের ড্রামের কাছে দাঁড়াইয়া অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কানে কানে, আপনার সঙ্গে টাকা আছে কি? একটা দিন তো। ঐ টাকা গদাধর ভাঙ্গাইয়া আনিতে বাহিরে গেল। শিবরামদাদা শ্রীম-র হাতে প্রসাদী তুলসী আনিয়া দিলেন। সিঁড়ির নিচে নামিয়া শ্রীম পুনরায় ভক্তগণসহ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন উত্তরাস্য। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, অত কোমল ছিল ঠাকুরের শরীর, তবু ভক্তদের শিক্ষার জন্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবান যখন অবতার হইয়া

আসেন তখন কি না করেন? ক্রাইস্ট শরীর ত্যাগ করিলেন 'ক্রসে'। ঠাকুর ভক্তের পাপ লইয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু নিজে ভুগিলেন দারুণ ক্যানসারের যাতনায়। মানুষ ভগবানের ঋণ শোধ করিতে পারে না! কেন জীব-জগৎ সৃষ্টি করা, কেন বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া লইয়া এই তামাসা, কেনই বা অবতার হইয়া ভক্তের সকল পাপ লইয়া তাহাদের মুক্ত করা — কার সাধ্য এ খেলা বুঝে? বিচিত্র প্রহেলিকা! ঋষিরাও বুঝিতে পারেন নাই; তাই বলিয়াছেন, এটা তাঁর খেলা — 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'।

২

শ্রীম এবার মা কালীর মন্দিরের সামনের চাতালের সিঁড়িমূলে প্রণাম করিয়া উপরে উঠিলেন। প্রথমে দারোয়ান, পরে বেশকারী শ্রীমকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর মায়ের পূজারী, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার ছেলে নকুল আসিয়া 'জ্যেঠামশায় আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীম বারান্দায় মায়ের সম্মুখে গলবস্ত্রে পশ্চিমাস্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, মা ডান হাতে। উঠিয়া পূর্বাস্য হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। শ্রীম-র পশ্চাতে ছোট রমেশ ও ডাক্তার। পশ্চিমাস্য শ্রীম-র সম্মুখে অন্তেবাসী। তাঁহার বাম দিকে বিনয় ও বুদ্ধিরাম। এখন অপরাহ্ন সওয়া চারিটা।

মন্দিরের কর্মচারীগণ মন্দিরের পশ্চিমের দরজা খুলিয়া দিলেন। অস্তগামী সূর্যের কিরণজাল গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাতে মায়ের অপরূপ রূপ হইয়াছে। মা আনন্দে ঝল্‌মল্ করিতেছেন। দারোয়ান আসিয়া শ্রীমকে পশ্চিমের বারান্দায় লইয়া গেল। শ্রীম মাকে নিবিষ্ট মনে দর্শন করিতেছেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম দরজা খুলিয়া দেওয়ায় মা হাস্যময়ী আনন্দোজ্জ্বলা। শ্রীম অনেকক্ষণ বিভোর হইয়া দর্শন করিতেছেন। শ্রীম-র অজ্ঞাতে বিনয় ও অন্তেবাসী তখন শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। জ্ঞাতসারে তিনি পায়ে হাত দিতে দেন না।

শ্রীম বিভোর হইয়া কি দেখিতেছেন, কি ভাবিতেছেন? হয়তো, ভাবিতেছেন মায়ের চিন্ময় রূপ, যেরূপ ঠাকুর কৃপা করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মা মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী হাস্যবদনা। এই মা-ই এইরূপে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন — মৃন্ময়ীরূপে। আবার ঠাকুরের সঙ্গে আনন্দ-বিলাস করিতেন চিন্ময়ীরূপে — কথা কহিতেন, তাঁহার দেওয়া জিনিস খাইতেন। আবার এই মাকেই বিড়ালরূপে দেখিয়া ভোগের লুচি খাওয়াইয়াছিলেন। এই মা-ই রতির মা-রূপে দেখাইয়াছিলেন, যোগবিভূতি বেশ্যার বিষ্ঠা। এই মায়ের কাছেই শ্রীমকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন গান গাহিয়া — 'ভবদারা ভয়হরা' ইত্যাদি। এই মার কাছেই নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন মা-ভাইয়ের জন্য অন্নবস্ত্র চাহিতে। কিন্তু নরেন্দ্র চাহিলেন, জ্ঞান-ভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য। এই মাকেই ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে পায়ে নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে মন্দিরের উপর হইতে নিচে নামিতেছিলেন, নৃত্যময়ী ক্রীড়ারতা। শত স্মৃতিতে শ্রীম-র মন-প্রাণ নিমগ্ন। তাই শ্রীম ভাববিভোর।

শ্রীম মন্দিরের সম্মুখে নিম্ন চাতালে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দর্শন করিতেছেন উত্তরাস্য হইয়া। এই চাতালের দক্ষিণ প্রান্তে, প্রায় নাটমন্দিরের গায়ে, ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বাম হাতে রাখিয়া বসিয়াছিলেন। আর শ্রীমকে মায়ের পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন গান গাহিয়া — 'ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার। তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তার তার, না তার মা॥'

নাটমন্দিরে শ্রীম। ঠিক মধ্য পথ ধরিয়া শ্রীম চলিলেন দক্ষিণে, শ্রীম-র পিছনে মা। ডানহাতের দ্বিতীয় সারির প্রথম পিলারটিকে শ্রীম আলিঙ্গন করিলেন। একদিন ঠাকুর এইটিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন ভাবাবেশে। এখানে তখন ভগবৎগুণপ্রকাশক যাত্রাগান হইতেছিল। মধ্যস্থল দিয়া সোজা দক্ষিণে বলির স্থানে আসিয়াছেন শ্রীম। একদিন সন্ধ্যারতির পর নির্জনে সিংহের ন্যায় একাকী বিচরণ করিতেছিলেন ঠাকুর এই পথে। পুনরায় উত্তরমুখী হইয়া আসিয়া মায়ের মন্দিরের সম্মুখের উপরের চাতালে আসিয়া উঠিলেন। নকুল আসিয়া শ্রীম-র হাতে চরণামৃত দিলেন। কপালে সিন্দুকের তিলক অঙ্কিত করিয়া হাতে মায়ের প্রসাদী সন্দেশ দিলেন। এই স্থানে মন্দিরের খাজাঞ্চী যোগেন আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া মন্দিরের

নিম্নাঙ্গনে অবতরণ করিলেন।

এবার চাঁদনীতে শ্রীম। একজন ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, দিন তো চারটে পয়সা ধার। এখন গঙ্গায় জোয়ার। এবার ঘাটে আসিয়া বসিয়াছেন শ্রীম। সিঁড়ির উত্তর প্রান্তে, তিন হাত দক্ষিণে। গঙ্গা স্পর্শ করিয়া জপ করিতেছেন। কিছুকাল পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এবার উপরে উঠিতেছেন। সম্মুখে একজন হিন্দুস্থানী সাধু দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দুই চারিটি মিষ্টালাপ করিলেন।

শ্রীম চাঁদনীর ভিতর দিয়া উত্তরমুখী অঙ্গন অতিক্রম করিতেছেন। তখন বীরেন বোস এটর্ণি আসিয়া সাক্ষাৎ ও প্রণাম করিলেন।

পুনরায় ঠাকুর-মন্দিরে শ্রীম। ছোট খাটের মধ্যস্থলে শ্রীম পুনরায় প্রণাম করিলেন, পশ্চিমাস্য। এই স্থলে ঠাকুরের পাপোশ থাকিত। শ্রীম শীতকালে ঠাকুরের আদেশে এই পাপোশের উপর বসিতেন। এই পাপোশের উপর শ্রীম বসিয়াছিলেন একদিন। রাত্রি তখন আটটা। ঘরে আর কেহ নাই। ঠাকুর ভাবসমাধি হইতে ব্যুত্থিত। তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইবে যেন মাতাল। শ্রীমকে জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, কেউ মনে না করে, মায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করতে পারেন।

শ্রীম বারংবার সন্ন্যাস ভিক্ষা করিতেছেন। ঠাকুরের ও জগদম্বার ইচ্ছা, তিনি গৃহে থাকিয়াই লোকশিক্ষা দেন, সংসারসন্তপ্ত জীবগণকে 'ভাগবত' শোনান। রাখাল, যোগেন, তারক কৃতদার হইলেও ঠাকুরের আশীর্বাদে তাঁহারা সন্ন্যাসী হইবেন দেখিয়া শ্রীম কৃতদার হইলেও বারংবার গুরুভাইদের মত সন্ন্যাস লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। জগদম্বার ইচ্ছা, তিনি লোকশিক্ষার জন্য গৃহে থাকুন। এইজন্য ঠাকুর অসন্তুষ্ট হইয়া ঐরূপ কঠিন কথা কহিলেন।

এই ঘটনার পর শ্রীম ঠাকুরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন সর্বদা, সংসার জ্বলন্ত অনল। শ্রীম এই অনলে দগ্ধ হইয়াই প্রথমে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই অনলের হাত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি

লাভের জন্যই শ্রীম-র বারংবার সন্ন্যাস প্রার্থনা।

এই গৃহে বসিয়াই ঠাকুর শ্রীমকে গৃহে থাকিতে বলিলেন দৈবী-কার্যের জন্য। এই গৃহে বসিয়াই পুনরায় ঠাকুর জগদম্বার কাছে শ্রীম-র জন্য প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন — 'মা, যদি গৃহেই রাখ, তবে মাঝে মাঝে দর্শন দিও মা। নইলে কি করে এই অগ্নিকুণ্ডে থেকে তোমার কাজ করবে?' এই সব ঘটনা হইয়াছিল শ্রীম-র জীবনের প্রারম্ভে। এখন বৃদ্ধ। তাই শ্রীম-র মনে ঐ দিব্য মধুর স্মৃতি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীম বিদায় প্রণাম করিয়া উঠিতেই দেখিলেন, বিপিন ডাক্তার উত্তরের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসাও পাইয়াছেন। সুখস্মৃতি ঠাকুরের কথা পরস্পর কহিলেন। শ্রীম এবার রওনা হইবেন কলিকাতা। উত্তরের বারান্দা দিয়া পশ্চিমের বারান্দায় নিচে গিয়া দেখিলেন তাঁহার চটিজুতোজোড়া উধাও হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, জুতাগুলো disappeared (অদৃশ্য) হয়ে গেছে দেখছি। ভক্তরা অনেক খুঁজিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না। একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, আমাদের দোষেই এটা ঘটলো। আমাদের উচিত ছিল তা উঠিয়ে মোটরে রাখা। আমরা স্বার্থপর। নিজের আনন্দলাভের জন্যই ব্যস্ত। কিন্তু আনন্দ দেন যিনি, তাঁর সেবা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য নাই। নগ্ন পদেই অগত্যা শ্রীম চলিলেন। তাঁহার শরীর ও পদদ্বয় অতিশয় কোমল। ভক্তদের অসাবধানতায় শ্রীম-র দেহকষ্ট হইল আর তাহাদের মনোকষ্ট হইল। ভক্তের অনুশোচনা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম কুঠীর সম্মুখে ডাক্তারের মোটরে আরোহণ করিলেন। ডাক্তার, জগবন্ধু ও বিনয় সঙ্গে চলিলেন। বীরেন বোসের মোটরও সঙ্গে চলিল। গাড়ী আলমবাজার ছাড়িয়া বরানগর বাজারের নিকট আসিয়াছে। শ্রীম বলিলেন, আমরা যে বেঁচে আছি, সেটা হলো anachronism (কালের পক্ষে বেমানান)। এই যা দেখছি — 'new faces and other minds (নূতন নূতন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি) সব — এতে তাই মনে হয়। শ্রীম এখন সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক। গাড়ী কাশীপুর উদ্যানের সম্মুখ দিয়া চলিতেছে। ডান হাতের একটা ভাঙ্গা বাড়ি দৃষ্টে শ্রীম বলিলেন, এটা বুঝি সেই বাড়ি? হাঁ, এই বাড়িটা ঠিক তেমনি

আছে। কাশীপুরে ডাক্তারের গৃহ। বিনয় ও ডাক্তার, আর মোটর, এখানে রহিল। বীরেন বোসের মোটরে শ্রীম আরোহণ করিলেন, সঙ্গে জগবন্ধু। বীরেন বোসের মোটর সারকুলার রোড দিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিল মর্টন স্কুলে।

এখন রাত্রি প্রায় আটটা। সিঁড়ির ঘরে চারতলায় অপেক্ষা করিতেছেন ভক্তগণ — বলাই, রমণী, ছোট নলিনী, ফকির ও সঙ্গী। আর মঠের প্রাচীন ভক্ত পুলিন মিত্র ও জামাই রণদা। সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে আসিয়াছেন। শ্রীম ক্লান্ত, ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া আছেন বটে — শরীর এখানে; কিন্তু মন নিমগ্ন ঠাকুরে, কাশীপুর উদ্যানে ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে — প্রাণারাম শ্রীরামকৃষ্ণে।

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
৩০শে নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল।
রবিবার, শুক্লা চতুর্থী, ২৩ দণ্ড। ১১ পল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

জীব শিব জ্ঞানে বিশ্বশান্তি

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাশে কয়েকজন ভক্ত বেঞ্চেতে বসা। এখন সন্ধ্যা হয় হয়।

শীতকাল। শ্রীম-র মাথায় কম্ফোর্টার জড়ান। গায়ে লাল-ইমলির সাদা সোয়েটার; তাহার উপর ওয়ার ফ্লানেলের ধূসর বর্ণের পাঞ্জাবী। এসবের উপর বালাপোশ জড়ান। ভক্তদের সঙ্গে কাশীপুর উদ্যান ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা হইতেছে। গতকাল ঐ দুই স্থান দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নানা ভাবের সাধন করেছেন — বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি নানা মতের নানা সাধন। আবার ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মমত। সব সাধন ক'রে সবে সিদ্ধ। ওখানেই বলেছিলেন — 'যত মত তত পথ'। সব ধর্মমতই ঈশ্বরের কাছে যাবার এক একটি পথ। পথমাত্র, কিন্তু ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর এক — অদ্বিতীয়। এ দ্বারা এই প্রমাণ করেছেন — সব জীবের, সব মানুষের উৎপত্তিস্থল এক, এক সত্য বস্তু। কেন করলেন এই সাধন? তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানের প্রভাবে জগৎটি একটি পরিবারের মত হবে। একটা পরিবারের সকল ব্যক্তি যদি পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, তবে পরিবারে শান্তি ও আনন্দ হয়। তবেই পরিবারে শান্তি সুখ ও আনন্দ থাকে। আবার সকলে যদি পরিবারের কর্তাকে মানে এবং ভালবাসে তবে বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না। সেইরূপ, জগতের সকল লোক যদি একই ঈশ্বরকে মানে, যদি জানে ঈশ্বর এক, নামভেদে বহু, তবে বিবাদ থাকে না, সকলে প্রীতিবদ্ধ হয়ে শান্তিতে থাকতে পারে। ঠাকুরের নানা মত সাধনের তাৎপর্য এই। জগতের শান্তি হতে পারে এই উচ্চ ভাবনায়। একই পিতার সন্তান সব মানুষ, এটা মনের গোড়ায় থাকলে বিভিন্ন

প্রকৃতি ও শিক্ষা, বিভিন্ন আহার পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধর্মমতের ভিতর থেকেও সকলে মিলেমিশে থাকতে পারে। কেবল রাজনীতিতে সাম্য স্থাপিত হতে পারে না। বৈচিত্র্য বাহ্য জগতের নিয়ম, কিন্তু এই বিচিত্রতার ভিতর, মানুষমাত্রই ঈশ্বরের সন্তান — এই উচ্চ ও সত্য ভাবটি যদি থাকে, তবেই বিবাদের ভিতর একত্ব হতে পারে। আর তাতেই শান্তি সুখ লাভ হতে পারে। তাতেই সকলের ভিতর ভ্রাতৃত্বের একত্ববন্ধন আসতে পারে।

আর কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুরের আন্তরিক একত্ব সংস্থাপনের ঐ বাহ্য প্রকাশ হল। সকল ভক্তদের ভিতরই ঠাকুরের জন্য ভালবাসা। ভক্তদের প্রকৃতি ও শিক্ষা ভিন্ন হলেও তারা ঠাকুরকে ভালবাসে। এককে ভালবেসে অনেকে একসূত্রে বদ্ধ। ঈশ্বরীয় ভালবাসাতেই সত্যিকার একত্ববোধ হতে পারে।

বাহিরে শীত পড়িয়াছে। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। হঠাৎ তখন তিনতলা হইতে শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নীমার চীৎকার সকলে শুনিতে পাইলেন। শ্রীমও শুনিতেছেন। তিনি কারণ বুঝিতে পারিলেন। গিন্নীমা কুলায় করিয়া বড়ি দিয়াছেন। শুকাইবার জন্য চারতলার টিনের ঘরের ছাদে ঐ কুলাটা রাখাইয়াছিলেন। রাত্রি হইয়াছে, শিশির পড়িতেছে, এই ভাবিয়া একজন ভক্ত উহা নিচে পাঠাইয়া দিলেন। এই কুলা অপরে ছুঁইয়াছে দেখিয়া ঐ চীৎকার। ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, যত সব বাঙ্গালের আড্ডা হয়েছে এখানে। শ্রীম চীৎকার শুনিতেছেন আর মুচকি হাসিতেছেন। বলিতেছেন, এটা হলো শুচিবায়ুর কোলাহল। অনেকের শুচিবায়ু থাকে কিনা। শুচি ভাল। কিন্তু শুচিবায়ু খারাপ। কি জন্য শুচি দরকার তার চিন্তা নাই। ভগবানের জন্য অন্তর্বহিশুচির দরকার। এই উদ্দেশ্য ভুলে যায়। আর শুচিটাকে ধর্ম, ঈশ্বর বানিয়ে ফেলে।

(সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, শুচিবায়ু যার, তার ধর্ম হয় না। আর একটা কথা বলেছিলেন, Puritan-এরও (নীতিবাদী) ধর্ম হয় না। যারা কেবল মুখে মুখে নীতিবাদী তাদের ঠাকুর ধর্মধ্বজী বলতেন। অন্তরে ঈশ্বরের জন্য প্রীতি নাই, বাইরে moralist, নীতিবাদী। এমনতর লোকদেরও ধর্ম হয় না।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তের প্রতি) — আপনি তো কুলোটা ছুঁয়েছেন, বড়িতে তো হাত দেন নাই। তা হলে আর কি?

গিন্নীমা ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্তা — শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবিকা। খুব কোমল মাতৃপ্রাণ। প্রথম যৌবনে একটি পুত্র হারান। তাহাতেই উর্ধ্ববায়ু। মাঝে মাঝে সামান্য কারণে অধৈর্য হইয়া পড়েন, আর ক্রোধে অধীর হন। ঠাকুর, শোকে তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে মায়ের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। আর বাদাম তেল মাখিতে ও মিছরী পানা খাইতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তবুও সারে নাই। তাই মাঝে মাঝে অধৈর্য হইয়া পড়েন আর চীৎকার করেন। শ্রীম ইহা হাসিমুখে পাকা খেলোয়াড়ের ন্যায় সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

২

শ্রীম কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একজন সাধুর মায়ের এই শুচিবাই ছিল। তাতে তিনি কষ্ট পেতেন যথেষ্ট। ঠাকুরকে বললে তিনি ব্যবস্থা দিলেন। বললেন, যদি গু দিয়ে তিলক কাটাতে পার তবে শুচিবায়ু যাবে। সাধুর মা একদিন শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। স্নান করে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে তিনি নিত্য তিলক কাটেন। আজও তিলক কাটলেন। কিন্তু মাটি নয় — একটা গুয়ের নেড়। বাড়িতে ফিরে এলে দৌহিত্রী বলল, ও দিদিমা, তুমি যে গু দিয়ে তিলক কেটেছ। ছি, কি দুর্গন্ধ! তদবধি শুচিবাই গেল।

একজন ভক্ত — ওরা জল দিয়ে জল শুদ্ধ করে (সকলের হাস্য)।

আর একজন ভক্ত — ওসব লোক রাস্তায় পাখীর মত লাফিয়ে চলে, আর গায়ের কাপড় সামলিয়ে রাখে পাছে কারো গায়ে লেগে যায়।

অপর একজন ভক্ত — ওরা গঙ্গাস্নান যখন করে তখন তীরে একজন বালক বা অপরকে বসিয়ে রেখে দেয়। বলে, আমি ডুব দিচ্ছি, তুই দেখ আমার কাপড়টা জলে ভেসে ওঠে কিনা।

এখানেও শীত লাগছে, চলুন ঘরে গিয়ে বসা যাক্ — এই বলিয়া সকলে ঘরে গেলেন। শ্রীম বসিলেন দরজার পার্শ্বে চেয়ারে দক্ষিণাস্য।

ভক্তেরা — ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, বড় জিতেন, ছোট জিতেন প্রভৃতি বসিলেন বেঞ্চে—সামনে। শ্রীম বলিলেন, একটু কথামৃত পাঠ হোক। নিজে বাহির করিয়া দিলেন চতুর্থ ভাগ, সপ্তম খণ্ড — ১৮৮৩-এর ডিসেম্বর। শ্রীম তখন গুরুগৃহে বাস করিতেছেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদছায়ায়। প্রায়ই অন্তেবাসী পড়েন। আজ তিনি নিদ্রালু। তাই শ্রীম ডাক্তারকে পড়িতে বলিলেন। এখন রাত্রি আটটা।

ডাক্তার পড়িতেছেন — শ্রীরামকৃষ্ণ মুখুয্যেকে বলিতেছেন — তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, সেই জল মাটিতে (মনের উপর) লাগলে ধুলো ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে (ছুঁচকে) টেনে লবে। — যোগ হবেই হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইটে ঠাকুরের নিজস্ব ব্যবস্থা। বলতেন, কলিকালের জন্য এটা উপযোগী। মানুষের মন এখন দুর্বল, আয়ু কম, আর অন্নগতপ্রাণ। কঠিন সাধন চলে না। ঠাকুর এই পথে নিজে গিছলেন প্রথম। তিনি বলেছিলেন, এখানে সব লোক-শিক্ষার জন্য। অবতার কিনা ঠাকুর। তাই তাঁর কাজ কালোপযোগী পথ দেখান ভক্তদের। এ-টি তিনি recommend (ব্যবস্থা) করেছেন। কত জোর দিয়ে বলেছেন, যোগ হবেই হবে। বলেছেন, কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়। তারপর তাঁর দর্শন হয়, 'সমাধি' হয়। অত সোজা পথ দেখিয়েছেন — শোনে কে, আর করে কে?

আর বলেছেন, যাদের তাঁর জন্য কান্না এসেছে তাদের সঙ্গ করতে। সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। বলেছেন, এটির বড়ই দরকার। সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। ভুলিয়ে দেয় সর্বদা মায়ের অবিদ্যা মায়া। তবে গৃহস্থের জন্য বিশেষ দরকার। তারা সব ভোগের আড্ডায় রয়েছে — কামিনীকাঞ্চনের হাটে। সাধুদের দেখলে মনে হবে, তাঁরা কোথায়, আর আমি কোথায়! তাদের উপর ভালবাসা এলে সেই ভালবাসাই পরে নিয়ে যাবে মনকে ঈশ্বরে। সাধুসঙ্গ করলে সহজে ঈশ্বরের দিকে মন যায়।

মুখুয্যেকে বলছেন, ঈশ্বরেতে আমমোক্তারী দাও, আর বিড়াল-ছানার মত কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। তিনি বেশী পড়তে বলতেন না। হাতে আনতে বলতেন। বইতে যা আছে সেগুলি হাতে আনা চাই। নইলে কেবল বোল

আওড়ালে কে শোনে? ধর্ম মানেই হাতে আনা। মানুষ যে তাঁর সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — বেদের এই বাণী হাতে আনা। এই সংসারে থেকে তাঁর পুত্র হওয়া হাতে নাতে — কেবল কথায় নয়। কাজ করা চাই। কাঁদাও কাজ। ছেলে পারছে না দেখলে বাপ সব করে দেন।

ডাক্তার পড়িতেছেন — মণি জিজ্ঞাসা করিলেন, জগৎ কি মিথ্যা? ঠাকুর বলিতেছেন, মিথ্যা কেন হবে? ও বিচারের পথ। 'নেতি নেতি' করে ছাদে ওঠা। তখন যদি 'আমি'-টা একেবারে পুঁছে দেন সে অবস্থায় কি হয় তা মুখে বলা যায় না। নিচে এলে তখন দেখা যায়— তিনিই ইঁট চুণ সুরকি — সিঁড়ি হয়ে আছেন। মা আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। সে অবস্থায় বিড়ালকে মায়ের রূপে দেখে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখালেন, জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সবই মা হয়ে রয়েছেন। এখনও এক একবার মা 'আমিটা' পুঁছে দেন — তখন জগৎ নাই। যা থাকে, মুখে বলতে পারি না।

ডাক্তার পড়িতেছেন। শ্রীম এবার চুপ করিয়া সব শুনিতেছেন। সপ্তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। শ্রীম গতকাল দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিয়াছেন। কালের দর্শন আর আজের পাঠ শুনিয়া শ্রীম বুঝি পূর্বস্মৃতির আনন্দে ডুবিয়া আছেন। অষ্টম খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। 'গৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়' — এই গানটি শেষ হইতেই শ্রীম যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলেন, থাক।

শ্রীম-র ভাবের নেশা এখনও কাটে নাই। তথাপি একটি ভক্ত সাহসে ভর করিয়া আজের পাঠ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভক্ত — কেউ কেউ বলেন, গুরুর সঙ্গ করলে শিষ্যের দোষ গুরুর চোখে পড়ে। তা হলেই সে দোষ গুরুকৃপায় যায়, এটা কি সত্য?

শ্রীম — গুরু যদি পূর্ণজ্ঞানী হন তবে হয়। ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনেছিলাম। নইলে ঢোঁড়া সাপের অবস্থা হয়। ব্যাঙটাকে গিলতে পারছে না, বেরও করতে পারছে না। উভয়ের প্রাণ যায়! কেবল তিনিই পথ দেখাতে পারেন যাঁর পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।

ভক্ত — আজ্ঞে, আমার জিজ্ঞাস্য — ভক্তের দোষ গুরু নিতে পারেন কি?

শ্রীম — তার উত্তরও ঐ। পাকা গুরু হলে পারেন, পূর্ণজ্ঞানী হলে হয়। ঠাকুর ভক্তদের সব দোষ নিজে নিয়েছেন। একটি ভক্তকে তিনি জিতেন্দ্রিয় করে দিয়েছিলেন তার কাম-টাম টেনে নিয়ে। কালী মায়ের কাছে তাকে নিয়ে গান গেয়ে তাঁর পায়ে তাকে উৎসর্গ করেছিলেন — 'ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার। তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তার তার না তার মা।।' — এইটি গেয়ে। করলেন সব তিনি, কিন্তু মায়ের নাম করে। Credit (বাহবা) নেবেন না। মায়ের কোলে শিশু যে তিনি! ভক্তটি গৃহস্থ।

কারুকে কারুকে বলতেন, এখানে এলে গেলেই হবে। তিনি ভক্তদের একটা গুণ ধরে টেনে উঠিয়ে দিতেন উপরে। তাতেই দোষগুলি ঝরে পড়ে যেতো। উপরে মানে, ঈশ্বরে। তাই বলেছিলেন, ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সেই ভালবাসাই কাম-টাম খেয়ে ফেলে, যেমন বাঘ ছাগল খেয়ে ফেলে কপ্ কপ্ করে। বলেছিলেন, যেমন মোমবাতিতে আগুন দিলে মোম গলে পড়ে, তেমনি কাম-টাম গলে যায় ভক্তি হলে। ঠাকুর এইসব অবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁর ভক্তদের।

ভক্ত — ঠাকুর বললেন, বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধি হয়, উন্মনা সমাধি। তারপর বিষয়, কাজকর্ম মনকে টেনে বাহিরে নিয়ে যায়, যোগভ্রষ্ট হয়। এদের কি তখন ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না?

শ্রীম — ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না, তা তো বলেন নি। চাপা পড়ে। বললেন, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়। আবার সূর্য উঠলে পদ্ম আবার ফোটে। জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, ঢাকা পড়ে মাত্র।

পুরাণে আছে, সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার কাছে গেলেন জ্ঞান উপদেশ পেতে। ব্রহ্মা তখন নানা কার্যে ব্যস্ত। বললেন, তোমরা অসময়ে এলে। আচ্ছা অপেক্ষা কর। তখন তিনি হংসরূপ ধারণ করে এসে তাঁদের জ্ঞান উপদেশ দিলেন।

দেখায় যেন জ্ঞান নাই। জনকেরও হতো এক একবার এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদের এরূপ হয়। কিন্তু ভিতরে জ্ঞান থাকে।

বলেছিলেন — জ্ঞানী ভক্ত, যে সংসারে থাকে, সে যেন কাঁচের

ঘরে বাস করছে। সব দেখতে পাচ্ছে তবুও কাঁচ ব্যবধান। কিন্তু যে ঘর ছেড়ে মাঠে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সর্বত্যাগীরা, তারা যে আলোর বন্যায় দাঁড়িয়েছে! তাদের কাজকর্ম নাই, কেবল ঈশ্বরচিন্তা — যেমন নারদ, শুকদেব।

ঘরে থাকলেও তাদের জ্ঞানের কমতি পড়ে না। সন্ন্যাসীও কাজে থাকে, তারও এ-অবস্থা হয়। তরবারি সোনা হয়ে গেলে তখন যেখানেই রাখ সে সোনা।

ভক্ত — ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরলাভ করলে পাগল হতে হয়। পাগলের তো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে কি করে ঈশ্বরকে লাভ করবে?

শ্রীম — সে তো বিষয় নিয়ে যে পাগল তার কথা হচ্ছে। ঈশ্বরকে নিয়ে যে পাগল, তার কথা ঠাকুর বলছেন। বিষয়ীরা পাগল স্ত্রী পুত্র কন্যা ধন ঐশ্বর্যের কথা ভেবে ভেবে। ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরকে যে আন্তরিক ডাকে সর্বদা, সে পাগলের ঈশ্বরজ্ঞান লুপ্ত হয় না। গানে আছে, 'মজা আছে সে পাগলে জানবি আসল পাগল হলে। আয়রে পাগল ছেলে বলে পাগলী মায়ে নেবে কোলে।।'

ঠাকুর নিজে হয়েছিলেন ঐ পাগল। সকলে বলেছিল পাগল। কিন্তু ব্রাহ্মণী এসে বললেন, এ প্রেমোন্মাদ। চৈতন্যদেবের হয়েছিল এইটে। তিনিই তো তাঁকে প্রথম অবতার বললেন।

একটা বিষয়োন্মাদ, একটা প্রেমোন্মাদ।

তাই ঠাকুর গান গাইতেন, 'আমায় দে মা পাগল করে'। ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য এঁরা প্রেমোন্মাদ।

১লা ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা পঞ্চমী, ১৪ দণ্ড। ৪৯ পল।

বিংশ অধ্যায়

ঠাকুরের এক কথা — কিছু কর

১

মর্টন স্কুল। এখন সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। কয়েকজন ভক্ত পাশে বসা। তিনি জগবন্ধুকে বলিলেন, তাহলে আপনি উঠুন। একবার শুনে আসুন। সবখানে যেতে হয়। সব শুনতে হয়। তবে নিজের সিদ্ধান্ত পাকা হয়। সকলেই তো একজনকেই ডাকছেন। ভাব আলাদা। অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবান। যে যে-ভাবে ডাকুন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। নাক সিঁটকালে চলবে না। সব না নিলে কম পড়বে যে! আমার খুব ইচ্ছা হয় কে কি ভাবে তাঁকে ডাকছে, তা শুনতে, দেখতে। ঠাকুর বলতেন, উদার না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই তো তিনি সর্ব ধর্ম সাধন করলেন। ক'রে দেখলেন, সব পথে তাঁকে পাওয়া যায়। 'যত মত তত পথ'। মত পথ। এ-টি ঋষিরা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন। ঋক্ বেদে আছে, 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' (ঋক্‌বেদ) মাঝে মাঝে এটা ভুলে যায় লোক। তখনই তিনি নিজে এসে ঐ উদার ভাব প্রচার করেন। এখন ঠাকুর এসেছেন এইজন্য। আবার ঢাকা পড়বে আবার আসবেন। এইভাবে চলছে জগৎটা। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি উঠুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুড়ো হয়েছি। ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠে না। তাই বন্ধুদের সাহায্য নিই।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি। হলে আজ প্রায় দেড়শত লোক। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিশারদ শ্রীকুলদা মল্লিক ভাগবতরত্ন বক্তৃতা করিবেন। বিষয় রাসলীলা।

আজ ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। বাংলা ১৩৩১ সাল। ১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শুক্লা ষষ্ঠী তিথি — ১০ দণ্ড। ৩ পল। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা প্রায়। কুলদা মল্লিক তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতার সহিত প্রায় একঘন্টা কাল বলিলেন। কখনও সুললিত কণ্ঠে নানা শাস্ত্র হইতে আবৃত্তি

করিলেন। বিষয়টি কঠিন হইলেও মূল তত্ত্বটির উপর আধিপত্য থাকায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। সকলেই রাসতত্ত্বের ব্যাখ্যা শান্তভাবে শুনিয়াছেন। সাড়ে সাতটায় বক্তৃতা শেষ হইল। অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিলেন প্রায় পৌনে আটটায়।

শ্রীম আপন কক্ষের পাশের পার্টিশানের ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দরজার সম্মুখে দক্ষিণাস্য। শীত পড়িয়াছে, তাই ঘরে বসিয়াছেন। আর শীতবস্ত্রে শরীর আবৃত। মাথায় কম্ফোর্টার। ডান হাতে হাই বেঞ্চের উপর প্রুফ রাখিয়া রমণী পড়িতেছেন, চতুর্থ ভাগ, ত্রিংশ খণ্ড। ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বলাই প্রভৃতি উপস্থিত। অন্তেবাসীর সহিত শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি শুনলেন ওখানে?

অন্তেবাসী — প্রথমে গান হলো বৈষ্ণব মহাজনদের। সবই রাসলীলার গান। তিনি নিজেই গাইলেন ভাবের সহিত।

শ্রীম — কিছু মনে আছে?

অন্তেবাসী — 'নাচতু গৌর রাসরস অবতার' ইত্যাদি।

শ্রীম — আর কিছু?

অন্তেবাসী — শ্রী বৃন্দাবনের মধুর তত্ত্বের গানও হলো।
বসন মধুর ভূষণ মধুর,
বলন মধুর চলন মধুর,
ভ্রমণ মধুর গমন মধুর,
সকলই মধুর।

উনি বললেন, ভগবানের সব মধুর। গৌরলীলার সবই মধুর।

শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এই দুই তত্ত্বের সমাবেশ। তাঁর অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা। শ্রীরাধার ব্যাকুলতাই শ্রীচৈতন্যরূপ।

শ্রীম — বেশ কথা। আর কিছু?

অন্তেবাসী — বেদের শান্তিপাঠ হলো — মধু শান্তি পাঠ।
মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসি।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।। (ঋক্‌বেদ ১:১৪:৯০)

মধুময়কে প্রাপ্ত হলে সমগ্র বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।

আর বললেন, রাসের মানে হলো, কন্দর্পের দর্প-দমন। মদনমোহন মানেও তাই। মদন সকলকে মোহিত ক'রে সংসারের কাজে লাগায়। সেই মদনকে মোহন করেন শ্রীভগবান। শ্রীরাস, কামদেব দমনের, কন্দর্পের দর্পচূর্ণের লীলাভূমি। মদনের শ্মশানভূমি। চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্তলীলায় বেশ বর্ণনা আছে মদনমোহনতত্ত্বের অর্থ কি, তার। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতও তাই বর্ণনা করেছেন।

কামদেবকে কেন লোকের এতো ভাল লাগে? না, দাদার পরিচয়ে। এক বাড়িতে উৎসব। তাতে নেমন্তন্ন হয়েছে দাদামশায়ের। কিন্তু তিনি কার্যগতিকে যেতে পারেন নি। পাঠিয়ে দিলেন পাঁচ বছরের নাতিকে ম্যানেজারের সহিত। নাতির আদর কত! উৎসবকর্তা তাকে কোলে ক'রে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল। কোলে ক'রে তাকে খাওয়ালে। আবার কত মিষ্ট কথা বলে কোলে ক'রে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিল। আদরের শেষ নাই। কেন এতো আদর? না, দাদার পরিচয়ে।

ঈশ্বর দাদামশায়। আর কামদেব নাতি। দাদাকে পেলে আর নাতিকে ভাল লাগে না।

শ্রীম — আর কিছু হলো?

অন্তেবাসী — আর ম্যাক্সমুলারের অভিমতের সমালোচনা করলেন।

শ্রীম — কি অভিমত?

অন্তেবাসী — ওঁর মতে ম্যাক্সমুলার বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ভাল চক্ষে দেখেন নাই। 'Sacred books of the East'-এরও নিন্দা করেছেন। বলেছেন, ম্যাক্সমুলার-সম্পাদিত, প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থাবলী নামক পুস্তকে ভারতের ভাবটি ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নাই, ধরতেও পারেন নাই। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় পুত্র উৎপাদন করাকে যে ঈশ্বরকে আহুতি দেওয়া হয় বলা হয়েছে, তাকে ম্যাক্সমুলার obscene

(অশ্লীল) বলেছেন। ইনি এই উচ্চ ভাব বুঝতে পারেন নাই। তাই এরূপ বলেছেন। ম্যাক্সমুলারের এই অনাদরণীয় অভিমতকে খণ্ডন করেছেন এড্ওয়ার্ড কার্পেন্টার, the poet of democracy (জনগণের কবি), তাঁর সুবিখ্যাত পদ্যনিবন্ধে, Loves coming of the age-এ (প্রেমের বয়োপ্রাপ্তি)। তিনি criticise (সমালোচনা) করে বলেছেন, পুত্র উৎপাদন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতি, ঋষিদের এই ব্যবস্থা ঠিক। এই ভাবটি অতি সুন্দর, আর অতি উচ্চাঙ্গের ধারণা।

শ্রীম — কুলদাবাবু support (সমর্থন) করলেন?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, হাঁ। তবে এও বললেন, আগে আগেরগুলো কর, তবে এর অধিকারী হতে পারবে। আগেরগুলো মানে, সংযমাদি সাধন। এই সাধনগুলি না করে শুধু ঐ বললে অর্থাৎ 'পুত্রোৎপাদন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতি', হবে না।

শ্রীম — কালও আছে?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। কালের বিষয় — 'বৃন্দাবন'।

শ্রীম — তা হলে ওখানে একটু দেখে শুনে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া যাবে। আপনারাও যাবেন। এসব শোনা খুব ভাল, নইলে একঘেয়ে হয়ে যায় মানুষ। এ থেকেই ধর্মান্ধতার fanaticism-এর সৃষ্টি। আর এক কথা। অপরের মুখে এসব শুনলে ঠাকুরের কথার মূল্য কত বেশী সেটা বোঝা যাবে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'নাচতু গৌর রাসরস অবতার' — এ ভাবটা একটা অবস্থার কথা। যখন মন থেকে কাম একেবারে চলে যায়, লেশমাত্রও থাকে না, সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, তখন কাম প্রেমরূপ ধারণ করে। তখনকার কথা এসব। গোপীরা 'জার'-বুদ্ধিতে এসেছিলেন বনভূমিতে কৃষ্ণের কাছে। যতক্ষণ এঁদের মনে এই ভাব ছিল ততক্ষণ 'রাস' হয় নাই। কৃষ্ণের সৎসঙ্গে যখন এই কাম প্রেমরূপ ধারণ করলো তখনই হয়েছিল 'রাস'। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে করে কৃষ্ণময় হয়ে গিছলো!

যতক্ষণ কৃষ্ণকে মানুষ বলে জ্ঞান ছিল ততক্ষণ 'রাস' হয় নি। কৃষ্ণের

স্পর্শে যখন বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার তখনই গোপীদের মন থেকে কাম গেল। ঐ কাম প্রেম-রূপ ধারণ করলো।

ঠাকুর বলেছিলেন, দেহবুদ্ধি যাদের খুব প্রবল তাদের এসব শুনতে নেই, শুনাতেও নাই। চৈতন্যদেব সাড়ে তিন জন ভক্ত নিয়ে এ লীলাকথার রসাস্বাদ করতেন — রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর পুরী, শিখি মাইতি — এই তিন জন। আর আধখানা ছিলেন শিখি মাইতির বৃদ্ধা ভগিনী মাধবী দেবী। অন্য ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের অন্য লীলা কীর্তন করতেন। আর বহিরঙ্গ ভক্ত এলে নাম-সংকীর্তন করতেন।

একজন ভক্ত — রাসলীলার ফলশ্রুতিতে আছে, রাসলীলা শুনলে কাম নষ্ট হয়।

শ্রীম — এ ব্যবস্থা সাধারণের জন্য নয়। যাদের মন খুব উঁচুতে উঠেছে তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। বেদব্যাস ভাগবতের গোপীলীলা শেখালেন পুত্র শুকদেবকে — যিনি জ্ঞানঘনমূর্তি, তাঁকে। অত উঁচু! তাইতো ঠাকুর গোপীদের নাম শুনলেই মাথা নিচু করে প্রণাম করতেন। বলতেন, গোপীপ্রেমের এক কণা পেলে মানুষের হেউ ঢেউ হয়ে যায়।

গোপীপ্রেমের কথা বলার অধিকারী শুকদেব আর শোনার অধিকারী পরীক্ষিৎ। কখন পরীক্ষিৎকে বললেন? — না যখন পরীক্ষিৎ মরণের জন্য প্রস্তুত। গঙ্গাতীরে ঋষিমুনিদের সম্মুখে। পরীক্ষিতের প্রথমে বুঝবার শক্তি ছিল না। তাই সংশয় হয়েছিল। দু'বার বলাতেও সংশয় যায় নি। তৃতীয়বার যখন বললেন তখন গেল।

পরীক্ষিতের শেষ সংশয় ছিল, কেন শ্রীকৃষ্ণ গোপীলীলা করলেন — ভগবান হয়েও। তাঁদের কুলের বন্ধু ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি তাঁর এই কার্যের নিন্দা পরীক্ষিতের মনে দৃঢ়বদ্ধ, কিছুতেই দূর করতে পারে নি।

পরীক্ষিৎকে বললেন শুকদেব, — 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজোঃ যথা'। অগ্নিতে চন্দন ও বিষ্ঠা পড়লে উভয়কে অম্লানভাবে গ্রাস করে ফেলে অগ্নি। তেমনি, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছে, যাঁদের অহংকার ভগবানের অহংকারের সঙ্গে একীভূত হয়েছে, তাঁরাই তেজীয়ান।

পরীক্ষিতের social (সামাজিক) দৃষ্টি। তিনি তাই এই ব্যাখ্যা ধরতে

পারেন নাই। সংশয় রয়ে গেল। তাঁর ভাব — যা খারাপ তা সকলের পক্ষেই খারাপ। বাহ্য দৃষ্টিতে তো তাই ঠিক!

শুকদেব দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলেন বোঝাতে। এবার পরীক্ষিতের শাস্ত্রদৃষ্টি উদ্বোধন করতে চেষ্টা করলেন। বললেন, মহাপুরুষগণের সব কাজ আচরণীয় নয়। কতকগুলি কাজ তাঁরা নিজে করেন, কিন্তু অপরকে তা আচরণ করতে বলেন না। কতকগুলি নিজেরাও করেন, অপরকেও করতে বলেন। কেবল এই গুলি আচরণীয় অপরের। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা নিজে করেছেন পরস্ত্রীর সহিত, কিন্তু অপরকে করতে বলেন নাই।

এ যুক্তিও পরীক্ষিতের সংশয় দূর করতে পারলো না। তাঁর ভাব শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। তাঁর সকল কাজই আচরণীয়, অনুকরণীয়। অথচ পরস্ত্রীর সহিত নিভৃতে মিলন সকলের কাছেই নিন্দনীয়। কোন্ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের এই কার্য অনিন্দনীয়?

পরীক্ষিতের মৃত্যু সমীপবর্তী, তাই তাঁকে সরল ব্যাকুল দেখে শুকদেব কৃপা করে তাঁর তত্ত্বদৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করে দিলেন। বললেন, পরীক্ষিৎ — শ্রীকৃষ্ণ কেবল আদর্শ পুরুষ নন। তিনি পরমব্রহ্ম। তাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ হয়। তিনি নিজেই ঈশ্বররূপে স্ত্রীপুরুষ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। গোপীও তিনি, কৃষ্ণও তিনি। তিনি তাঁর নিজের সঙ্গেই নিজে খেলা করেছেন। এ কেমন? যেমন বালক আয়নাতে আপন প্রতিফলিত রূপের সঙ্গে খেলা করে। যে গোপী সে-ই কৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ।

৩

মর্টন স্কুল। শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা। অন্তেবাসীকে বলিলেন, ওখানে আর যাওয়া হবে না দেখছি — 'বৃন্দাবন' হবে।

গতকাল হইতেই শ্রীম থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যাইবেন স্থির ছিল — ডাক্তারের মোটরে। ডাক্তার আসিতে দেরী করিতেছেন। অন্তেবাসী বলিলেন, আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে ওখানে যেতে আপনাদের জন্য।

ইতিমধ্যেই ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন। শ্রীমকে ডাক্তার ছাদের দরজার পাশে প্রণাম করিলেন। শ্রীম আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আর পোষাক

পরিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন আসিলেন মাখন। শ্রীম বলিলেন কেউ কেউ হেঁটে রওনা হন। গাড়ীতে অত লোক ধরবে না। ইনি (অন্তেবাসী) আর ইনি (ছোট রমেশ) যান হেঁটে। এঁরা আপনার লোক। অন্তেবাসী রওনা হইলেন। সিঁড়ির সামনে আসিয়া বলিলেন, তা হলে আমাদের যাওয়া হবে না আদি সমাজে। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন, এঁদের আদি সমাজে যাবার মন নাই। অন্তেবাসী বলিলেন, আমি থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যাচ্ছি।

ভক্তরা আগেই আসিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীম একটু পরেই আসিলেন। তিনি দ্বিতলের দরজার কাছে বসিলেন বেঞ্চে পাখার নিচে। একটু থাকিয়া পৌনে সাতটায় চলিয়া গেলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজে।

কুলদাবাবু বলিতেছেন, বৃন্দাবন পেতে হলে তার জন্য বাকুল হতে হয়। মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে হতে পারে। এর উপরও আর একটি জিনিস আছে। সেটি হলো কৃষ্ণকৃপা। চেষ্টা করলে ব্যাকুল হলে, তাঁর কৃপা হতে পারে। আর চাই সন্তজনের শুভেচ্ছা। সন্তজনের কৃপা হলেই কৃষ্ণেরও কৃপা হয়।

পার্থিব বৃন্দাবনটি নিত্যবৃন্দাবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এ দু'টিই অপ্রাকৃত। উভয়স্থলেই নিত্য রাস হয়। ইত্যাদি।

শ্রীম আদি সমাজ হইতে ফিরিয়াছেন। ভক্তরাও থিওজফি-হল হইতে একটু পূর্বে আসিয়াছেন। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দার পূর্বধারে বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। ভক্তরাও সামনে ও পাশে বেঞ্চে বসা — শুকলাল, বিনয়, ডাক্তার, জগবন্ধু, মুকুন্দ, অক্ষয় ডাক্তার প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন গদাধর, বুদ্ধিরাম ও ছোট নলিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন দক্ষিণেশ্বর হইতে। ইঁহারা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর প্রসাদ আনিয়াছেন। শ্রীম বলিলেন, জল পেলে সকলে প্রসাদ নেওয়া যায়। একজন ভক্ত (বিনয়) উঠিয়া গিয়া জল লইয়া আসিলেন। শ্রীম হাত ধুইয়া জুতা ছাড়িয়া কণিকা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন। কথাবার্তা চলিতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এদিকে আসুন। বলুন, তারপর কি হলো।

অন্তেবাসী — একই কথা নানা ঢং-এ বলেছেন। এর substance (সার) এই — প্রেয় চাইলে শ্রেয় অর্থাৎ ঈশ্বর মিলে না। টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম — সংসারের এসব চাইলে ঈশ্বরলাভ হয় না। এই সবের নামই প্রেয়। ঈশ্বরদর্শন আর বৃন্দাবনলাভ একই কথা। ইত্যাদি।

একটি ভক্ত — এঁদের ধর্মব্যাখ্যায় অনেক কিছু ধরে নিতে হয়, তবে কিছু বোঝা যায়। অত সব ধরে নিতে নিতে মূল বস্তু চাপা পড়ে যায়। It is rather more dogmatic than rational (বরং তাদের নিজ নিজ মতের সমর্থনই বেশী, যুক্তি নাই বললেই চলে)।

শ্রীম — সকল কথার মিল হয় কি করে? যতটা মিলে তাই নিতে হয়। সব খেলে হজম হবে কেন? ঠাকুর বলতেন, বালিতে চিনিতে মেশান আছে। পিঁপড়ে হয়ে চিনিটা বেছে নিতে হয়। তা ছাড়া সময় কোথায় অত পড়ার বা শোনার?

ঠাকুর বলতেন, বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। খালি মুখে বললে কি হবে? ঠাকুরের কাছে ঐ এক কথা — কিছু কর। তাঁর সবই practical (আচরণযোগ্য)। বলতেন, চৌদ্দ আনা, পনর আনা করা — হাতে আনা। আর এক আনা, দুই আনা — শোনা।

ঠাকুর বলতেন, গুরুমুখে শুনে বিশ্বাস করে কিছু করলেই তিনি এসে বলে দেন আগে কি করতে হবে। হয় তো মনে বুদ্ধিরূপে বলে দেন। অথবা কারুকে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে বলে যান।

ঠাকুরের এক কথা — তপস্যা কর, সাধন কর।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (অক্ষয় ডাক্তারের প্রতি) — বাড়ির কুশল তো সব?

অক্ষয় — আজ্ঞে না, একটি কন্যার দেহত্যাগ হয়েছে।

শ্রীম (সহানুভূতির সহিত) — তাই ঠাকুর বলতেন, 'দেখছি সংসার জ্বলন্ত অনল। কি করে বলি এতে প্রবেশ করতে?'

আহা, একটি ভক্তের একটি ছেলে মারা গিছল। ঠাকুর শুনে কাঁদলেন। তা কাঁদবেন না! জীবের দুঃখে কাতর হয়ে যে তিনি আসেন অবতার

হয়ে। এইসব শোকের হাত থেকে রক্ষা নাই শরীর থাকতে। তবে মনটা যদি তাঁর কৃপায় তাঁ'তে থাকে তবে কিছুটা রক্ষা। তাই ঠাকুর এসে বরাবর একই কথা বলেন, ঈশ্বরই সকলের আপনার। তাঁকে জানাই মানুষের কর্তব্য। নিজে এসে বললেন — আমায় ধর, আমি তোমাদের এই শোক-মোহের হাত থেকে রক্ষা করবো। কিন্তু শোনে কে?

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
বুধবার, শুক্লা সপ্তমী, ৬ দণ্ড।

একবিংশ অধ্যায়

ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হয়

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। অন্তেবাসী মন্মথ চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। মন্মথ সাউথ সুবার্বন স্কুলের শিক্ষক। ভক্ত লোক। ১৭ই নভেম্বর শ্রীমকে প্রথম দর্শন করেন। শ্রীম দ্বিতল হইতে ছাদে আসিয়া ভক্তদের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহ অর্গলবদ্ধ।

এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। গায়ে ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, মাথায় কম্ফোর্টার। আর জামার উপর গরম আলোয়ান জড়ান। শ্রীম-র সম্মুখে ও পাশে অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন বেঞ্চে। ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও ছোট নলিনী, রজনী, মনোরঞ্জন ও মুকুন্দ, অক্ষয়, ব্রুকবণ্ড ও মন্মথ এবং আরও কয়েকজন আসিয়াছেন।

ইটালীর অর্চনালয়ের ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা ক্ষুদ্র গীতা। ইনি ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন নূতন ঢং-এ। শ্রীমকে এক খণ্ড ঐ গীতা যুক্ত করে উপহার দিলেন। ইনি ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত দেবেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আশ্রিত সন্তান, পণ্ডিত লোক। শ্রীম উহার পাতা উল্টাইতেছেন। মাঝে মাঝে মজুমদার মহাশয়ের কথাও হইতেছে।

শ্রীম (প্রাণেশের প্রতি) — বেশ হয়েছে। এ তো publication (পুস্তকপ্রকাশ) নয়। এ তপস্যা হয়ে গেল। কত চিন্তা, গভীর চিন্তা করতে হয়েছে।

ডাক্তার ও বিনয়ের প্রবেশ। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়াছেন। হাতে মা ভবতারিণীর প্রসাদ। ভক্তগণ সকলে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। প্রসাদ পাইবেন।

প্রসাদ পাইয়া ভক্তরা পুনরায় সিঁড়ির ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় কথাবার্তা হইতেছে।

মন্মথ (শ্রীম-র প্রতি) — গিরিশবাবুর বাড়িতে ঠাকুরকে দেখে আপনার মনে যে ভাব হয়েছিল তার বর্ণনা পড়ে আমার খুব উপকার হয়েছে।

শ্রীম — হাঁ, তাঁকে দর্শন করে মনে যে সব কথা উঠতো তাই লেখা হয়েছে। (আহ্লাদে) আপনার তো বেশ power of observation (ধরবার শক্তি) আছে। কেমন ধরেছেন!

মন্মথ — সমাধিস্থ লোক নিচে নামতে পারে কি? কেউ বলে পারে না।

শ্রীম — মহিমাচরণও এই প্রশ্ন করেছিলেন। ঠাকুর বললেন, শঙ্করাচার্য, রামানুজ — এঁরা কি তাহলে? আবার শুকদেব, হনুমান? বলতেন অবতারাদি নামতে পারেন। যাঁরা ঈশ্বরকোটি তাঁরা নামেন ঈশ্বরেচ্ছায়। নইলে লোকশিক্ষা হবে কি করে?

(সহাস্যে) মহিমাচরণের ভাব — সকলেই সাধন করলে শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে। ব্যবধান দূর হলেই পারে। বেল গাছ, আম গাছ হতে পারে।

ঠাকুর তাই গিরিশ ঘোষের সঙ্গে মহিমাচরণের বিচার লাগিয়ে দিলেন। গিরিশের বিশ্বাস অবতার কেউ হতে পারে না অবতার ছাড়া। যদি কারো ভিতর কৃষ্ণের শক্তি দেখা যায় তো তিনি কৃষ্ণই।

মহিমাচরণ মেনে নিলেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে পেরে উঠলেন না। আর একদিন ঠাকুর বলেছিলেন মহিমাচরণকে এই কথা — 'অবতার, অবতার হতে পারেন। জীব পারে না।' সেদিন মহিমা মানেন নাই।

(সহাস্যে) ঠাকুর বললেন, মেনে ভাল করলে। নইলে গিরিশ তোমার টুঁটি ছিঁড়ে খেত যেমন কুকুরে মাংস খায়।

মন্মথ — মহিমাচরণ জ্ঞানী ছিলেন বুঝি?

শ্রীম — হাঁ। বই পড়ে জ্ঞানী। ঠাকুর বলেছিলেন, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে অন্যরূপ হয়। বলতেন, জ্ঞানীর অহংকার চলে যায়। পরে যে একটু অহংকার থাকে, দেখা যায় তা কেবল লোকশিক্ষার জন্য। ওটা 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি'। এ 'আমি'-তে অনিষ্ট হয় না। যেমন

তরবারি, সোনার তরবারিতে হিংসার কাজ হয় না।

বলেছিলেন, যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য আছে ততক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে। ততক্ষণ জ্ঞান হয় নাই পূর্ণরূপে। পরে দেখে, প্রতিবিম্ব সূর্য নাই। কেবল জ্ঞানসূর্য, সত্যিকার সূর্য রয়েছে। সেই অবস্থায় 'সোঽহং'।

বলেছিলেন, যেমন দুপুরের রোদে ছায়া থাকে না, শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তেমনি অহং থাকে না ব্রহ্মজ্ঞানে। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়।

বলেছিলেন, মন-বুদ্ধি যেন জল! আর শরীর ভাণ্ড। মন-বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব পড়ে পরমব্রহ্মের, সাধন অবস্থায়। তাঁর কৃপায় পরে দেখে, প্রতিবিম্ব নাই। এটা ঢেকে গেছে বিম্বেতে — সচ্চিদানন্দে পরমব্রহ্মে। এটা বিচারপথ।

ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হয় — একাকার জ্ঞান হয়। গোপীরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণ হয়ে গিছলেন। তাঁরা যে স্ত্রী, এ জ্ঞান লোপ হয়ে গিছলো।

মন্মথ — তোতাপুরীর শেষটা কেমন হয়ে গেল যেন, কেন?

শ্রীম — ইনি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' — এ পথে গিয়ে সোঽহং জ্ঞান লাভ করেন। ব্যুত্থিত হলেও ঐ জ্ঞান এই অবস্থায়ও ছিল। তাই বলেছিলেন, প্রকৃতি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। ঠাকুর 'মা মা' করে ব্রহ্ম-জ্ঞানে পৌঁছেছিলেন। ব্যুত্থিত অবস্থায় তাই দেখলেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — গাছপালা, বাড়ি-ঘর — সব মা। ঠাকুরকে উনি নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্ম জ্ঞান দিয়েছিলেন, অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি। আর ঠাকুর তাঁকে দিয়েছিলেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'।

ঠাকুর ভক্তিপথ ধরে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছান। আর তোতাপুরী জ্ঞানপথে যান। তোতাপুরীর প্রথম লাভ হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। এই জ্ঞান। ঠাকুরের হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'। তারপর তোতাপুরীর হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'। ঠাকুরের হলো 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। জ্ঞানপথে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিপথে ব্রহ্মজ্ঞান এ দুটোই ঠাকুরের ছিল।

ব্রহ্মচারী প্রাণেশ — কিন্তু ঠাকুর সকলকে ভক্তিপথেরই তো উপদেশ দিতেন।

শ্রীম — ভক্তিপথের অধিকারীই প্রায় সব। জ্ঞানপথের অধিকারী কম। তা ছাড়া কলিকাল, অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম। এখন জ্ঞানপথ চলে না সকলের পক্ষে। বিশেষ, গৃহস্থের পক্ষে।

ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার — পশ্চিমী পণ্ডিতরা কেউ কেউ বলেন, গীতা তিন বারে লিখিত হয় তিন জনের দ্বারা। ছয় অধ্যায় ক'রে এক এক জনে লিখেছে। কেউ বলে প্রথমে বার অধ্যায় ছিল। পরে ছয় অধ্যায় লেখা হয়। এ বিষয়ে ঠাকুরের সুস্পষ্ট মত কি?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, গীতার কথায় আঁচড় দেবার যো নাই। সব সত্য।

ব্রহ্মচারী প্রাণেশ — শব্দ, ভাষা, ভাব এই সবই সত্য — কি ভাব, সত্য? কোনটা ঠাকুরের অভিপ্রায়? কি ভাবে তিনি বললেন — আঁচড় দেবার যো নাই?

শ্রীম — কি অর্থে বলেছেন ঐ কথা, তা তিনিই জানেন। আমরা কি বুঝবো তাঁর কথা? তবে আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে মনে হয়, ভাবের কথাই বলেছেন।

আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এর ভাব বুঝতে পারে না প্রায়ই। ভিতরে প্রবেশ না করলে বাইরে থেকে সব ঠিক হয় না। আমাদের বিশ্বাস revelation-এ (অপরোক্ষ অনুভূতিতে) ঠাকুরের কথায়। ঠাকুরের জীবনটাই ছিল গীতার বিগ্রহ।

২

মন্মথ — এক জায়গায় ঠাকুরের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁকে দেখছি, আবার তপস্যা?

শ্রীম — হাঁ, রামবাবু বলেছিলেন, তিনি ঠাকুরকে ঐ ভাবে নিয়েছেন। অর্থাৎ বহু জন্ম তপস্যায় শ্রীভগবানের দর্শন হয় নরকলেবরে। তাদের আর তপস্যার দরকার নাই।

আবার একটা থাক্ লোক আছে। এদের তপস্যা করিয়ে নিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য। স্বামীজীরা কত তপস্যা করেছেন!

কেউ (শ্রীম) হয়তো suicide (আত্মহত্যা) করতে যাচ্ছিল। কিংবা

অন্য কত রকম difficulties-এর ভিতর দিয়ে এসেছে। নরেন্দ্রকে আহারাদি কষ্টের ভিতর দিয়ে নিয়েছেন। কেন এসব? তবে, এই experience-গুলো অন্যের সময় apply (প্রয়োগ) করতে পারবে।

শ্রীম — গৃহীরা একটুখানি amateur religion (সখের ধর্ম) নিয়ে আছে। গৃহীদের লোকশিক্ষা দিবার অধিকার নেই। কেন? কামিনীকাঞ্চনের ভিতর যে রয়েছে!

অন্য থাকের ওরা, সাধুরা লোকশিক্ষা দিবে। তাদের তাই সব ত্যাগ করিয়ে নিয়েছেন। আবার তপস্যা করিয়েছেন।

বিবেকানন্দ কত কষ্ট করেছেন। ভাগলপুরে একবার তিন দিন না খেয়ে ছিলেন। একটি লোক আসছে দেখে বললেন, ও আমাদের খাওয়াবে। সঙ্গে কে ছিল? ও ও, গঙ্গাধর। তাকে বললেন, লোকটি ভাল। সে নমস্কার করে বললে, মহারাজ আজ কোথায় ভিক্ষা হবে? — এই হবে একখানে। সে বললে, আমাদের বাড়ি চলুন। উনি বললেন, আচ্ছা তবে চল। চলছেন আর রাস্তায় শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। তা না হলে বিশ্বাস করবে না, বড় সাধু (সকলের হাস্য)। হাঁ, লোকের ঐ ধারণা।

এর উপর ছিলেন। ঐ যে গঙ্গার ওপর বাঁধান গোল গোল থাকে, যাতে মানুষ বসে। কি বলে?

অন্তেবাসী — পোস্তার মাঝে মাঝে — বুরুজ।

শ্রীম — হবে। কত কষ্ট! এসব গল্প করতেন, আমাদের কাছে।

শ্রীম নীরব। আবার কথা।

শ্রীম — আর একবার আলমোড়ার কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ছিলেন। তিন দিন আহার জোটে নাই। একজন শেষে একটি শসা খেতে দিলেন। তা খেয়ে প্রাণ ধারণ হয়।

এত সব কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন এক এক জন।

মন্মথ — স্বামীজীকে অত ভালবাসতেন। তবে কেন অত কষ্ট দিলেন ঠাকুর?

শ্রীম — পাকা pilot (পথ-প্রদর্শক) বানাবেন বলে। তবে তো জগৎগুরু হতে পারবেন। লোকের অন্নাভাবে কি কষ্ট তা বুঝতে পারবেন। তাইতো, সেবাশ্রম, রিলিফ, কত কি করলেন দরিদ্রের সেবার জন্য।

এই যে (বেলুড়) মঠটি করলেন কেন? না, যারা সংসার ছাড়বে তাদের জিরোবার স্থান হবে বলে। যেমন পাখী উড়তে উড়তে পরিশ্রান্ত হলে বৃক্ষের ডালে এসে বসে, তেমনি সাধুরা এখানে বিশ্রাম করবে। বলতেন, এরপর ছেলেরা আসবে। তারা অত কষ্ট সইতে পারবে না নিরাশ্রয় জীবনের। তাই এটা করা। এখানে একমুঠো অন্ন পাবে, আর মাথা গুঁজবার স্থান মিলবে। আমাদের মত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ওরা। তাই মঠ করা।

শ্রীম নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধুদের সঙ্গে গৃহীদের তুলনা? যোগো-পনিষদে আছে — যেমন সুমেরু পর্বত আর সরষে, কিংবা মহাসাগর আর গোষ্পদের জল — এত তফাৎ।

তা বলে ভক্তও কি কম? গৃহী ভক্তরাও কম নয়। তবে ওদের তুলনায় ঐরূপ। কখন বলতেন, যারা গৃহে থেকে জ্ঞান লাভ করেছে তারা যেন কাঁচের ঘরে বাস করে। আর সর্বত্যাগী মাঠে দাঁড়িয়েছে আলোর বন্যায়। ভক্তদের কথা বলতেন, এখানে যারা আসে, তারা কেউ সংসারী নয়। মানে, অন্তরে সন্ন্যাস বাইরে গৃহী।

এবার দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ও মা কালীর প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। ভক্তরা কেহ কেহ নিচে যাইতেছেন, আবার উপরে উঠিতেছেন।

'কবে মাধুকরী করবো মধুর বৃন্দাবনে' — এই পদটি শ্রীম গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন। পাঁচ মিনিট পর পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি influence-ই (প্রভাবই) ঢেলেছেন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব পদকর্তা মহাজনদের উপর। দেখ না, নরোত্তম দাসের এই পদটি কি মধুর — 'কবে মাধুকরী করবো মধুর বৃন্দাবনে'। কেবল কি পদের মাধুর্য! ভাবের উচ্চতা ও গভীরতা কত! সন্ন্যাসের কথা বলছেন। মাধুকরী — ভিক্ষা, অর্থাৎ মধুকরের মত বৃত্তি। নানা ফুল থেকে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে মধুচক্র রচনা করে মধুকর। তেমনি উদর পূরণের জন্য ঘর ঘর থেকে ভিক্ষা নিয়ে জীবন নির্বাহ করা।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — রূপ গোস্বামীর ভাইপো জীব গোস্বামী। খুব বড় পণ্ডিত। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একজন এলো। তাকে হারিয়ে

দিল। শুধু তা নয়, তাকে দিয়ে জয়পত্র লিখিয়ে নিল। রূপ গোস্বামী শুনে বললেন, তার মুখ দর্শন করবো না। সর্বত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে শেষে জয়পত্র! জীব গোস্বামী মুখ মলিন করে দুই এক মাস এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। তারপর তাঁর friends (বন্ধুরা) গিয়ে রূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৈষ্ণবের চিহ্ন কি? উনি বললেন নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন! তাঁরা বললেন, 'জীবে দয়া' এ-ও তো একটা চিহ্ন আছে। তবে আপনার 'জীব'-এ দয়া হয় না কেন (সকলের হাস্য)? তারপর ক্ষমা করলেন। সাধু হয়েছে — তার আপনার সুনাম, আবার জয়পত্র (হাস্য)! এমনি ব্যাপার। সর্বত্যাগী, লোকশিক্ষা দিবে কি না।

শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। এখন আটটা।

একটি ভক্ত — ডাক্তারবাবু, আপনাকে ভূয়সী প্রশংসা ও ধন্যবাদ। আপনি নিজের মোটরে করে শ্রীমকে নানা স্থানে নিয়ে যান আর তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভক্তের ইচ্ছা, বিত্তশালী শুকলাল মোটর করেন। তাহাতে তাঁহারও সাধুসঙ্গ হইবে ভাল। তিনি স্থূলকায় আবার থাকেন বেলেঘাটা।

শ্রীম কতবার বলিয়াছেন, কি-বা পয়সা। একটা মোটর থাকলে ইচ্ছা না থাকলেও সাধুসঙ্গ হতে পারে। মঠে যেতে পারেন, দক্ষিণেশ্বর দর্শন হয়। ঈশ্বরলাভের সহায়ক অর্থ, যদি সদ্ব্যবহার জানা থাকে। ঠাকুরও বলেছেন, অর্থ থাকলে অর্ধ-জীবন্মুক্ত।

শুকলালবাবু কি এই কথা শুনিলেন?

ভক্তরা সিঁড়ির ঘরে বসা। অন্তেবাসী ছাদে বেড়াইতেছেন। আকাশে চন্দ্রমা। তাহার কিরণে সর্বত্র উদ্ভাসিত। শ্রীম ভোজন করিয়া ফিরিয়াছেন। পার্টিশানের ঘরে আসিয়া বসিলেন। বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা। একজন ভক্তকে দিয়া অন্তেবাসীকে কানে কানে বলিলেন, তাহলে আপনি একটা application (আবেদন) লিখে জীবুকে দিয়ে যান। কাল যেন সেটা ওদের হাতে দিয়ে দেয়। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন বলুন তো কা'কে? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, মণিবাবুকে।

শ্রীম পুনরায় আসিয়া সিঁড়ির ঘরে ভক্তদের কাছে বসিলেন। প্রাণেশকুমারের গীতাখানার পাতা উল্টাইতেছেন, মাঝে এক একটা

অধ্যায়ের শ্লোক পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। যোগীর বাহ্য লক্ষণ পড়িলেন

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ (গীতা ৬:১৭)

যার আহার বিহার কর্ম পরিমিত, যার নিদ্রা ও জাগরণ সংযত, তারই মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই যোগ সর্ব দুঃখ নাশ করে। অর্থাৎ সর্বদা যদি ঈশ্বরকে স্মরণ করে তবে মনে শান্তি সুখ থাকে। যার সবটা মন সংসারে বাঁধা তার না আছে শান্তি, না সুখ, না আনন্দ। ইহকাল পরকাল দু-ই নষ্ট হয়।

যারা এটা চাই, ওটা চাই, করে তাদের যোগ হয় না। মন সর্বদা চঞ্চল। আবার পাঠ করিতেছেন, আবার ঐ কথা — যাদের নানান জিনিসের দরকার তাদের যোগ হয় না। এবার পড়িয়া শেষ করিলেন। আবার ঐ কথা — যাদের জীবনযাত্রা সরল তাদেরই যোগ হয়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — যোগীরা রাত্রে বেশী ঘুমোয় না। আহারও খুব অল্প — বিশেষ করে রাত্রে। অত করে চললে তবে ঈশ্বরলাভ হয়। আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেশব সেনকে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমরা একটু chink দিয়ে আলো দেখছো। ঘরে থেকে যারা ঈশ্বরকে দেখে, তাদের এই অবস্থা। দেখ, কা'কে বলছেন এই কথা? কেশববাবুকে! যিনি observed of all observers — যাঁর দর্শনের জন্য লোক পাগল তাঁকেই বলছেন এই কথা!

তা হলে mutual admiration society-র (পরস্পর স্তাবক সঙ্ঘের) মেম্বারদের কথায় কি কাজ হয়? তাদের কথার মূল্যই বা কি?

কত ভালবাসতেন কেশববাবুকে। উনি তখন ধর্মের একটা authority (সুযোগ্য অধিকারী)।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ (গীতা ১২:৮)

সব ছেড়ে মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে লাগলে তবে তাঁর দর্শন হয়। ঈশ্বরলাভ অত শক্ত!

ঠাকুর বলতেন, যাদের অনেক কাজ তাদের সহায় যোগ — অর্থাৎ

routined life, সংযত জীবন।

আবার বলতেন, যাদের শরীর দুর্বল তাদেরও সহায়ক যোগপথ। মানে, সব measured way-তে — পরিমাণ মত করবে। যারা এরূপভাবে চলে life (জীবন) শান্ত ও সমাহিত হয়।

মরণপণ করে না লাগলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। এও আবার তাঁর কৃপা হলেই হয় — এই Himalayan determination, হিমালয়ের মত অচল সঙ্কল্প!

'To do or die — মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' — এই সঙ্কল্প চাই।

যোগীর আহারসংযমটি চাই সর্বপ্রথমে! 'জিতে রসে জিতং সর্বং'। ঠাকুর এর উপর বড়ই জোর দিতেন। এটা ঠিক হলে কামক্রোধাদি অনেক বশ হয়ে গেল।

একজন ভক্ত — যারা মেস বোর্ডিং-এ খায় তাদের আহার আপনিই যোগীর আহার হয়ে যায়।

শ্রীম — তবে তারা খুব লংকা খায় (হাস্য)।

শ্রীম — যদি এ সব নিজের শক্তিতে না কুলোয় তবে উপায়ান্তর ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে বল। তিনি সব করে দিবেন। এটা তাঁর প্রতিজ্ঞা। সত্যিকার ব্যাকুল ক্রন্দন চাই।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা, অষ্টমী, ২ দণ্ড। ৫৪ পল।

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

সূচীপত্র

ভূমিকা

তুষের ভিতর যেমন চাল ১

প্রথম অধ্যায়

এক ঘটি কান্না — শিশুর মত কান্না ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংসার - অনল ও শান্তিবারি — উভয়ই আছে এখানে ১৪

তৃতীয় অধ্যায়

এক একটি কথা যেন এক একটি দীপ ২৪

চতুর্থ অধ্যায়

মুখস্থ থেকে মনস্থ হয় ৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

আবার বনভোজন ও দুর্গোৎসব ৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানভক্তির ভাণ্ডার কাশী ৫২

সপ্তম অধ্যায়

সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ হয় ঈশ্বরদর্শনে ৬৪

অষ্টম অধ্যায়

কোনটা শ্রেষ্ঠ 'কালচার'—শুধু পাণ্ডিত্য, কি আত্মজ্ঞান ৭১

নবম অধ্যায়

রাসে রসময় শ্রীম ৭৯

দশম অধ্যায়

আজের দিনটা সফল হ'ল ৮৮

একাদশ অধ্যায়

বিচারের পরেও একটা জিনিস আছে ১০৩

দ্বাদশ অধ্যায়

বিনাশের এই সাতটি ধাপ ১১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
কমল কুটীরে শ্রীম ১২৫
চতুর্দশ অধ্যায়
যে কেবল মাছের চক্ষু দেখে সে লক্ষ্য ভেদ করে ১৩৩
পঞ্চদশ অধ্যায়
ঠাকুরের ভাবের অববাহিকা কেশব ১৪৩
ষোড়শ অধ্যায়
কল্পতরু তীর্থে ১৫৫
সপ্তদশ অধ্যায়
মাধবী পীঠ — শ্রীরামকৃষ্ণ ও তোতাপুরী ১৬১
অষ্টাদশ অধ্যায়
মিলন মন্দিরে ১৭৩
ঊনবিংশ অধ্যায়
জীব শিব জ্ঞানে বিশ্বশান্তি ১৮১
বিংশ অধ্যায়
ঠাকুরের এক কথা — কিছু কর ১৮৮
একবিংশ অধ্যায়
ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হয় ১৯৭

* * *

পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে "শ্রীম-দর্শন" দশম খন্ডে, দিনপঞ্জী ও ঘটনার ক্রমানুযায়ী প্রথম ছয়টি অধ্যায় — চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম — এই ক্রমে পাঠ করিল পাঠকগণের ঘটনাপ্রবাহ বুঝিতে সুবিধা হইত পারে।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(দশম ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রী গণেশ চতুর্থী
৭ই ভাদ্র, ১৪১৬
(২৪শে অগাষ্ট, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬/৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(দশম ভাগ)

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীম - দর্শন

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

০৭